বাক্সের বাইরে

শরীফ আবু হায়াত অপু

বি.দ্র: 'সরোবর প্রকাশন' কর্তৃক প্রকাশিত মূল বইয়ের লেখার সাথে ইসলামিক অনলাইন মিডিয়া প্রকাশিত পিডিএফ-এর লেখাগুলোর আংশিক পার্থক্য থাকতে পারে। কেননা, বইটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে লেখাগুলো বিভিন্ন ব্লগ/ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে বইটিতে পরবর্তীতে করা সম্পাদনা এখানে অনুপস্থিত।

* বইটি ভালো লাগলে অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশনী থেকে ক্রয় করুন *

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

‘নিশ্চয়ই আমার প্রার্থনা, আমার আত্মত্যাগ, আমার জীবন এবং আমার মরণ – সবকিছুই বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য’।

[আল আন‘ আম : ১৬২]

www.shorobor.org

www.facebook.com/shorobor.bd

www.i-onlinemedia.net/archives/8502

বাক্সগুলো সাধারণত আমরা জন্মসূত্রে পেয়ে থাকি। পরিবার থেকে, সমাজ থেকে। বাক্সগুলো আরামদায়ক—তাতে যে আমরা বন্দী আছি সে বোধটা আসে না মোটেই। বাক্সের ভেতরে আবর্তিত হয় নাওয়া-খাওয়া-ঘুম-বংশবৃদ্ধির চক্র। নিতান্তই গৃহপালিত পাশবিক জীবনযাপন!

বাক্সের বাইরেটা আলোকিত, তাতে অনেক কিছুর আসল রংটা বোঝা যায়। সেখানে বাঁচাটা অসহজ, তবে আনন্দের। বাক্সের বাইরের পথটা আপাত দুর্গম হলেও তার শেষে অকল্পনীয় প্রাপ্তি আছে।

এ বইটার লেখাগুলো না গল্প, না প্রবন্ধ—দেশ, সমাজ, ধর্ম, জীবন, সম্পর্ক সবকিছুকে অন্য আঙ্গিকে দেখার প্রয়াস থেকে লেখা। বাক্সের বাইরে বাঁচার চেষ্টা করছে এমন একজন মানুষের লেখা। বাক্সের বাইরে ভাবতে চায় এমন মানুষদের জন্য লেখা।

Contents

আত্মসমর্পণের চিরকুট

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রসংশা আল্লাহর জন্য। সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (সা.) এর প্রতি। এ বইটি অবশেষে আলোর মুখ দেখল। কিছু কথা স্বীকার করে নেওয়া কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যে এই ভূমিকাটি:

- এ বইয়ের লেখাগুলো আমার দ্বারা লেখা হলেও আমি এর লেখক নই। কোথাও আমার কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ কীভাবে যেন আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, পুরনো লেখাগুলো পড়লে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়।

- এ বইয়ের উদ্দেশ্য বা বিধেয় একটাই – মানুষ যেন তার চারপাশের দুনিয়া, ঘটমান বর্তমান সম্পর্কে অন্যভাবে ভাবে; বাক্সের বাইরে উঁকি দেয়। মানুষের চিন্তার জায়গাতে নাড়া দেওয়ার জন্য ইসলামের দৃষ্টিকোণকে বেছে নিয়েছি। বংশসূত্রে পাওয়া অন্ধ ইসলাম নয়, কুরআন-সুন্নাহ থেকে শেখা ইসলাম। সেই ইসলাম – যা মানুষকে যৌক্তিক চিন্তার জায়গা করে দেয়।

- এ লেখাগুলোর অক্ষরের কালো রঙের একটা অন্ধকার দিক আছে। আমার মা, বাবা, সন্তান এবং স্ত্রীর প্রাপ্য সময়ের অনেকটাই পড়া এবং কিছুটা লেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করেছি। আমি তাঁদের কাছে তাঁদের প্রাপ্য বুঝিয়ে না দেওয়ার দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি। যে গাছটা ঝলমলে আলোয় আলোকিত, তার শিকড়গুলো আন্ধকারেই থাকে। মানুষ গাছ দেখে, শিকড় না। গাছ হিসেবে আমি শিকড়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

- আমি একজন মানুষ, খুব তুচ্ছ একজন মানুষ। এ লেখাগুলো আমার শিক্ষা এবং ভাবনার পওতিফলন। এতে মানবিক ভুল থাকতে পারে। বিশুদ্ধ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে (মূল বইয়ে) কোন ভুল যদি চোখে পড়ে, তবে ভুলটা ধরিয়ে দেবেন – এটাই একান্ত কাম্য।

ধন্যবাদান্তে,

শরীফ আবু হায়াত অপু।
monpobon@gmail.com

চোখের ডাক্তার

ডা. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ দিন শুরু করেন সকালে। যদিও আগের দিন রাত তিনটে পর্যন্ত পড়তে হয়েছে। এরপর সারা দিন হাসপাতালে। বিকেলে প্রফেসরের সাথে অস্ত্রোপচারে সাহায্য করতে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকা। সন্ধ্যার আগেই ফিরলেন বাসায়। গাড়িটি একটু গুছিয়ে নেওয়া, সবকিছু ঠিকমত আছে কিনা দেখে নেওয়া। রওনা দিলেন বগুড়ার দিকে। অবরোধের বন্ধনমুক্ত গাড়ির ঢলে রাস্তা বন্ধ। এক মিনিট গাড়ি চলে তো তিন মিনিট বন্ধ। রাস্তার পাশে চড়াই-উতরাই-ই সই। বগুড়া ঢোকার আগে শেরপুরে মায়ের সাথে দেখা করা। এরপর গ্রামের বাড়ি ধুনটে পৌছলেন সকাল পৌনে সাতটায়।

ম্যানুয়াল গাড়িতে বসে স্টিয়ারিং এর সাথে বারো ঘন্টা যুদ্ধের ধকল সামলাতে একটি ঘন্টা ঘুমালেন তিনি। মাত্র একটি ঘন্টা। আমাদের ঘুম ভাঙল ডাক্তার সাহেবের স্বরে, ‘মা কী হয়েছে ডান চোখে?’

সকাল আটটা থেকে জনা বিশেক রোগী দেখা। দশটার সময় ডাল-ভাত খেয়ে রওনা দিলেন আরেকটি হাসপাতালে। পথে আমাদের নামিয়ে দিলেন কম্বল গ্রামের কাছাকাছি। সকাল এগারোটা থেকে জুম’আর সলাতের বিরতি বাদ দিয়ে আসর পর্যন্ত রোগী দেখলেন তিনি। মাসে মাত্র দু’বার আসতে পারেন তিনি–ভিড় হয় অনেক। আসরের সলাত পড়ে করলেন একটি ছোট অস্ত্রোপচার। গ্রামের হাসপাতাল, অস্ত্রোপচারের সবগুলো জিনিস তাকেই গোছাতে হয়। তিনিই নার্স, তিনিই সাহায্যকারী, তিনিই ডাক্তার।

এরপরেও শেষ রোগীটির সাথেও হেসে কথা বলেছিলেন তিনি। নিজ চোখে দেখা। বাজারে নামলেন নানার জন্য দই কিনবেন বলে। গ্রামে এলে বৃদ্ধ নানার সাথে একবার দেখা করে যান তিনি। আত্মীয় অনেক, সম্পর্ক আছে সবার সাথেই। মাত্র দশমিনিটে যতজনের সাথে হাত মেলালেন তাতে বুঝলাম জীবনে একবার যাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন তারা ডাক্তার সাহেবকে ভোলেনি।

মাগরিব পড়ে ধুনটে নিজ হাতে গড়া হিফজখানাতে ফিরে এলেন। আমাদের ঘুরে দেখালেন পুরো প্রজেক্ট। তার নিজের দুই সন্তান পড়ে হিফজখানাতে। অন্যের বাচ্চাকে কুরআন মুখস্থ

করতে বলবেন আর নিজের বাচ্চারা খালি দুনিয়ার পেছনে ছুটবে? ব্যাপারটা মুনাফেকি মনে হয়েছে তার কাছে। নিজের সন্তানদের মতো তার প্রতিষ্ঠানের বাচ্চাগুলোকেও তিনি এমনভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন যেন তারা কুরআন হিফজের পাশাপাশি মূলধারার পড়াশোনাতেও পিছিয়ে না থাকে।

প্রতিষ্ঠানের সমন্বায়কের সাথে বসলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে কথা বললেন। কী দরকার শুনলেন, সবার পড়াশোনার খবর নিলেন। প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস সিক্স পাশ করা একটা ছেলে কীভাবে বাংলা পড়তে পারে না—এটা তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। সেইজনই তার এই প্রয়াস। বেশ কয়েকজন গ্রামের মানুষের সাথে কথা বললেন তাদের কাজ নিয়ে। কিছুটা দিক নির্দেশনা দেওয়া, কাজে উৎসাহ দেওয়া। খালি মুখে চিড়ে ভেজে না। এই মানুষগুলোদের তিনি কর্দে হাসানা দিয়েছেন—সুদ ছাড়াই ঋণ। কাউকে গরু, কাউকে ভ্যান, কাউকে সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছেন। দিয়েই কাজ শেষ না, খোজখবরও রাখতে চেষ্টা করেন ভদ্রলোক। দু'দিনে এক মাসের কাজ করা সহজ ব্যাপার না। ডা. ইবাহ্রিম সেটা করেন। তিনি পরিকল্পনাও করেন। এ বছর আমরা কম্বল কিনলাম সিরাজগঞ্জের কাজিপুর এলাকার শিমুলদহ গ্রাম থেকে। তিনি খোঁজ নেওয়া শুরু করেছেন কোথায় ঝুট কাপড় পাওয়া যায়। তার গ্রামের মহিলাদের একসাথে করে কম্বল বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় কীভাবে। ভালো সুতার দুই সেলাই—এমন কম্বল যার দশ বছরেও কিছু হবে না। আগামী বছর যেন আমরা নিজেরা কম্বল তৈরী করতে পারি।

গ্রাম থেকে বাজার করেন তিনি। সস্তায় পান। আহামরি আয় নয় তার। অপেক্ষায় আছেন—এফসিপিএস পরীক্ষায় উৎরে গেলে আয়ের দিকে হয়ত আরেকটু মনোযোগ দিতে পারবেন। সবজি কিনেছেন। সবটাই তার জন্য নয়। বাসার দারওয়ানকে দেন তিনি—উপহার হিসেবে। দারওয়ান তার ভাই, তার মতোই গ্রাম থেকে উঠে আসা মানুষ—তাজা সবজি পেলে খুশি হয়।

এরপর ফেরা ঢাকার পথে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তার এক টায়ার মেকানিকের বন্ধুর সাথে বসে চা খেলাম। রাস্তায় আটকে পড়লেই ট্রাক চালকদের কাছে বিনীত অনুনয়–ওস্তাদ একটু যেতে দেন। ৩৩ ঘন্টার ঝটিকা সফর শেষে রাত তিনটায় ঢাকায় পৌছলাম আমরা। অনুরোধ

করলেন সরোবরের কোনো কাজে যেন তাকে নেই, অন্য কিছু না হোক এক্সট্রা ড্রাইভার হিসেবে যেন সুযোগ দেই। গাড়ি যে তিনি ভালো চালান আমি তো দেখেছিই।

ডা. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ কারো কাছে শুধুই একজন সরকারী চাকর। কারো কাছে তিনি সহৃদয় ডাক্তার যিনি বিনে পয়সার চোখ দেখে দেন। ওষুধ দেন। কারো কাছে তিনি সমাজসেবক। কিছু অসহায় ছেলের কাছে তিনি আশ্রয়দাতা, শিক্ষাদাতা। কারো কাছে তিনি বন্ধু।

আমার কাছে তিনি একজন অতি মানব। কোনো চামড়া-আঁটা পোশাক পড়া অতিমানব নন। মোটা চশমা পড়া হাস্যোজ্জল একজন মহামানব। যাদের দেখলে জীবনে কেন বেঁচে আছি এ প্রশ্নটা ঘুরপাক খায়। মনে হয়, অতিমানব না হতে পারি, মানুষ তো হই। পশুর মতো ঘুম-খাওয়া-মলমূত্র বিসর্জন-প্রজননের চক্র থেকে বেরিয়ে তো আসি।

৪ সফর, ১৪৩৫ হিজরি।

পথ হারাবে না বাংলাদেশ

বিজয় সরণির মোড়ে বিশাল বিলবোর্ডে একটা মেয়ের ছবি। বস্ত্রবালিকা। হাতে টিফিন বাটি। প্রথম আলোর মতে এই মেয়েটির হাতে দেশ।

আসলে মেয়েটির হাতে দেশ নেই—আছে একটা বাটি। এমন বাটি অনেকগুলো দেখেছিলাম রানা প্লাজাতে। ভাতের বাটি। সাদা ভাত। তরকারি ছিল হয়ত কোনো কোনোটাতে। চোখে পড়েনি। ক্রমাগত লাশ সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। মাঝে মধ্যে আহত মানুষ। ভাতের বাটির কী দাম আছে? বস্ত্রশ্রমিকদের হাতে দেশ থাকে না। দেশ থাকে তাদের হাতে যারা শ্রমিকদের পুড়িয়ে মারে। কিংবা কংক্রিট চাপা দিয়ে। কিংবা পদতলে পিষ্ট হয়ে। তারা সরকারের সাথে বসে মুলামুলি করে—৫৩০০ টাকা বেতন? ফাজলামো পেয়েছ?

যা কিছু ভালো তার সাথেই প্রথম আলো। তারা ভালোই জানে দেশ কাদের হাতে। তবে সেটা তারা আমাদের বলবে না। অন্তত বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলবে না। তারা বয়ান দেবে—নিরাপদ কাজের পরিবেশ চাই। শিক্ষা চাই। মনের কথা খুলে বলতে চাই। মনের কথা বলতে গিয়ে যদি কেউ গ্রেপ্তার হয়, কিংবা কাউকে পিটিয়ে আধমরা করা হয় তখন কিন্তু প্রথম আলো আপনাদের সে ঘটনা বলবে না। সব ঘটনা সবার জানতে হয় না। জানলে আপনারা ভালো থাকবেন না যে।

কৃষকের হাতে কাস্তে। আমাদের মনে আশা জাগে সোনালী ফসলের। বাংলাদেশ পথ হারাবে না। বাংলাদেশের ফসল পাশের দেশ কেটে নিয়ে গেছে। পথ হারিয়ে যাবে কই বেচারা? চারপাশ থেকে বন্ধুত্বের নাগপাশ যে! প্রথম আলো বলবে না কৃষকেরা কেমন আছে। বলবে না কেমন করে আমাদের নদীগুলো মরে যাচ্ছে। নদীর বুক দিয়ে বন্ধুর গাড়ি চলছে। খালি বলবে কৃষকেরা ভালো আছে। মডেল কৃষকের মুখে হাসি, হাতে কাস্তে । ভোঁতা কাস্তে। ধার আছে রামদাতে। সেটা হাতে ছাত্রলা দেশ পাহাড়া দিচ্ছে।

মহাখালির উড়াল সেতুর নীচে হীরের দ্যুতি আর অর্ধনগ্ন নারীদেহ দেখার পরে প্রথম আলোর সুশীল বচন দেখতে পাওয়া যায়। বিলবোর্ডটির ভাড়া মাসে লাগে ৪০ লক্ষ টাকা। বিজয় সরণিতে দিনে লাখ টাকার কাছাকাছি।

বিজ্ঞাপন মানুষ কিসের জন্য দেয়? কিছু বেচার জন্য। গার্মেন্টস মালিকেরা খুব খারাপ। তারা শ্রমিকদের শোষণ করে কাপড় বেচে । অসহার শ্রমিকদের দেখে আমাদের মনে সহানুভূতি জাগে। আমাদের কাছ থেকে এই সহানুভূতিটা নিয়ে আমাদের কাছেই বিক্রি করে প্রথম আলো। আর বিক্রি করে ভালো থাকার মিথ্যে অনুভূতি। আপনার মগজে কোষে ঢুকিয়ে দেয় আপনার হাতেই ক্ষমতা আছে। উটপাখি নয় দাদা, আপনি এখন মানুষ হয়েচেন।

হোক না হরতাল । দেশের আইন-শৃংখলা বাহিনী এখন আর চোর-ডাকাত ধরে না । ছাত্রদের ধরে, সাধারণ মানুষ ধরে । দাড়ি দেখলে গা হাতড়ায়। কাউকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। সারাজীবনের জন্য পঙ্গু। বিনা বিচারে গুলি চলে । নিজের দেশের মানুষদের বুকে । যে রাজার নাম ছিল স্বৈরাচারী সেও এমন কাজ করেনি। আমাদের করের টাকা এখন আর রাস্তা বানাতে খরচ হয় না। বুলেট কিনতে খরচ হয়। আমাদের নাম লেখা আছে হয়ত সে বুলেটে। প্রথম আলো বলেছে যাদের মারা হয়েছে সব জঙ্গি। এদেরকে এভাবে মারলে কোনো সমস্যা নেই। আসুন আমরা ফাঁসি চাই। মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনা আজ মৃত্যুময়।

প্রিয় বন্ধুসভার বন্ধুরা, এখন দেশ আপনাদের হাতে আছে । ভালো আছে। সুপথে আছে। যা বদলানোর বদলে গেছে। এখন থেকে এভাবেই চলতে থাক। আপনারা চিন্তা করবেন না। জয় সাইকেল বাংলাময় বিজ্ঞাপন দেখুন। আনন্দ সংগীত গাইতে থাকুন। আর ঘুমান। বাস্তব জীবনে চলতে থাকা বন্ধুদেশের বানানো সিরিয়াল দেখেও না দেখার ভান করে ঘুমিয়ে পড়ুন।

৯ মুহাররম, ১৪৩৫ হিজরি।

মাহশি

মধ্যপ্রাচ্যের আর দশজন সাধারণ ভদ্রমহিলার মত তিনিও একজন। পরিবারের দেখভাল করেন। স্বামী অফিস থেকে ফেরার পথে তাকে ফোন দিলে তিনি খাবার গুছিয়ে বসেন ঘরে ফেরার অপেক্ষায়। একসাথে খাওয়া। ঘুম। রাত তিনটার সময় অ্যালার্ম বেজে ওঠে তার। ঘুম ঘুম চোখে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে হাত বাড়ান। বন্ধ করে ফের চোখ বুজবেন এমন সময় সূরা ত্ব-হা এর আয়াতটা মনে আসে তার।

عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ

মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন কথাটা আল্লাহকে। তার অনুসারীরা হেটে নাগাল পায়নি মুসার। তিনি একাই চলে এসেছেন সবার আগে। আল্লাহ জানেন সবই তাও জিজ্ঞাসা করলেন, বাকিরা কোথায়? পেছনেই আছে; আসছে—জানালেন মুসা।

আমি তাড়াহুড়ো করেছি – عَجِلْتُ

إِلَيْكَ – আপনার দিকে

رَبِّ – রব্—বিশ্ব চরাচরের মালিক, প্রভু, আহারদাতা, পালনকর্তা, পূর্ণতাদানকারী, সংরক্ষণকারী, নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালনাকারী....

لِتَرْضَىٰ – সন্তুষ্টির জন্য

তড়িঘড়ি করে বিছানা ছাড়েন ভদ্রমহিলা। সলাতে দাঁড়ান। রবেক সন্তুষ্ট করার জন্য। সেই রব্ যিনি আমাদের কাছে খাদ্য চান না, অর্থ চান না। যাকে দেওয়ার মতো আমাদের কোন সম্পদ নেই। যিনি খালি দেনই, কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই দেন। আমাদের রব্ আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অমুখাপেক্ষী। কিন্তু আমরা কৃতজ্ঞ হলে তিনি খুশি হন। আমরা তাকে খুশি করতে চাই। এ জীবন এবং যা দিয়ে তিনি এ জীবনটা সাজিয়ে দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।

এ কথাগুলোই ভদ্রমহিলা বলেন তার কুরআন ক্লাসের ছাত্রীদের। যখন সলাতের সময় হবে, আযানের আহবান শোনা যাবে তখন সব কাজ ফেলে ছুটবে সলাত আদায়ের জন্য। ত্রস্ত পায়ে আল্লাহর দিকে এগিয়ে এলে হয়তোবা তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

মাহশি একটি মেডিটারেনিয়ান খাবারের একটি বিখ্যাত পদ। ভাত-মাংশ মাখানো হয় রসুন, দারচিনি, গোলমরিচ আর লেবুর রস দিয়ে। এরপরে আঙুর পাতায় মুড়ে রান্না করতে হয়।

কুরআন শিক্ষিকার স্বামী একদিন আবদার করলেন মাহশি খাবেন বলে। কাজটা করতে সময় লাগে অনেক। আর মাত্র তিনটা আঙুর পাতা বাকি এমন সময়ে আযান পড়ল। ভদ্রমহিলা হাতের কাজটা সেভাবেই রেখে গেলেন সলাত আদায় করতে।

ফোনের পর ফোন বেজে চলেছে, কেউ ধরছে না। চিন্তিত স্বামী কাজ থেকে ঘরে ফিরলেন। টেবলের ওপরে রান্না না করা মাহশিগুলো সাজান। স্ত্রী ঘরের কোণে সিজদায় অবনত। অনুযোগের স্বরেই বললেন স্বামী, বাকি তিনটা পাতা শেষ করে চুলোর রান্নাটা বসিয়ে তো সলাত পড়তে পারতে। সেই কখন থেকে ফোন করছি, কতক্ষণ থাকা লাগে সিজদায়?

ভদ্রমহিলা যেমন আছেন তেমনই রইলেন।

অজানা আশঙ্কায় ভদ্রলোকের বুক কেঁপে গেল। স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করে দেখলেন হিম শীতল। বুঝলেন অনেকক্ষণ আগে সিজদাতেই মারা গেছেন তার স্ত্রী। হয়ত হাতের কাজ শেষ করার জন্য অপেক্ষা করতে হলে রান্নাঘরেই মৃত্যু হতো তার।

আল্লাহর কাছে দ্রুত ফিরে যাওয়া মানুষটিকে আল্লাহ তার সবচেয়ে কাছে থাকা অবস্থাতেই তুলে নিলেন।

আমরা পার্থিব কাজগুলোর জন্য ব্যস্ত হই। সেসব আঙুর পাতার জন্য ব্যস্ত হই যার পরিণতি অপবিত্রতায়। অপার্থিব, অনন্ত জীবনের কাজগুলোর বড় অনাদর। পবিত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে যাত্রায় আমরা ধীর, উদাসীন।

অসুস্থতা নেই আমাদের এখন। ব্যাথা নেই দেহের কোথাও। ক্ষুধার জ্বালাও নেই। আছে মাথার ওপর একটা ছাদ। আছে দেহে চমৎকার পোশাক। ঠিক এই মূহুর্তে একটু চোখটা বন্ধ করি। আরো কী কী নি'আমত ভোগ করছি আল্লাহর এক লহমায় ভেবে নেই।

চোখ খুলি। নিজেকে প্রশ্ন করি, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কী করি?

আমরা যা প্রতিনিয়ত যা করি তার প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে আমাদের মৃত্যুতে। আমাদের মৃত্যুর প্রতিফলন ঘটবে আমাদের পুনরুত্থানে। আল্লাহ যেন আমাদের তার সন্তুষ্টিতে বাঁচা আর তার তুষ্টিতে মরার তাওফিক দেন আমাদের। আমীন।

১২ জুল হিজ্জা, ১৪৩৪ হিজরি।

সরোবর

ইকবাল রোড থেকে রিক্সায় উঠেছি বাসায় আসব বলে। রিকশাওয়ালা সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেটের অপকারীতা নিয়ে অনেক কথা বললাম।

– ভাই আমি যে টেনশনে আছি...পরিবারের তিনজন মানুষ অসুস্থ। কীভাবে কি করব বুঝে উঠতে পারতেছি না।

বহুল প্রচলিত যুক্তি। ক্যাঁক করে ধরলাম, উনারা অসুস্থ কবে থেকে?

– এই তো কয়েক সপ্তাহ।

– আপনি সিগারেট খান কবে থেকে?

ভদ্রলোকের মুখে আর কথা সরল না।

উনাকে বুঝালাম উনি সিগারেট খেলে মা সুস্থ হয়ে যাবে না। প্রথম কাজ ধৈর্য ধরা। ব্যাপারটাকে একটা বিপদ হিসেবে নেওয়া এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। দ্বিতীয় কাজ চিকিৎসা করান। টাকা? সেটার জন্যও আল্লাহর কাছে বলতে হবে, তার উপরে ভরসা করতে হবে। আর কষ্ট করতে হবে। একবেলায় জায়গায় দুবেলা রিক্সা চালাতে হবে। সেই সামর্থ্যও যেন আল্লাহ দেন সেটা আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। অপব্যয়, যেমন বিড়ি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে ভালো চিকিৎসা করার জন্য।

এরপরে কথা প্রসঙ্গ সরে গেল। একটা রিক্সার জমা এক বেলায় একশ টাকা। আর আল্লাহ যে আমাদের হাত-পা দিলেন, পুরো শরীরটা এক জীবনের জন্য আমাদের কাছে জমা নিলেন তার জন্য আল্লাহ কোনো টাকা জমা নেন না। তিনি চান আমরা যেন শরীরটার যত্ন নেই। বিড়ি-সিগারেট খেয়ে ফুসফুসের বারোটা না বাজাই। কোনো রিক্সার মালিক যেমন পছন্দ করবে না রিক্সাওয়ালারা রিক্সার ক্ষতি করুক তেমনি আমাদের দেহের মালিক আল্লাহও পছন্দ করেন না আমরা আমাদের দেহের ক্ষতি করি। এজন্য তামাক-মদ-হেরোইন-গাঁজা সহ যাবতীয় নেশার বস্তু মুসলিমদের জন্য হারাম করেছেন আল্লাহ। মানুষ যখনই আল্লাহর আইন

অমান্য করে সে নিজের আত্মার উপরে যুলম করে, দেহের উপরে অত্যাচার করে, সমাজের জন্য অনিষ্ট বয়ে আনে।

কথায় কথায় বাসায় পৌছে গেলাম। ভাড়া দিলাম। বললাম একটু দাঁড়ান। একজন বোনের দেওয়া জাকাতের টাকা ছিল ২০০০। তার সাথে আরো ১০০০ যোগ করে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললাম, মায়ের চিকিৎসা করেন। আর যদি কোনো দরকার থাকে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করেন। পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে সিজদায় তাঁর সাথে দেখা করেন।

২.

সাভারে রানা প্লাজার বিপর্যস্তদের সাহায্য করার জন্য একটি সংগঠন তৈরি করতে হলো। হুট করে নাম দিয়েছিলাম 'সরোবর'। সরোবর মানে বিশুদ্ধ পানির হ্রদ। সংগঠনটির মাধ্যমে প্রায় দশজনকে রিক্সা আর ভ্যান দেওয়া হয়েছে। প্রায় একশজনকে প্রশিক্ষণসহ সেলাই মেশিন। গরু কিনে দেওয়া হয়েছে চারজনকে। ব্যবসা করার মূলধন একজনকে। যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকের পরিবারের উপার্জনক্ষম মানুষটি রানা প্লাজা থেকে পাখা মেলে আকাশে উড়ে গেছে। সংবাদপত্রের ভাষায় নিখোঁজ। স্বজনদের ভাষায় মারা গেছে, লাশ গায়েব হয়েছে। যত কম লাশ তত কম ক্ষতিপূরণ। অনেকে আহত। অনেকে নিহত।

একদিন কী মনে হওয়ায় তালিকার মানুষদের ফোন দিলাম। কী আশ্চর্য, যাকে জিজ্ঞেস করি সেই বলে কিছু পায়নি। আমার চোখের সামনে ছবি, সে রিক্সা নিচ্ছে—অথচ বেমালুম অস্বীকার করে গেল। যতই জিজ্ঞেস করি ততই বলে, কিচ্ছু পাইনি। শেষমেশ বলল, আর্মির দেওয়া ২০ কেজি চালের কথা, বিকাশের পনের হাজার টাকার কথা। আমাদের বিশ হাজার টাকার রিক্সাটা? মনে করিয়ে দিতে বলল, হ্যা রিক্সাও একটা পাইছি একখান থেকে। আমরা নাম নেইনি, তাই নাম না উল্লেখ করাতেও সমস্যা নেই কিন্তু একটা মানুষ লোভে মিথ্যা বলবে কেন? অকৃতজ্ঞ হবে কেন? সেলাই প্রশিক্ষণসহ মেশিন পাওয়া একটা মেয়ে এত তাড়াতাড়ি এভাবে চোখ উল্টিয়ে ফেলবে?

প্রথমে কষ্ট পেয়েছিলাম। রেগে গিয়েছিলাম। ভাবলাম যাহ কাজ করবই না আর। পরে ব্যাপারটা নিয়ে একজন সমাজসেবার স্কলারের সাথে বসলাম। তিনি বললেন, এটা ডিফেন্সিভ মেকানিসম। সে যদি বলেছে সে পেয়েছে তাহলে তো আর পাবে না। কিন্তু অভাব

তো তার আছেই। সুতরাং সে অস্বীকার করবেই। বিকাশ আর আর্মির কথা স্বীকার করেছে কারণ সেগুলো প্রতিষ্ঠিত সংস্থা। যদি অস্বীকার করে তাহলে বিপদ আসতে পারে। সরোবর কোথাকার কী… আমাদের কাছে সত্য কথা বলার দরকার নেই তাদের।

মানুষের জন্য মানুষকে নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার খুব বেশি দিনের নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে বন্যার্তদের জন্য টাকা তুলেছিলাম সোবহানবাগ কলোনীতে। কেউ দিয়েছিল, কেউ বলেছিল মাফ কর। পাশের বিল্ডিং-এ ভিক্ষুক থাকে—এ জ্ঞান হয়ত ত্যক্তও করেছিল অনেককে। আমি সমাজকর্ম বলতে তখন ওটাই বুঝি—টাকা তুলে প্রথম আলোর হাতে তুলে দেওয়া। গরীব মানুষের টাকার দরকার—এর বাইরে কোনো বোধ ছিল না। কিন্তু যখন থেকে নিজে মাঠে কাজ করা শুরু করলাম, দেখলাম আমাদের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য নয়—অলসতা এবং অসততা। একটা চারশ টাকার কম্বলের জন্য মানুষ সারাটা দিন নষ্ট করবে, দরকার হলে চারশ টাকার দিনমজুরের কাজও বাদ দেবে। আল্লাহ দুটো হাত, দুটো পা দেওয়ার পরেও ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের কথা বলবে, গরিবী গাঁথা শোনাবে। দরকার হলে মিথ্যা বলবে একটা কম্বল বেশি নেওয়ার জন্য। আবার নেওয়া শেষে আরেকবার মিথ্যে বলবে, আমরা নাকি যারা আসল গরীব তাদের দেইনি। একটা গ্রামের পাঁচশ পরিবার থেকে একশ পরিবার বেছে নেওয়া কতটা কঠিন আমরা জানি। কত সময় লাগে, কত বাসা ঘোরা লাগে—এটা যে করেনি সে বুঝবে না। ঢাকা থেকে এত কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পর যখন শুনি সৌদি কম্বল আমরাই খেয়ে নিচ্ছি তখন বুকটা কীভাবে ভেঙে যায় এটা বলে বোঝানো যাবে না।

আমরা যদি সাধারণ মানুষ হতাম তাহলে বলতাম, যারা গরীব তারা গরীবই থাক। আল্লাহ তাদের গরীব বানিয়েছে তাদের এই খাসলতের জন্য। এই সমস্ত সমাজসেবা বন্ধ করে এনজিও ব্যবসা শুরু করতাম। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে গলায় পাড়া দিয়ে আদায় করতাম টাকা। কিন্তু আমরা পারি না। কারণ আমরা মুসলিম। আমরা নিজেরাই আল্লাহর নি’আমাতের কত অকৃতজ্ঞ, মানুষকে কীভাবে দোষ দেই। মানুষের এই সামান্য কথাও যদি আমরা ক্ষমা করতে না পারি তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাব কীভাবে? আল্লাহ আমাদের সম্পদে এই গরীব মানুষদের হক রেখেছেন। আমাদের সেটা আদায় করতেই হবে। নাহলে তারা হয়ত মুক্তি পেয়ে যাবে, আমরা আটকে যাব।

সমস্যাগুলো তলিয়ে দেখলে দেখা যায় মানুষের অকৃতজ্ঞতা, অলসতা, অসততা সব কিছুর পেছনে আছে আল্লাহকে না চেনা, না জানা। সত্যিকার অর্থে মুসলিম না হতে পারলে মানুষ বুঝবে না এই পৃথিবীতে সে কেন এসেছে। সে খালি সুযোগ খুঁজবে আরামের। কম কষ্ট করে কীভাবে টাকা পাওয়া যায় সে ফিকির করবে। আত্মসম্মানবোধ খুইয়ে হাত পাতবে। কখনও জানবে না আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ক্ষুধার জ্বালায় মদীনার রাস্তায় গড়াগড়ি করতেন কিন্তু তাও কাউকে বলতেন না পেটের আগুনের কথা।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা যে মানুষকে দীনহীন অবস্থার জন্য দায়ী এটা সেকুলার কাউকে বোঝানো যাবে না। অভাব সম্পদের স্বল্পতায় নয়, ঈমানে স্বল্পতায়—এটা বুঝতে হলে অনেক পথ হাটতে হবে। যখন লালমনিরহাটে চরের মাদ্রাসায় বিকেলবেলায় আপনি আট বছরের একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করবেন সে আজ দুপুরে কী দিয়ে ভাত খেয়েছে, সে চুপ করে থাকবে। তরকারি তো দূরের কথা, তাদের মাদ্রাসার চাল যে গত রাতে শেষ হয়ে গেছে সেটা সে আপনাকে বলবে না। প্রায় অন্ধ এক ইমাম আপনাকে বলবে না সে তার পৈত্রিক সম্পত্তির পুরোটাই অন্ধদের মাদ্রাসাতে দান করে সে এখন নিজের দেশের বাড়িতে মুসাফির। এই আত্মসম্মানবোধ ঈমান থেকে আসে। দুনিয়াতে রিক্সা চালিয়েও তাই একজন মুসলিম কারো কাছে হাত পাতবে না, সে জানে নীচের হাত থেকে উপরের হাত ঢের ঢের ভালো। সে ভিক্ষুককে দুটাকা ভিক্ষে দেবে; কাউকে ঠকিয়ে পাঁচ টাকা ভাড়া বেশি নেবে না।

এই ব্যাপারগুলো যবে থেকে বোঝা শুরু করলাম তখন থেকে এটাও মাথায় আসল আমাদের অবুঝ, জ্ঞানহীন ভাইদের আমরা এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। এই দেশে অধিকাংশ আব্দুল করিমের মধ্যে নাম ছাড়া ইসলাম খুবই সামান্য। গরিবী হঠাতে ইসলামকে আনা লাগবে। মানুষকে ইসলাম বোঝাতে হবে। এই দুনিয়ার কষ্টের বিশাল পুরষ্কার যে জান্নাত তার সুসংবাদ মানুষকে দিতে হবে। তবে শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না। সহানুভূতিটা মন থেকে আসতে হবে। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেটে দুটো পাথর বেঁধেছিলেন বলেই যার পেটে একটা পাথর বাঁধা তার কষ্টটা ধরতে পেরেছিলেন। মানুষজনের জন্য কাজ করতে হলে মানুষের কাছে যেতে হয়। ধান গাছের নৌকায় বসে মানুষের জন্য কাজ করা যায় না।

৩.

বান্দরবানের লামার কথা। আমরা টেম্পু চড়ে যতদূর যাওয়া যায় গেলাম। লক্ষ্য একটি পাহাড়ি মাসজিদ। চেয়েছিলাম দিনের আলো থাকতেই যাব কিন্তু খাবার জন্য চাল-ডাল-মশলা আর একটা মুরগি কিনতে দেরি হয়ে গেল। সবাই প্রকৃতিকে কিছুটা সময়ও দিয়ে এল। মাগরিবের সলাতের পর রওনা। পাহাড়ে সন্ধ্যা আসে ঝুপ করে। ভাগ্যিস সে গ্রামের কিছু ভাইয়েরা কম্বলগুলোর বোঝা সিংহভাগই কাঁধে নিয়েছিল। অন্ধকারে পথ। কখনও বালু, কখনও কাদা, কখনও কাঁটা, কখনও পাথর। শীতের রাতে যখন ঝিরি পার হতে হয় তখন মোজাসহ কেডসের দশারফা। দু ঘন্টা হাটার পরে এসে পৌছলাম সে মাসজিদে। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনেকটা জায়গা কিনে দিয়েছিলেন নওমুসলিমদের বাস করার জন্য। অনেক জায়গা এখন বেদখল। যিনি মাসজিদের ইমাম তিনিই মুয়াজ্জিন, তিনিই বাচ্চাদের শিক্ষক। বাচ্চারা ইসলাম শেখে, বাংলা-ইংরেজি শেখে। পরের দিন ভোরে রওনা দিলাম কাছের আরেকটা গ্রামে কম্বল দিতে। ৬০-৬৫ ডিগ্রি খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হয়। তারপর নাম, তারপর আবার ওঠ, কিছুটা সমতল। আবার পাহাড়, ঝিরি। প্রায় ঘন্টা দেড়েক চলার পরে সেই গ্রামে এসে পৌছলাম আমরা।

পুরোটাই খ্রিষ্টান গ্রাম। হেডম্যান জানালেন শিশু বয়সে খ্রিষ্টান হয়েছেন তিনি। বয়স তার চল্লিশেক। খৃষ্ট ধর্মের বার্তাবাহকেরা তাহলে কত আগে এসেছিল এ গ্রামে? আরো কত দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাদের? তারা কিন্তু টাকা ছড়ায়নি। খালি সাধারণ মানুষকে বলেছে তোমরা যে এই পাথরকে শ্রদ্ধা কর—এটা তো তোমাদের কিছু দিতে পারে না। তোমরা যিশুর প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, পরকালে স্বর্গ দেবেন। যিশু যে মানুষ, আর মানুষ হয়ে যে মানুষের পূজা করা যায় না এ কথা ঐ গ্রামে আমাদের আগে কেউ বলেনি। ওই গ্রামে 'বাঙালি'রা এসেছে। গরু চুরি করেছে, ফসল কেটে নিয়ে গেছে, মেয়েদেরও ধরে নিয়ে গেছে সুযোগ পেলে। কিন্তু আল্লাহর কথা কেউ বলেনি। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কেউ আসেনি। সাহায্য করা তো দূরে থাক।

আমরা খ্রিষ্টানদের দোষ দেই তারা সবাইকে ধর্মান্তরিত করছে। তারা তাদের বিশ্বাস প্রচার করছে আর আমরা তাদের গালি দিয়ে খালাস। আমাদের কী উচিত ছিল না পাহাড়িদের বাংলা-ইংরেজি-অঙ্ক শেখানোর জন্য একটা স্কুলের ব্যবস্থা করা? আমরা করিনি তাই বিদেশি মিশনারিরা করেছে। দোষ কাদের? আমাদের কী উচিত ছিল না উত্তরবঙ্গের সাওতালদের

জন্য একটা হাসপাতালের ব্যবস্থা করার। চাওয়াটা বোধহয় একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের মুসলিম মাদ্রাসার বাচ্চাদেরই আধুনিক শিক্ষা দেই না। আমরা শহরের রিকশাওয়ালাদের বউদের জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা করি না। কোথায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আর কোথার মঙ্গাপীড়িত এলাকা। যারা নিশ্চিত তাদের ধর্মগ্রন্থ মানব রচিত তারা নিজেদের জীবন সেই মিথ্যা বিশ্বাসের পেছনে খরচ করছে। আর যারা নিশ্চিত তাদের ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার শব্দ রক্ষিত আছে তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। জবাব আমাদের দিতে হবে—মরণ আসুক খালি।

৪.

আমরা সরোবরের মাধ্যমে অন্যরকম একটা উদ্যোগ নিয়েছি। এটা ভুড়িওয়ালা, আরামপ্রিয়, স্বার্থপর মানুষদের জন্য না। চিন্তাশীল মুসলিমদের জন্য। যারা একটু বাক্সের বাইরে ভাবতে ভালোবাসেন। যারা সামাজিক থিঙ্কট্যাঙ্কের গুরুত্ব বোঝেন। যারা নিছক সমালোচনার উর্ধ্বে উঠে সত্যি সত্যি সমাজকে বদলানোর দায় অনুভব করেন তাদের জন্য।

আমাদের উদ্দেশ্য সমাজের দুটো প্রান্তের মাঝে একটা যোগসূত্র করা, শহুরে চশমা পড়া চোখের সামনে দারিদ্রের, বাস্তবতার রূপ তুলে ধরা। আমাদের মধ্যে যাদের মানবতাবোধ আছে তাদের চোখটা খুলে দিলে তারা দুনিয়াটাকে অন্যভাবে দেখা শুরু করবে। আমাদের কাছে স্বশরীরে অংশগ্রহণ অনেক বড় ব্যাপার। যে দিনাজপুরে মাদ্রাসার টিনের বেড়ার নীচ দিয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসে শোয়নি সে কখনও বুঝবে না শীত কী! সে বুঝবে না সে কত সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তাকে কত নি'আমাত দিয়েছেন। যখন মানুষ নিজের আত্মার কাঁপনে বুঝতে পারবে অন্যের কষ্ট—তখন সে মানুষের জন্য কী করা যায় তা ভাবা শুরু করবে। যাকাতের টাকাতে লুঙ্গি আর শাড়ি দান করে মিথ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে না। শুধু অর্থ নয়, আমাদেরকে দেওয়া মেধাতেও যে আল্লাহ গরীব মানুষের হক রেখেছেন সেটা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝব তত মঙ্গল।

আমরা কীভাবে একজন অসৎ, অলস, খারাপ মানুষকে বদলে দিতে পারি? প্রথমত, তার অবস্থাটা বুঝতে হবে। সহানুভূতি মেশানো একটা হাসি দিতে হবে। এরপরে কেন সে জীবনে বাঁচবে সে কথাটা বোঝাতে হবে। পরিশ্রমের মূল্য বলতে হবে। তৃতীয়ত, কিছু অর্থ দিয়ে

পুঁজি তৈরি করে পথ নির্দেশনা দিতে হবে। মাছ কিংবা মৌমাছি যেটাই চাষ করুক সেটা ভালোভাবে শেখাতে হবে। ব্যবসা করার কিছু বুদ্ধি দিতে হবে। তারপরে সাথে থেকে দেখতে হবে সে কাজগুলো করতে পারছে তো? একদিন আমরা দেখব সামান্য একটা সাহায্য মানুষের জীবনকে কীভাবে বদলে দিতে পারে। আমরা সে চেষ্টাতেই আছি।

৫.

আজ মাসজিদ থেকে আসরের সলাত পড়ে বের হয়ে দেখি সেই রিকশাওয়ালা ভাই। গতকাল তার মা রংপুর থেকে একটা বস্তা পাঠিয়েছেন, ঢাকার না দেখা ছেলের কাছে। কী আছে সেই বস্তায়? পাকা পেপে, একটা লাউ, এক বয়ম গুড়, জলপাই, মুড়ি, বেলের মোরব্বা। আরো ছিল ভালোবাসা। সেটা বস্তায় ভরা যায়নি। চোখ বন্ধ করলেই সেই রংপুর থেকে ভেসে আসে। ইথার লাগে না, বাতাস লাগে না। মন থেকে মনে ভেসে আসে। জানালেন তিনি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন। গ্যারেজেই নামাজ পড়েন তবে চেষ্টা করবেন মাসজিদে পড়তে। আলহামদুলিল্লাহ। একজন মুসলিমের জীবনে আর কী চাওয়ার থাকতে পারে!

কল্যাণকর কাজের কাফেলাটাকে আল্লাহ সবসময়ই গন্তব্যে পৌছে দেন। যারা সে কাফেলায় যোগ দিতে পারেন তারাই আসলে সৌভাগ্যবান, বুদ্ধিমান। ইহকালে ও পরকালে। আল্লাহ যেন আমাদের সবার এই কল্যাণকামীদের দলে স্থান করার তাওফিক দেন। আমিন।

৬ জুল হিজ্জা, ১৪৩৪ হিজরি।

দালান ধসের বিজ্ঞান

১.

রানা প্লাজার উচ্চতা ছিলো নয়তলা। এখন বড় জোর তলা তিন। ছাদগুলো আলিঙ্গন করেছে একে অপরকে। মাঝে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই, আছে কেবল মেশিন, কাপড়, জঞ্জাল আর মানুষ। মরা মানুষ, জ্যান্ত মানুষ। হঠাৎ হল্লা, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে একটি দেহ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে টর্চের আলো জ্বেলে এদিক ওদিক ঘুরছি। যদি কিছু করা যায়। 'জক' লাগবে—চিৎকার শুনে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ছাদের উপরে আরেকজনের কাছে পৌছে দিলাম 'জক'টা । দুটো স্টিলের টিফিন বাটিতে ভাত পড়ে আছে একখানে। একটু পাশে একটা দেয়ালের ফাঁকা দিয়ে একটা লাশ দেখা যাচ্ছে—তার গলার উপরে একটা পাইপ। পাশে আরেকটা মেয়ে বসা। সেও মৃত। কংক্রিট কাটছে দমকলের মানুষরা। এলাকার ছেলেরা কাঁধ পেতে বের করছে লাশ। কানে এল কথাগুলো, 'হাতটা কেটে ফেল তাহলে বের করা যাবে।' একজন চিৎকার করে জানালো—ভাই ওখান থেকে সরে যান, নীচে ইট পড়ছে। বুঝলাম কোন কাজে আসছি না। বেরিয়ে এলাম।

একটা হাসপাতালে ঢুকলাম। কিছু আহত সেখানে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন? মুখের ভেতরে কেটে গেছে—কথা বলতে পারল না। গোঁফের রেখা ওঠেনি এমন একটা ছেলে এল জরুরি বিভাগে। কতই বা বয়স? ১৪? ১৫? হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখি মধ্যবয়সী একটা লোক হাটুতে মুখ বুঁজে কাঁদছে। পাশের মানুষটি সান্তনা দিচ্ছে—কাঁদিস না, খুঁজে পাবি।

অধরচন্দ্র স্কুল। বনেদি আমলের বিশাল লম্বা বারান্দা। সারি সারি লাশ। মানুষজন লাইন ধরেছে। হেটে যাচ্ছে বারান্দা ধরে। প্রিয়জনের মুখটা চিনতে পারলে ডুকরে কেঁদে উঠছে। নাহ, এত লম্বা বারান্দাতেও ধরেনি সব লাশ। মাঠেও লাশের মিছিল। ধূলায় ধুসরিত লাশ। রক্তমাখা, চেপ্টে যাওয়া মুখগুলো ঢাকা দেওয়া কাপড়ে।

২.

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য কী? মৃত্যু। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপেক্ষিত সত্যও তাই। সাভারের ঘটনা দেখে আমাদের অনেকের অনেক কিছু মনে হয়েছে। মনে হয়নি কেবল আমার নিজের মৃত্যুর কথা। আমরা লোক দেখানো শোক প্রকাশ করি। পতাকা নামিয়ে রাখি। ভবন মালিকের চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করি। চোখ-মুখ শক্ত করে এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। এরপরে কালো ব্যাজসহই লঘু ঠাট্টায় মেতে ওঠা।

পত্রিকায় পড়ি—অকাল মৃত্যু। মৃত্যু অকাল হয় না। আগের দিন বিশ জন আহত হয়েছিল ভবন ছেড়ে পালাতে গিয়ে, সে দালানেই মানুষগুলোকে ঢোকানো হয়েছে। অনেকের মৃত্যু লেখা ছিল। যাদের লেখা ছিল না তারা বেঁচে গেছে। আল্লাহর অভিধানে অকাল বলে কিছু নেই, সব কিছু মিনিট-সেকেন্ড অবধি হিসেব করা আছে । অসময়ে মৃত্যু কথাটা আমাদের আবিষ্কার। আমরা যা পছন্দ করি না তাকে ঠেলে দেই দূরে। আমি ভুলে থাকলেই মৃত্যু আমাকে ভুলে যাবে এমনটি নয়।

আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে সে আসবে। যেখানে আমার মরার কথা সেখানে আমি নিজেই যাব। কথাগুলো আল্লাহ আমাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি না। যখন আল্লাহ আমাদের উদাহরণসহ শিক্ষা দেন আমরা জিহবা দিয়ে তু তু শব্দ করি। আসলে যে এ ঘটনাগুলো আমাদের জন্য শিক্ষা—সেটা বুঝতেও পারি না।

৩.

সাভারে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা তিনশ ছুয়েছে। আহত হাজারেরও বেশি। সহস্রাধিক লাশ চাপা পড়ে আছে এখনও । এ ধরণের যেসব বিপর্যয় প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে স্পর্শ করছে তা মানুষের হাতের কামাই। মানুষের লোভের ফলাফল। জানা লোভ, অজানা লোভ। বিশ্বায়নের এ যুগে শুধু হীরে বা ওষুধ নয় কাপড়েও মিশে আছে রক্ত।

একটি রপ্তানিসমিতির দাবী অনুসারে বাংলাদেশে অন্তত ৯০টি প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড নাইকির জন্য কাপড় তৈরি করে। নাইকির তৈরি বার্সেলোনার একটি রেপ্লিকার জার্সির দাম ৮৫ ডলার[1]। এটি তৈরি করতে আসলে কত খরচ হয়? নাইকির এক কর্তাবাবু যাকে

1 মে ২০১৩ তে ওয়ালমার্টের দর অনুসারে।

বনানীতে বিকেলে সাইকেল চালাতে দেখা যায়, তিনি হিসেব করে দেখলেন জার্সিটির দাম পড়ে ২০০ টাকা। ন্যুনতম মজুরি ৩,০০০ টাকা ধরেই। এখন আপনি-আমি মোটা বুদ্ধিতে ভাবব—২০০ টাকা যদি মোট খরচ হয় তাহলে আড়াই শতাংশ লাভে গার্মেন্টস মালিক পাবে ২০৫ টাকা। কিন্তু লালমুখো সাহেব আমেরিকার আরাম ফেলে ভূ-নরক বাংলাদেশে তো আর সবরি কলা চাষ করতে আসেনি। সে বলবে—১৮০ টাকা। গার্মেন্টস মালিক যেই লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলবে—হোয়াট, তখনই সাহেবের হাত চলে যাবে গার্মেন্টসটির কিছু ফাইলের দিকে। শ্রমিকদের কাজের অবস্থা—অবর্ণনীয়। আগুন নেভানোর ব্যবস্থা—নেই। শিশু শ্রমিক—আছে।

সাহেব আরো লাল হয়ে বলবে, নাহ তোমাকে কাজটা দেওয়া যাবে না—আমাদের ব্র্যান্ডের সুনাম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। গার্মেন্টস মালিক বলবে আচ্ছা অন্তত ১৯০ টাকা দিও। টেবিলের উপরে পুমা ব্র্যান্ডের একজোড়া জুতা দেখা যাবে।

চুক্তি সই করে বের হয়ে যাবার সময় মালিক ভাবতে থাকবে, শালা খবিস। রিয়েল এস্টেট এজেন্ট অটোয়াতে একটা ওয়াটারফ্রন্ট বাড়ি দেখিয়েছিল—এবারের টাকা দিয়ে সেটা কিনে ফেলার কথা ছিলো। যাইহোক, ন্যুনতম বেতন স্কেল নিয়ে আরো ছ'মাস গড়িমসি করতে হবে। পুরনো কিছু শ্রমিককে ছাটাই করতে হবে। ওভারটাইমের টাকা কমাতে হবে। মেরে হোক, পিটিয়ে হোক ঘন্টায় উৎপাদন ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ করতে হবে। একটা জার্সির দাম যেন ১৭৫ টাকা না পেরোয়। বাড়ি কেনা ঠেকায় কোন শালা!

দামী ব্র্যান্ড বাদ দেই, যেই ওয়ালমার্টে আমেরিকার সব শ্রেণীর লোকেরা বাজার করে সেই ওয়ালমার্ট কী করে? মেইড ইন বাংলাদেশ ফ্লিস হুডির দাম ৮.৪৭ ডলার। পলওয়েলে একই জিনিস পাওয়া যায় দেড়শ টাকায়। একদম একই জিনিস। আমাদের নিজস্ব কোন কারখানা নেই, আমরা অন্যদের দিয়ে কাজ করাই। তবে আমাদের মূল ব্যবসা উৎপাদন খরচ কমানো, বলেছিলেন ওয়ালমার্টের এক সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার। দাম কমালে মানুষ আসবেই আসবে। ঔচিত্যবোধ দিয়ে পেট চলে না, মাথা চলে পণ্যের দামের হিসেবে। ওয়ালমার্টের আবার অন্য বুদ্ধিও আছে। এরা পণ্যের দাম দেবে ৯০ দিন পরে—এই মর্মে আগেই চুক্তি করে নেয়। এর মধ্যে তারা কাপড় বিক্রি করে, ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ খায় নয়ত আবার অন্য কোন জায়গায় বিনিয়োগ করে। এই বাটপারিকালীন সময়ে গার্মেন্টসের শ্রমিকদের

বেতন বকেয়া থেকে যায়। এ পৃথিবীতে বড়লোকদের চেয়ে ছোটলোক বোধকরি আর কেউ নেই।

নাইকির মত ব্র্যান্ডগুলোর ব্যবসায়নীতিতে কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটির মতো গালভরা সব ব্যাপার আছে । সেখানে লেখাও আছে[2]-

> While we neither own contract factories nor employ their workers, we can influence their business practices – including wages – through our own sourcing and assessment processes.

কথা সত্য। প্রভাব বিস্তার সাহেবরা করে বটে! মাল্টি-ন্যাশনালরা ফিরিস্তি দেবে কত শতাংশ মজুরি বেড়েছে। তবে তারা বলবে না সুস্থভাবে বেচে থাকার জন্য যে মজুরি দরকার সেটা শ্রমিকেরা পায় কিনা। কেউ জিজ্ঞেস করে উত্তর পাবে না যে ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকাতে ক’টা ব্র্যান্ডের ক’টা কাপড়, জুতা তৈরি হয়? কেন হয় না? ঠিক কোন মন্ত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শ্রমবাজার এত সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে?

এভাবেই প্রতিটি শ্রমিকদের দেহ থেকে একটি নল বেরিয়ে গেছে বড় আরেকটা নলে । সে নল থেকে রক্ত চুষে খাওয়ার সময় পুঁজিবাদি দেশের সাহেবরা কুলি করে কিছু রক্ত ফেলে দেয়। সিংহভাগ গার্মেন্টস মালিকদের খাবার সেই উচ্ছিষ্ট রক্ত। তবে উচ্ছিষ্ট বলে সেই রক্তের পুষ্টিগুণ কম নয়। আমেরিকা বা কানাডার সিটিজেন নয় এমন বাংলাদেশি গার্মেন্টস মালিকের সংখ্যা হাতেগোনা।

ঢাকার তিন-চার-পাঁচ তারা হোটেলে মদের জোয়ার আর বাঈজিদের আড্ডা বসে। বিদেশি বায়ারদের সুধা-সঞ্জীবনী সমেত আপ্যায়ন করে বিজিএমইএ। ডেইলি স্টারে খবর আসে—বাংলাদেশ এখন নামী-দামি সব ব্র্যান্ডের কাপড় বানায়—টমি হিলফিগার, ডিজেল, রালফ লরেন, কেলভিন ক্লেইন, বেনেটন, ম্যাংগো... ।

হু হু, বাবা আমরা আর ফকিন্নিদের দেশ নই বুঝেছ? দেশ থেকে ফকিন্নির পুতদের দূর করার মহান ব্রতে যদি দুই একটা ভবন ধসে পড়ে কিইবা যায় আসে? শ্রমিকদের জীবন তো তুচ্ছ

2 ওয়েবসাইট

জিনিস, গার্মেন্টস মালিকরা যে দেশের সরকার, আইনকে দুই পয়সা দাম দেয় না সেটা হাতিরঝিলের মাঝে বিজিএমইএ ভবন দেখে কি বোঝা যায় না?

কাপড়ে যে রক্ত মিশছে তাতে শুধু গার্মেন্টস মালিকই নয় আরো শিল্পপতিদের হাত আছে। সিমেন্টের বড় বিজ্ঞাপন—ফ্লাই এশ নেই। আড়তদাররা বাংলা স্টাইলে বস্তা খুলে মাটি-বালু মিশিয়ে আবার সেলাই করে দেয়। দেশের সবচেয়ে বড় রড উৎপাদক বাংলাদেশ স্টিল রিরোলিং মিল (বিএসআরএম) এর রড বেন্ডিং টেস্টে উত্তীর্ণ হতে পারে না, ফাটল দেখা যায় । এ অপরাধে তাদের এক লাখ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত।[3] কী সুন্দর শাস্তি! যদি সাভারের দুর্ঘটনাতে রডের দোষ থাকে তাহলে প্রতিটি নিহত মানুষের জীবনের দাম ৩০০ টাকারও কম।

রানা প্লাজা বাংলাদেশের একমাত্র ডোবা ভরাট করে বানানো দালান নয়। ক'টা দালানে পাইলিং হচ্ছে ঠিক মতো? জায়গা বাঁচাতে কলামের বেড় কমছে । সিমেন্ট জমাট বাঁধতে দেওয়ার মতো সময় নেই, কিউরিং করা তো দূরে থাক। এ সরকারের আমলেই কাজ শেষ করতে হবে। এসব ভবনে মুরগি পালা হলে এক কথা ছিল—এখানে গার্মেন্টসের ভারি মেশিনপত্র চলবে। মেশিনগুলোর নিজস্ব একটা ভাইব্রেশন আছে। ইঞ্জিনিয়াররা এসব হিসেব করার কথা মনেই রাখে না পকেটে টাকা এলে। কর্তৃপক্ষকে তাদের বখরা দিলে খুশি, কী রাজউক, কী পৌরসভা । সবাই চোখ বন্ধ করে সাধুবাবা হয়ে যাবে, পাঁচতলার জায়গা দশতলা উঠবে নিশ্চিন্তে।

এর সাথে আছে রাষ্ট্র। দুর্জনের তোষণ আর শিষ্টের দমন যার মূলনীতি। বিল্ডিং মালিক রানা সাহেবকে এলাকার এমপি মুরাদ জং নিজে এসে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।[4] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মখা আলমগীর তত্ত্ব ঝেড়েছেন—গেট, দেয়াল আর স্তম্ভ ধরে ঝাঁকি দেওয়া দালান ধসের সম্ভাব্য কারণ। রানা সাহেবের এতগুলো হাইরাইজের টাকার ভাগ কোন পর্যন্ত যায় সেটা বুঝতে কি কারো বাকি আছে?

৪.

---

3 জনকণ্ঠ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১০।

4 RTNN, ২৪শে এপ্রিল ২০১৩

এ পর্যন্ত যে ছবি আমরা দেখলাম তা খুবই ধূসর, বিষণ্ণ। এই দুনিয়ায় আমরা টিকব কীভাবে? পৃথিবীতে লোভকে কেন্দ্র করে যত সমস্যা আছে তার সমাধান একটাই—আল্লাহকে রিযকের মালিক বলে বিশ্বাস করা । কুরআন-সুন্নাহতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন রিযক অর্থাৎ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু লাগে—টাকাপয়সা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, মর্যাদা, দৈহিক শক্তি, মানসিক বুদ্ধি—সবকিছু আল্লাহই বন্টন করেন। কাকে কতটুকু দেবেন সেটা পূর্বনির্ধারিত। আল্লাহই রিযক বাড়ান আবার কমান। এই বন্টন স্বেচ্ছাচারিতা নয়। রিযক বাড়া-কমানোর বর্ণনার পরে আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দেন তিনি তার বান্দাদের খোজ-খবর রাখেন, তাদের তিনি দেখছেন।[5] আল্লাহ জানেন কার চাহিদা কতটুকু। তিনি সেভাবেই রিযক বাড়ান বা কমান।[6]

আল্লাহ আর রাযযাক—এ কথাটার মানে আসলে কী? যে শ্রমিক বোনটি সকালে বেগুন ভর্তা দিয়ে ভাত খেয়েছিল তার জন্য ঐ সকালে ঐ খাবারটিই লেখা ছিল। রানা সাহেব ফাটলকে পলেস্তারার খসে পড়া বলে চালিয়ে দুপুরে যে কাচ্চি বিরিয়ানি খেয়েছিল—তার কপালে সেটিই ছিল। তার মানে আমাদের সবার কপালে লেখা আছে আমরা কবে কখন কী খাব। আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন এভাবে যে আমাদের সামনে সেই একই খাবারটি খাওয়ার দুটো পন্থা আসবে—হালাল আর হারাম। আমরা যদি হালালটি নেই তাহলে আমরা মুক্তি পেয়ে গেলাম পরকালে। এই দুনিয়াতে আমাদের যা পাওয়ার কথা ছিলো তা কিন্তু একরত্তিও বদলাচ্ছে না। কিন্তু কেউ যদি পরকালকে তোয়াক্কা না করে, আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়াকে গ্রাহ্য না করে হারাম পথটি বেছে নেয় তবে আল্লাহ তাকে তার ইহকালের বরাদ্দটুকু দেবেন বটে কিন্তু পরকালে লাঞ্ছিত-অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

রানা সাহেব যদি রিযকের ব্যাপারটা বুঝত তাহলে ডোবা দখল করত না। ফাটলকে পলেস্তারার খসে পড়া বলত না। তার বরাদ্দ কাচ্চি সে ঠিকই পেত। কিন্তু আজ রানা সাহেব জাতীয় অপরাধী। সারাদেশের মানুষ তার মুখে থু থু ছিটাবে। তার সন্তানেরা বাবার পরিচয় দিতে লজ্জা পাবে আজীবন। শ্রমিক বোনটি যদি বুঝতেন—আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা, তিনি

5 আল ইসরা, ১৭:৩০
6 আল আনকাবুত, ২৯:৬২

যা লিখে রেখেছেন তাই আসবে তাহলে কি তিনি কারখানায় শরীরের রক্ত বেচতেন? যে সংসারের আয় আল্লাহ বরাদ্দ রেখেছেন ৬০০০ টাকা সেখানে স্বামী একাকি বাইরে কাজ করুক আর স্বামী-স্ত্রী দুইজন মিলে কামাই করুক; বরাদ্দ ঐ ৬০০০ টাকাই!

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারা বলে বেড়ায় মোল্লারা মেয়েদের ঘরে বন্দী করতে চায়। আচ্ছা ঘর কি কয়েদখানা যে তাতে মানুষকে বন্দী করা চলে? নাকি কারাগার ঐ গার্মেন্টসটা যেখানে ঢুকতে-বেরোতে হলে দশ জায়গায় অনুমতি নিতে হয়? নিজের ঘরে মেয়েরা বন্দী আর লম্পট মালিকের অফিস ঘরে মেয়েরা মুক্ত! দেহ বেয়ে শিশুদের খেলা বন্দীত্বের নিদর্শন, সিকিউরিটির হাত সেখানে খেলা না করা অবধি মেয়েদের মুক্তি নেই। এসব কথা আবার শিক্ষিত মানুষরা খায়ও বটে!

এ দেশে নারী শ্রমিকদের সহজলভ্যতার সুযোগ নিয়েই গার্মেন্টস নামের শোষণশিল্পটা দাঁড়িয়ে গেছে। হাত বাড়ালেই কর্মী পাওয়া না গেলে মালিকরা মুখের উপরে বলতে পারত না, ১৬৬২ টাকা বেতনে কাজ করলে করো নাহলে যাও।

আল্লাহ মেয়েদের টাকা কামানোর যন্ত্র হিসেবে সৃষ্টি করেননি, মা হিসেবে, মেয়ে হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বাবা, স্বামী, ভাই, সন্তান বাধ্য—কাজ করে ঘরের মেয়েদের খাওয়াবে। বাইরের কাজ তো দূরের কথা ইমাম নববীর মতে রান্না-বান্না, কাপড় কাঁচা, ধোয়া-মোছা—ইত্যাদি কাজও নারীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়।[7]

নারীমুক্তির নামে মেয়েদের সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা কুকুরের মতো খাটানো থেকে পুঁজিবাদের কালো চেহারাটা স্পষ্ট হয়। মেয়েদের মুক্তির নামে ঘরের বাইরে আনো। শ্রমবাজার সস্তা করো। উৎপাদন খরচ কমাও। আমাদের এ ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে। শয়তানদের হাতে নিজেদের শোষণের জন্য তুলে দেব না আমরা।

মেয়েরা পড়াশোনা শিখবে ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে; শিক্ষার উদ্দেশ্য টাকা কামানো নয়। অর্থ ছাড়া কাজ অর্থহীন এই বিশ্বাস মন থেকে সরাতে হবে। মেয়েরা পরিবারের জন্য কাজ করবে। এতে ভালোবাসা থাকবে। সমাজের জন্য কাজ করবে—ডাক্তার, শিক্ষিকা, দর্জি

7 ইমাম নববী রচিত শারহ সহীহ মুসলিম, ভল্যুম ১৪: পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬

সবই হবে। এতে অর্থোপার্জন হতে পারে, কিন্তু সেটা মূখ্য নয়। যে বোঝা আল্লাহ মেয়েদের উপরে চাপিয়ে দেননি সেটা জোর করে কাঁধে তুলে নেওয়াটা বোকামি।

আল্লাহ যে রিযক বরাদ্দ করেছেন তা আসবেই এটা বুঝলে গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দিতেন, রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে ঘাম শুকানোর আগেই দিতেন। বায়ারদের সামনে মিন মিন না করে স্পষ্ট বলতেন—দরে না পোষালে তোমার কাজ আমার না করলেও চলবে। দালান ধসে যারা মরেছে তারা যে মাটির কবরে গেছে, শিল্পপতিরা হার্ট এটাক করে ঐ একই কবরেই তো যাবে ।

আমরা যেন আল্লাহকে একমাত্র রিযিকদাতা বলে চিনতে শিখি, মানতে শিখি, দুনিয়ার মোহ থেকে বের হতে শিখি । আল্লাহ যেন আমাদের লোভ থেকে, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন। আমিন।

১৪ই জমাদিউস সানি, ১৪৩৪ হিজরি।

ইসলাম কেনা

মদীনার বাজার। পড়ন্ত বিকেলে এক খদ্দের এসে দাঁড়ালো একজন সাহাবার দোকানে। কাঙ্ক্ষিত পণ্যের দাম মনমত হওয়ায় কিনতে সম্মত হলো ক্রেতা। কিন্তু তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে সাহাবা দূরের আরেকটি দোকান দেখিয়ে বললেন পণ্যটি সেখান থেকে কিনতে। দাম একই, জিনিসও একই।

হালের ব্যবসা প্রশাসনের ছাত্র লাফিয়ে উঠে বলবে এই জন্যই তো ইহুদিরা সারা দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করে; মুসলিমরা ব্যবসায়ের ‘ব’-ও বোঝে না। সনাতন ব্যবসানীতিতে খদ্দের মানে হলো হাতের লক্ষী। হাতের লক্ষী কেউ পায়ে ঠেলে? হার্ভাডের শিক্ষকদের মতে, দুই ক্ষেত্রে খদ্দেরকে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে পাঠানো যায়: যদি ক্রেতা বেশি খুঁতেখুঁতে হয় আর যদি ক্রেতা ঠিক যা চাইছে সেটা আমার কাছে না থাকে। কিন্তু এছাড়া ক্রেতাকে ফিরিয়ে দেওয়া মানে ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলা।

যাহোক, আমাদের ঘটনার ক্রেতাও হয়তো এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে গেলেন অন্য দোকানটায়। পণ্যটা কিনে আবার ফেরত আসলেন প্রথম দোকানে। সাহাবা তখন অন্য আরেকজন খদ্দেরের সাথে কথা বলছেন। এটাই আল্লাহর বিধান—যত টাকার বিক্রি হওয়ার কথা ছিল, তত টাকার বিক্রি হবেই। এটা আল্লাহর দেওয়া রিযক্। যা আসার কথা ছিলো তা আসবেই। মাঝখান থেকে আমাদের পরীক্ষা হবে—সেই রিযক্ টা পেতে গিয়ে আমরা কী হালালে সন্তুষ্ট থাকলাম নাকি হারামের ডুবে গেলাম।

সাহাবা জিজ্ঞেস করলেন ক্রেতাকে, ‘পাওনি তোমার জিনিস?’

– পেয়েছি, কিন্তু আমি অন্য একটা জিনিসের জন্য এসেছি।

– কী?

– তুমি যার কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলে সে আমারই ধর্মের মানুষ—ইহুদি। আমরা তোমাদের পছন্দ করি না। কিন্তু তুমি একজন ব্যবসায়ী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে আমাকে পাঠালে,মুসলিম হয়ে একজন ইহুদিকে ব্যবসার সুযোগ করে দিলে? কেন?

– কারণ আল্লাহ্ আমাকে আজকের মত যথেষ্ট রিযক্ দিয়েছেন। আর ও বেচারা সকাল থেকে বসে আছে–আজ কোন বিক্রিই হয়নি ওর। তারও তো পরিবার আছে। একজন খদ্দের পেলেও তার ন্যুনতম চাহিদাটুকু হয়ত মিটবে।

ক্রেতাটি হতবাক হয়ে ভাবল—যে ধর্ম মানুষের কল্যাণের কথা এভাবে মানুষকে ভাবতে শেখায় সেটা সত্য বই মিথ্যা হতে পারে না। প ণ্যকিনতে এসে ইহুদি ব্যক্তিটি জান্নাত কিনে নিয়ে চলে গেল।

ইসলাম কিন্তু এভাবেই পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে না, জীবনে প্রতিফলনের মাধ্যমে।

সাহাবারা যেদিন 'লা ইলাহা ইল্লালাহ' কালিমাটা আত্মস্থ করলেন সেদিন থেকে তারা বুঝতে পারলেন আল্লাহর ইবাদাত শুধু মাসজিদে সীমাবদ্ধ নয়, কীভাবে জীবনযাপন হবে, কীভাবে ব্যবসা করতে হবে সে ব্যাপারেও আল্লাহর কিছু বলার আছে।

১১ জমাদিউস সানি, ১৪৩৪ হিজরি।

কম্বল কোলাজ

ভেবেছিলাম ভ্রমণকাহিনী লিখব। যারা আমাদের কম্বল বিতরণ অভিযানে সাথী হতে পারেননি তাদের জংলি বুনোফুলের টকটকে লাল রঙ দেখাব, ঝিরির শব্দ শোনাব, কল্পনার কার্পেটে উড়িয়ে আনব পাহাড় আর উপত্যকা থেকে। চেয়েছিলাম গল্প বলতে—শীতের চোটে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার গল্প, জলেকাদায় মাখামাখি হবার গল্প, ক্ষুধা লাগার গল্প, ক্ষুধা মেটার গল্প। ইচ্ছে ছিল পাহাড়ের গা খুঁড়ে বের করে আনা ঠান্ডা আলুর স্বাদটাও ভাগ করে নেব সবার সাথে। ভেবেছিলাম সেই হাসোজ্জ্বল মুখগুলোর গল্প বলব যারা কম্বলটা বুকে জড়িয়ে দৌড়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। অথবা সেই কিয়াং বুড়ির কথা বলব যে বুকে আর পিঠে দু'টো কলসি বেঁধে পানির খোজে চলে এবেলা-ওবেলা। কিংবা সেই মসজিদের ইমামের কথা যার টিনের চাল চুইয়ে কুয়াশা বৃষ্টির পানির মত ফোটায় ফোটায় ঝরে ঘরের ভেতরে। ভেবেছিলাম গ্রামের মানুষদের জীবন সংগ্রামের কিছু দৃশ্য শহুরে চোখের সামনে তুলে ধরব। পারলাম না। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন আমি যা জানি তোমরা যদি না জানতে তাহলে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী। পার্বত্য চট্টগ্রামের এবারের যাত্রাটাতে এমন কিছু দেখলাম, এমন কিছু জানলাম যা বুকের মধ্যে ভারী পাথরের মত চেপে বসে আছে।

বিজ্ঞানের সাথে থাকার ফলেই বোধহয় ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু অবিশ্বাসী ধাঁচের, বিশেষত নানাবিধ কনসপিরেসি থিওরিতে আমার একেবারেই ঈমান আসেনা। পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে পশ্চিমাদের নানা পরিকল্পনা রয়েছে, তারা একে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করতে চায় – এমন একটা কথা হাওয়ায় ভাসছিল অনেকদিন ধরেই। আমার স্বভাবের দোষেই তেমন গায়ে মাখিনি। কিন্তু এবার নিজের চোখে যা দেখে আসলাম, যা শুনলাম তাতে হঠাৎ চোখের সামনে একটা মাকড়সার জাল দেখতে পেলাম। মাকড়সার জাল বলা আসলে ঠিক ইনসাফ হলোনা, মাকড়সা পেটের দায়ে জাল পাতে; এই জাল যারা পেতেছে তাদের পেটের ক্ষুধা মিটেছে বহু আগেই কিন্তু চোখের ক্ষুধা আজোবধি মেটেনি। ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত লিখতে পারছি না—পরিসংখ্যানের পরীক্ষায় পাশ করবে এমন তথ্যের অভাবে। লেখাটা যাদের বিরুদ্ধে যাবে তারা পনের হাজার মাইল দূর থেকে তামাশা করতে আসেনি, অনেক আঁট-ঘাঁট বেঁধেই এসেছে। আমাদের হুশ হয়েছে অতি অল্প দিন

হলো। তবে আমরাও চেষ্টা করছি। আল্লাহ যদি সাহায্য করেন তবে আমরাও একদিন তাদের আসল চেহারাটা মানুষের সামনে তুলে ধরব। তবে সে অবস্থান পর্যন্ত যেতে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে, আরো অনেক বেশী আত্মত্যাগ করতে হবে।

এ লেখাটা তাই কোন লেখা নয় বরং আমাদের সাথে যারা ১৪৩৪ হিজরিতে শীতার্তদের সাহায্যার্থে কাজ করেছেন তাদের কিছু টুকরো অভিজ্ঞতার সমাহার। সবারই বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফাটে না বিধায় প্রায় চল্লিশজনের দলটির সবার কথা এখানে আসেনি। তবে সবার পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এ মর্মে যে আমাদের সীমাবদ্ধতার জন্য যে দেরীটা হয়েছে, আরো বেশি মানুষকে আরো ভালোভাবে শীতের কাপড় পৌছে দেওয়াতে যে কমতিটা হয়েছে—সেটা যেন দাতারা ক্ষমা করেন। আল্লাহ যেন আমাদের এবং দাতাদের উদ্দেশ্যটা কবুল করে নেন, আমাদের দান ও কাজগুলোর বিনিময়ে আমাদের ক্ষমা করে দেন। আমিন।

<u>শাহিদ, বাংলাদেশ রেলওয়ে</u>

শুক্রবার রাতের শ্যামলী বাসে চেপে রওনা হয়েছিলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার বাবুপুরা গ্রামের উদ্দেশ্যে, সাথে ছিল ১৫০ কম্বল। গ্রামটি ছিল পদ্মা নদী তীরবর্তী। গ্রামের প্রায় সবাই নদী ভাঙ্গা মানুষ, তাই খুব দুস্থ প্রকৃতির। কম্বল বিতরণ কাজে স্থানীয় প্রতিনিধি ছিল আমিনুল ভাই, সকাল ১১ টার দিকে উনার বাড়ির কাছেই এক উঠানে বিতরণ কাজ শুরু হয়। যেহেতু পূর্বে লিস্ট ছিল তাই বিতরণে বিশেষ কোন সমস্যা হয়নি, তবে যেটা পীড়িত করেছে—অসংখ্য মানুষের জীর্ণ, শীর্ণ কাপড় গায়ে দাড়িয়ে থাকা যাদের নাম লিস্টে ছিল না। বিতরণের শেষে যখন আমি আমিনুল ভাই এর বাসার দিকে যাচ্ছিলাম তখন অনেক লোক আমার পিছনে পিছনে আসছিল প্রচণ্ড শীতের কষ্টকে ভুলে থাকার সম্বল, একটা কম্বলের জন্য। একটা মহিলা পিছুই ছাড়ছিল না, বারবার বলছিল নতুন একটা লিস্ট করার জন্য যেখানে তার নামটা থাকবে—তসলিমা। যখন সবাইকে ঐ বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলা হল, তখনো দেখি ঐ মহিলাকে, জানালা ধরে একই কথা বারবার বলছিল। লিস্টের মধ্যে যারা তখনো আসেনি (দূরবর্তী গ্রামে থাকে বিধায়) তাঁদের থেকে একটা কম্বল চাইছিল। কিন্তু আমি দেইনি কেননা তখন লিস্টে যাঁদের নাম আছে তারা পাবে না এবং নতুন সমস্যা শুরু হবে। এই ব্যথিত মন নিয়েই আমার ফিরতে হল। এর কিছুদিন পর যখন ঢাকায় প্রচণ্ড শীত পড়ল, আমি দুপস্তের মোটা কম্বল গায়ে যখন ঘুমাতে যেতাম তখন ঐ

মহিলার কথা মনে পড়ত। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়, আবার এই বলে নিজেকে শান্তনা দেই যে কিছু ভাই-বোনের কষ্টার্জিত অর্থে কেনা কম্বল তো ১৫০ নারীপুরুষের মাঝে পৌঁছে দেয়া হয়েছে যেটা তাদের আল্লাহ্ এর তরফ থেকে দেয়া হক।

<u>সোহেল, বিমস</u>

প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা আছে গুলশান অফিসে, সেখান থেকে নিয়ে যেতে হবে বঙ্গবাজারে। একসাথে এত টাকা, ঢাকার রাস্তা–মানসিক চাপ ছিল অনেক। যেহেতু আমার নিজস্ব পরিবহন নেই তাই পাবলিক বাহন ছাড়া উপায় নেই। পিকআপ ভ্যান নিয়ে অপু ভাই আসবে রাত নটায়। মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য সিংগেল সাইজের কম্বল চাই, যেতে হবে গুলিস্থানে কম্বলের গুদামে। দুজন স্টাফকে ফোনে যোগাযোগ করতে হবে—অফিস থেকে পাঁচ বস্তা কাপড় নিয়ে আসবে বঙ্গবাজার। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সহায় হওয়ায় প্রতিরাতের মতো সেবারও কম্বল কেনার কাজ শেষ করতে পেরেছি ভালোয় ভালোয়। সব শেষ করে বাসায় গিয়ে পৌছাতে পৌছাতে রাত বারোটা। এমন রাত গত তিন মাসে কয়বার এসেছে? থাক, সেটা নাহয় শুধু আল্লাহই জানুক।

<u>তিশাদ, বুয়েট</u>

রাত সাড়ে ১০টা। গাবতলি বাস স্ট্যান্ডে টিকেট হাতে বসে আছি। কুড়িগ্রামের উলিপুর যাব কম্বল নিয়ে। বাস ছাড়তে ১৫ মিনিট বাকি আর কম্বলের ভ্যান তখনও শাহবাগ। বাধ্য হয়ে টিকেট ফেরত দিয়ে অন্য বাসের খোঁজে গেলাম। কিন্তু উলিপুরের বাস আর পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর কুড়িগ্রামের একটা মুড়ির টিন টাইপ বাসের সন্ধান পেলাম। কম্বল আসছে, ওদিকে উলিপুরেও লোক বসে আছে তাই চোখ বন্ধ করে টিকেট নিয়ে ফেললাম। কম্বল এসে পৌছালো বাস ছাড়ার ঠিক আগে। তাড়াহুড়ো করে কম্বল বাসের ছাদে উঠিয়ে বাসে উঠে বসলাম আমরা দুইজন। সেই মুড়ির টিন তার রূপের সার্থকতা গুণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পথিমধ্যে তিনবার নষ্ট হয়ে শেষমেশ ভোরবেলা যমুনা সেতুর গোড়ায় শেষ গোঙানিটুকু দিয়ে থেমে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ড্রাইভার হাওয়া গেল। তিন বস্তা কম্বল নিয়ে শুরু হল এক অদ্ভুত ভ্রমণ। বাসের হেল্পার আর সুপারভাইজার যাত্রীদের চাপে বাধ্য হয়ে রাস্তায় অন্য একটা বাস থামিয়ে তাতে করে আমাদের সেতুর ওপারে সিরাজগঞ্জ

নিয়ে গেল। সেখান থেকে অন্য বাসের ব্যবস্থা করার আশ্বাস শুনে আমরা কম্বল নামিয়ে একপাশে রাখলাম। কিন্তু বাঙ্গালীকে দেওয়া আরও অনেক আশ্বাসের মত হেল্পার আর সুপারভাইজারও বিশ্বাসকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেল। অন্যান্য যাত্রীরা নিজেদের মতো করে বিভিন্ন বাসে উঠে গেলেও কোনো বাসই বস্তা সহ আমাদের নিতে রাজি হচ্ছিল না।

সকাল সাড়ে ১০টা। আমরা দুজন আর ইজতেমা ফেরত এক তাবলিগি ভাই বাদে আর কোনও যাত্রী নেই। অনেক চেষ্টার করে আরও এক-দেড় ঘন্টা পর সেই তাবলিগি ভাই (বাবু ভাই) একটা ট্রাকে করে রংপুর পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ঠেলেঠুলে বস্তা উঠিয়ে শুরু হল এক নতুন অভিজ্ঞতা। ট্রাকের পেছনে করে উত্তর বঙ্গের 'মফিজ' স্টাইলে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চারপাশ দেখা। এর মাঝে অনেক হাটুরে, ব্যবসায়ী, শ্রমিক উঠল, নামলো। একবার ড্রাইভারও বদল হয়। নানান কিসিমের মানুষের নানান সুরের কথাবার্তা শুনতে শুনতে বগুড়া, গাইবান্ধা পেরিয়ে বিকাল ৪টায় রংপুরে গিয়ে পৌছালাম। আবার বস্তা ডাউনলোডের পালা। রাস্তার একপাশে বস্তা রেখে একটা হোটেলে প্রায় ২০ ঘন্টা পর খাওয়া-দাওয়া করলাম। খাওয়া শেষে রংপুরের মডার্ন মোড় থেকে আরেক লোকাল বাসে করে কুড়িগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সন্ধ্যা পেরিয়ে কুড়িগ্রামে পৌছলাম। সেখানে দুইজনে মিলে বস্তা নামানোর পর কুলিরা এসে মজুরি চাইলো। মাল যেই নামাক টার্মিনালে নামালে মজুরি দিতেই হবে এই শিক্ষা অর্জন করে কুলির মজুরি দিয়ে উলিপুরে যাওয়ার উপায় খুঁজতে লাগলাম। বাবু ভাই কুড়িগ্রাম নেমে তার বাসায় চলে যান। আল্লাহ্ উনাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন বলেই কোনওক্রমে আমরা গন্তব্যে পৌছতে পারি। তারপর একটা অটো ভাড়া করে তাতে দুটো বস্তা ঠেসে ঢুকিয়ে আর একটাকে অটোর ওপরে বেঁধে আমরা ড্রাইভারের দু'পাশে উঠে বসি। গন্তব্য উলিপুর। অন্ধকার শীতের রাতে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা পেরিয়ে অবশেষে রাত ৯টা নাগাদ উলিপুর থেকে আরও ৮ কিমি. ভেতরে অনন্তপুর গ্রামে গিয়ে পৌঁছাই। Once in a lifetime অভিজ্ঞতা নিয়ে সকাল সাতটার বদলে আমরা গন্তব্যে পৌঁছাই রাত ৯টায়। শুনেছি আন্তরিক প্রচেষ্টা নাকি মানুষের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের পৌঁছানো কম্বলগুলো দিয়ে শারীরিক উষ্ণতা দেওয়ার পাশাপাশি সেই মানুষগুলোর অন্তরেও আল্লাহ্র প্রতি উষ্ণ কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি করে দেন।

জেবেল, চুয়েট

আকাশে পূর্ণিমা। সেই জোছনায় যতদূর দেখা যায় শুধু বালি আর কলাগাছ। আর কিচ্ছু নেই। '১০ সালের এক শীতের রাতে লালমনিরহাটের এক চরের এই দৃশ্য আমার মাথায় গেঁথে যায়। সেখানে ক্যারিয়ারের মূষিক দৌড় নেই, স্ট্যাটাস নিয়ে অহংবোধের কামড়াকামড়ি নেই। শুধু আছে কোনোক্রমে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা। গিয়েছিলাম শীতার্তদের কম্বল দিতে। মনে ছিল মহত্ত্ববোধের আত্মপ্রসাদ। কিন্তু কম্বল পেয়ে সেখানের শিশু আর বৃদ্ধদের তৃপ্ত মুখ আর আতিথেয়তা আমাকে আমার ভেতরের দৈন্যতার মুখোমুখি করে দেয়। সেই কম্বল শীতের রাতগুলোয় তাদের কতটা আরাম দিয়েছে জানি না তবে সেই অভিজ্ঞতা আমাকে জীবন চিনতে শিখিয়েছে। আর সেই অভিজ্ঞতার জন্য আমি সেই নাম না-জানা মুখগুলোর প্রতি, আমাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া অসাধারণ কিছু ভাইদের প্রতি আর সর্বোপরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ।

তাহিন, চেইঞ্জ টিম

গত ২৮ জানুয়ারী অপু ভাইয়ের মাধ্যমে আমি আর নিশান রাশেদ লালমনিরহাট গিয়েছিলাম শীতের কাপড় দিতে। ঢাকায় ঠান্ডা কম হলেও লালমনিতে এখনো বেশ ঠান্ডা। ওখানকার স্থানীয় এক মাদ্রাসার টিচার হুসেন ভাইয়ের সাথে মিলে প্রায় ৩০০ কম্বল দেয়া হল। আলহামদুলিল্লাহ, বেশ ভালোই হয়েছে পুরো কার্যক্রম।

শীতের কাপড় দিতে গিয়ে যেই জিনিসটা লালমনিতে বেশি চোখে পড়ল তা হলো খ্রিস্টান মিশনারীদের আধিপত্য। 'ধর্ম নিরপেক্ষ' বাংলাদেশে খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মপ্রচার করতেই পারে। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলে হত। লালমনিতে দেখলাম খ্রিস্টানদের পরিচালিত নানারকম সংগঠন এমনকি ইসলামিক সেন্টার, মসজিদও আছে। সেখানে মুসলমানদের খ্রিস্টবাদ মিশ্রিত বিকৃত ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়। তাদের কিছু বই দেখে তো আমার চোখ কপালে। কুরআনের আয়াত আর হাদীসে ভরা কিছু কিছু বই দেখে অনেক মুসলিমই বোকা বনে যাবে। অথচ পুরা বই সেইসব কুরআন আর হাদীসের অপব্যাখ্যায় ভর্তি। আর বাকি বইগুলো ভরা শিরক-কুফরীতে। এইসব বই পড়লে আপনি জানতে পারবেন কিভাবে একজন ভালো মুসলিম হয়েও আপনি খ্রিস্টান হতে পারবেন,

কিভাবে কুরআনে আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে বাইবেল প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন, আরো কত কি!

কোটি কোটি টাকা খ্রিস্টানরা সেখানে খরচ করছে তাদের দাওয়াতের কাজে। টাকার লোভ দেখিয়ে সেখানে গরিব মুসলিমদের খিস্টান বানানো হচ্ছে। আর যথাযথ জ্ঞানের অভাবে টাকার বিনিময়ে সেখানকার গরিব লোকগুলো তাদের দ্বীন বিক্রি করে দিচ্ছে। বানানো হচ্ছে মিশনারী স্কুল যেখানে মুসলিম ছেলে-মেয়েরা পড়ছে। পড়ার ফাঁকে ধীরে ধীরে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে মিথ্যা ধর্মের বিষ। গরিব ছেলে-মেয়ের জন্য তাদের আরেক অভিনব আবিস্কার হলো 'বন্ধু'! এখানে স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে পরিচিত করিয়ে দেয়া হয় এক বন্ধুর সাথে যে কিনা আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা ইতালিতে বসে সেই ছেলে বা মেয়ের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসা সহ সব খরচ বহন করবে। এসবের বিরুদ্ধে কিছু বললেই মিশনারীরা আপনার নামে জে.এম.বি মামলা ঠুকে দিবে। আর জে.এম.বি-র মামলার কথা শুনলে পুলিশদেরও চোখ বড় বড় হয়ে যায়।

তারপরও ঝুকি নিয়ে হুসেন ভাই লোকটা প্রায় একাই কাজ করে যাচ্ছেন। লালমনি শহরে একটা মাদ্রাসা দেয়ার টাকা না থাকলেও তিনি থেমে নেই। সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছেন স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার, অজপাড়া গাঁয়ে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার। ভাবি কী হলো আজ আমাদের যে আমরা কিছুই করতে পারি না? পারি না সেখানে গিয়ে মানুষদের ইসলামের দাওয়াত দিতে, পারি না কিছু টাকা দিয়ে লালমনি শহরে মাদ্রাসার জন্য একটু জমি কিনে দিতে। আফসোস লাগে ...

<u>মাহমুদ হাসান কাওসার (ফ্রিল্যান্সার)</u>

আজকে সবগুলো কম্বল শেষ হয়েছে, আমি ১১০% চেষ্টা করেছি শুধুমাত্র গরীবদের খুজে বের করে দেয়ার জন্য। কিন্তু মাঠে কাজ করা সত্যিই কঠিন গ্রামে কয়েকজনকে দেয়ার পর জানতে পারি তারা মিথ্যা বলেছে, হয়তোবা তারা কম্বল পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না, যাই হোক, অনিচ্ছাকৃত এ বিষয়ের জন্য আমি ক্ষমাপ্রাথী। কম্বলগুলো ভাল মানের হওয়ায় যাদের হাতে দিয়েছি তাদের হাতে দিয়ে একটা তৃপ্তি অনুভব করেছি, গ্রামে অনেক বৃদ্ধ মহিলারা কম্বলটি

নিয়ে সাথে সাথে গায়ে জড়িয়ে দোয়া শুরু করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের দোয়াকে কবুল করুন, আমীন।

পৃথু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গাড়ির ভিতরে কেবল তিন জনের জায়গা হত। আমরা মানুষ ৬ জন ড্রাইভার আর হেলপার সহ। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যিনি, তিনি ভিতরে বসলেন ড্রাইভার এবং হেলপার এর সাথে। আমরা বাকি তিন জন বসলাম ট্রাকের পিছনে। কম্বল রাখার পরে জায়গা তেমন একটা ছিল না, তবে ৩ জন একটু চেপে চুপে বসা যায়। আগে থেকে জানতাম কোথায় বসতে হবে। সেভাবেই গরম কাপড় পড়ে তৈরি ছিলাম। ঢাকার মধ্যে ঠান্ডা তেমন ছিল না। তবে ঢাকা হতে বের হতে হতে ঠান্ডা লাগা শুরু হল। তিন জনে তিনটি কম্বল নিয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ পর পড়ল প্রচন্ড কুয়াশা। যত আগাই, যত রাত বাড়ে, কুয়াশা ততই বাড়ে। এক পর্যায় ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দেয় এক পাম্পের সামনে। কারণ—কুয়াশা। কুয়াশা ছিল ঠিকই, তবে আরও গাড়ি ঠিকই চলছিল। আমরা তাকে বললাম এখানে দাঁড়ালে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া, যত দেরিই করি না কেন, কুয়াশা তো কমবে না। কথার তেমন একটা গ্রাহ্য করল না ড্রাইভার। সে গাড়ি বন্ধ করে হেলপার এর সাথে দিল ঘুম। আমরা পিছনে বসে শীতে কাঁপি। না পেরে একপর্যায়ে আমরা পেট্রোল পাম্পের এক ছাউনির নিচে একটা বেঞ্চে বসলাম। কিছুক্ষণ গল্প করে সময় কাটালাম। মাঝে উঠে একটু হাটাহাটি ও করলাম। ড্রাইভার এর ঘুম ভাঙ্গে নাকি খোঁজ নিচ্ছি খালি। জোর করে উঠিয়ে গাড়ি চালাতে বলার সাহসও পাই না আবার। কখন ঘুম এর ঘোরে গাড়ি নিয়ে কোন পুকুরে ফেলে দেয়। তাছাড়া কুয়াশাও তো কমে না। এভাবে ঘন্টা খানিক কাটে। অবশেষে সাখাওয়াত ভাই ড্রাইভার কে ডেকে বলে অনেক ঘুম হয়েছে, এবার উঠো। আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম।

শরীফ আবু হায়াত অপু, সরোবর

ড. সাইফুল্লাহ কম্বল দিচ্ছেন স্টেজ থেকে। দুটো টিভি চ্যানেল থেকে ক্যামেরা এসেছে—তারা রেকর্ড করছে। সৌদি আরবের রিয়াদ প্রবাসী যে ভাইয়েরা টাকাটা পাঠিয়েছেন তাদের ইচ্ছে কম্বল দেওয়ার খবরটা যেন মিডিয়ায় আসে। হুজুররা যে শুধু হাত পেতে নেয় না, মানুষকে দেয়ও—এ ব্যাপারটা যেন সবাই জানে। সবাই যেন জানে দেশের মসজিদ ও

মাদ্রাসাগুলোকে কেন্দ্র করে যে বিশাল ত্রাণকাজ চলে প্রতি বছর লোকের অগোচরে সেগুলো ভোট কামানোর জন্যেও না, দানবীর বলে নাম কুড়ানোর জন্যেও না। আমি চকিতে বেরিয়ে এলাম—এক ভাই তার মাদ্রাসাটা এক নজর দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, সেখানে যাব। মটর সাইকেলের পিছনে চেপে বসলাম। মাটির রাস্তা ছেড়ে পিচঢালা পথ ধরে কিছুদূর যেতেই এক বৃদ্ধাকে দেখলাম। বয়স আন্দাজ করা শক্ত—আশি, নব্বুই, একশ... খুব কষ্ট করে লাঠিতে ভর দিয়ে কোনোভাবে শরীরটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বুকে রাখা কম্বলটাকে আরেকহাতে মুঠো করে ধরে রেখেছেন। আমি জানি না এই বুড়িমার বাড়ী কোথায়, কতদূর রাস্তা তিনি এভাবে হেঁটে এসেছেন। আমাদের পৌছাতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল—হয়ত তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছেন কম্বলটি পাওয়ার জন্য। তার হাঁটার ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু ছিলো যে চশমার কাঁচটা ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল।

আমি জানি মিডিয়াতে, আমাদের মুসলিমদের খুব খারাপভাবে দেখানো হয়—আমাদের আদলে রাজাকারদের ছবি আঁকা হয়, কুরআন হাদিসের ভাষা ব্যবহার করে রঙ্গ-রস লেখা হয়। এও জানি মানুষ অন্যকে ভালো কাজে করতে দেখলে উৎসাহিত হয়, যে নিজে কখনো দান করেনি সেও পকেটের দিকে হাতটা বাড়ায়। সব জেনে, সব বুঝে, ঝাপসা চোখে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ক্যামেরার সামনে কাজটা আমার জন্য নয়। দেশে বহু মানুষ আছে—নানা জনের নানা ধরণ আছে কাজ করার। আমি নাহয় সে ধরণটাই বেছে নিলাম যেখানে আমার ভাইয়েরা হেটে হেটে বাসায় গিয়ে কম্বল দিয়ে আসবে। যদি বাড়িতে সম্ভব না হয়, অন্তত পাড়ায় পাড়ায় যাবে। ছবি তোলার জন্য যে জমায়েত দরকার সেটা অন্যদের জন্য তোলা থাক—আমরা ছবি না তুলেই কাজ করব। আমাদের যারা টাকা দিয়েছেন তারা আমাদের শব্দ দেখে বিশ্বাস করে নেবেন যে টাকাগুলো জায়গামত গিয়ে পৌছেছে, ছবি চাইবেন না। তারা দূর থেকে দৃশ্য দেখে আত্মতুষ্টিতে ভুগবেন না, পরিকল্পনা করবেন পরের বার দেশে গেলে বেড়াতে গিয়ে তিন সপ্তাহের ছুটি থেকে কম্বল বিতরণের জন্য তিন দিন সময় রাখবেন। সবার সাথে সবার তো মেলে না, আমাদের কাজটা নাহয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটু অন্যরকমই থাক।

৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩৪ হিজরি।

বাঙালিত্ব : দেশপ্রেম না ধর্ম?

আমার জন্ম যশোরে। শীতের ছুটিতে মামাবাড়িতে যেতাম। যশোরের কথা মনে হতেই চোখে ভাসে একটা আলো—ভোরবেলা ছন-ঢাকা মটর গ্যারেজে বাল্ব জ্বলছে কুয়াশার চাদর ভেদ করে। আলো আমি বহু দেখেছি এরপরে। শিকাগো কিংবা নিউইয়র্কের চোখ ধাঁধানো আলোর মালা সেই টিমটিমে বাতিটিকে হারাতে পারেনি এখনও। মোহাম্মদপুর কেটেছে শৈশব। হয়ত গুলশানের রাস্তাগুলো আরো সুন্দর, বনানীর বাড়িগুলো আরো বনেদি কিন্তু আজো পৌনে দুকাঠার পোকামাকড়ের ঘরবসতিগুলোই মনকে আর্দ্র করে। মনে গেঁথে আছে সেন্ট যোসেফের বিশাল সব গাছের ছবি। হয়ত সেন্ট প্লাসিডসের গাছগুলো আরো সজীব, আরো সবুজ; কিন্তু সেগুলোর জন্য আমার মনে ব্যাকুল কোন আকুলতা নেই। মানুষ নস্টালজিক প্রাণী। সে যেখানে বেড়ে উঠেছে তার সাথে হৃদ্যতা থেকে যায় মৃত্যু অবধি। বাংলা অভিধানমতে দেশ মানে স্থান। শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটিকে মানুষ ভালোবাসে। এই ভালোবাসার নাম দেয়া যায় দেশপ্রেম। যে মানুষগুলোকে সে ছোট থেকে দেখে এসেছে তাদের জন্য টান থেকে যায় মনে। এই টানের জন্মও সেই দেশপ্রেম থেকেই।

মানুষ বাঁচে কেন? একটা স্বপ্ন নিয়ে। গরু স্বপ্ন দেখে না, তার প্রতিবেলা দু'আঁটি ঘাস আর রাতে একটা খুঁটি হলেই চলে। মানুষের চলে না। কেউ যদি মানুষ হয় তাহলে সে শুধু নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে না। ব্যক্তিভেদে স্বপ্নের পরিসর বদলায়। সবচেয়ে যে ছোট, তার স্বপ্ন শুধুই তার সন্তানদের নিয়ে। তার চেয়ে যে বড় সে স্বপ্ন দেখে একটা গরীব বাচ্চার পড়ার খরচ দেবে। আরো যে বড়, সে স্বপ্ন দেখে গাঁয়ে কোন অভাবী লোক থাকবে না, খালের ওপরকার নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোটার জায়গায় একটা ছোট্ট ব্রিজ হবে। কেউ স্বপ্ন দেখে একটা হাসপাতালের। সামর্থ্য নেই, তবু আশা থাকে মনের কোণে। মানুষ যখন আত্মকেন্দ্রিকতার উপরে ওঠে তখন সে তার চারপাশের এলাকার জন্য, কাছেপিঠের এলাকার মানুষের জন্য কিছু করতে চায়। এ স্বপ্নগুলোর জন্ম একটা আদর্শ থেকে। এই আদর্শের নাম দেশপ্রেম।

বিশ্বায়নের এ যুগে এই আদর্শটা ক্রমেই রূপ বদলাচ্ছে। মানুষ স্বদেশ পাড়ি দিয়ে পরবাসে গিয়ে থিতু হচ্ছে ভালো থাকার লোভে, ভালো খাওয়ার লোভে, তথাকথিত উন্নত

জীবনযাপনের মোহে। মাতৃভূমিতে যারা আছে তারাও মত্ত ভোগবাদী জীবনধারাতে। রাতদিন জীবনকে উপভোগের পালায় যখন হঠাৎ ছেদ পড়ে, বিবেকবোধ আত্মাকে সজোরে ধাক্কা মারে। সে মূহুর্তে বিবেককে স্তব্ধ করতে যে আত্মপ্রবঞ্চনার সাহায্য নেওয়া হয় তার নামও দেশপ্রেম বটে।

২.

ধর্মবোধ সাধারণত মানুষের আদর্শের উৎস হিসেবে কাজ করে। চার্চের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইউরোপের মানুষেরা জেগে উঠেছিল এক সময়। অত্যাচারী-অনাচারী খ্রিষ্ট ধর্মকে তারা তাড়িয়ে দেয় আদর্শগত অবস্থান থেকে। কিন্তু আদর্শের স্থানটা খালি থাকে না কখনই। আধুনিক মননে আদর্শের শূন্যস্থান পূরণ করে জাতীয়তাবাদ। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি মানুষের সহজাত ভালোবাসাকে পুঁজি করে ভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক বিভাজন শুরু হয়। ইতিহাসকে ভেঙে গড়া হয়, স্বজাতির দুর্বৃত্তদের জাতীয় বীর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। রক্তখেকো নেপোলিয়নকে হাজির করা হয় আদর্শ ফরাসী নেতা হিসেবে। গণহত্যার দায়ে দুষ্ট অলিভার ক্রমওয়েলকে ব্রিটিশরা নির্বাচিত করে সেরা দশ ব্রিটিশদের একজনে, ভুলে যায় যে এই লোকই বিদ্রোহ দমনের নামে আইরিশ মেয়েদের মুখ চিরে দিত ক্ষুর দিয়ে। পৃথিবীর সভ্যতার দুহাজার বছরের ইতিহাসের ঐক্যের কলতানকে ছাপিয়ে ভাঙনের বাঁশি প্রবল হয়। মিলগুলোকে বলা হয় গৌণ, অমিলগুলোকে মুখ্য। দার্শনিকেরা আপন জাতিকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রমাণের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তপনায় নেমে পড়েন নির্দ্বিধায়। জর্জ অরওয়েলের ভাষায়[৪]:

> Nationalism is power-hunger tempered by self-deception. Every nationalist is capable of the most flagrant dishonesty, but he is also—since he is conscious of serving something bigger than himself—unshakeably certain of being in the right.

জাতীয়তাবাদ কী? এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মতে যখন কোন ব্যক্তির আনুগত্য এবং অনুরাগ সব কিছুকে ছাপিয়ে দেশের প্রতি ন্যস্ত হয় তখন সেই আদর্শকে জাতীয়তাবাদ বলে। তার মানে রাষ্ট্র যা করবে তাকে শুধু মেনেই নিলে চলবে না, তাকে আদর্শে লালনও করতে

8 “Notes on Nationalism” (Polemic, No 1, October 1945, May 1945)

হবে। এই আদর্শের মূল যে কত গভীরে যেতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভিয়েতনামে আমেরিকান নৃশংসতার সমর্থকদের স্লোগানে:

"My country, right or wrong" কিংবা "America, love it or leave it."

এই স্লোগান অতীত হয়ে গেছে এমন ভাবার অবকাশ নেই। আজো এই বাংলাদেশে প্রচলিত 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র বিপক্ষে কিছু বললে তাকে পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে চলে যেতে বলা হয়।

দেশপ্রেমের মত সহজাত একটি প্রবৃত্তির দুর্বৃত্তায়ন হলো কিভাবে? জাতীয়তাবাদের হাতে দেশপ্রেম ছিনতাই হয় সেকুলার জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা পৃথিবীতে প্রবল হবার পর। রাষ্ট্রনায়করা পরিকল্পিতভাবেই দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের সীমানা মুছে একে অপরের সমার্থক করে ফেলেছিল। কেন? কারণ দেশপ্রেম মানুষ তাড়িয়ে নেবে এমন একটা হাতিয়ার। অন্যায়কে ন্যায় বানাতে একটা আদর্শিক ভিত্তি লাগে—দেশপ্রেম সেই ভিতটা দেয়। ১৯৭১ সালে যারা পাকিস্তান নামক দেশটার প্রেমে অন্ধ ছিল তারা পাকি আর্মিদের নৃশংসতায় সাহায্য করেছে। রাষ্ট্রের আনুগত্যের সংজ্ঞায় এরাও দেশপ্রেমিক ছিল। যদি আজ বাংলাদেশ স্বাধীন না হতো—রাজাকারের বদলে এরা এখন পরিচিত হত দেশপ্রেমিক, দেশের সূর্যসন্তান হিসেবে। আর মুক্তিযোদ্ধারা বিবেচিত হতো বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী হিসেবে, কুলাঙ্গার হিসেবে। এভাবেই জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম ভাল-মন্দের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়, নতুন একটা সীমারেখা তৈরী করে। যত অত্যাচারী শাসকই হোক না কেন, যত অন্যায় আহবানই হোক না কেন—দেশপ্রেমের দাবী হচ্ছে সে অন্যায়কে ন্যায় মেনে তার পক্ষে কাজ করা। একই কাজ হিটলার করিয়েছিল জার্মান জাতিকে দিয়ে। পিতৃভূমির উচ্চ মর্যাদার রক্ষার্থে লক্ষ মানুষের মৃত্যুও আপত্তিকর মনে হয়নি সাধারণ জার্মানদের কাছে। দেশপ্রেমের থাবা থেকে বাঁচতে পালিয়ে যেতে হয়েছে বিবেকমানদের। এই দেশপ্রেমের দোহাইয়ে পাকিরা তৈরী করে দিল শান্তিবাহিনী—মানুষ মেরে শান্তি আনতে চাইল এ বাংলায়। এই দেশপ্রেমের ডাক আমরা আজও শুনতে পাই: 'শিক্ষা-শান্তি-প্রগতি' যাদের মূলমন্ত্র তারা মানুষ ধরে ধরে জবাই করে দেওয়ার আহবান জানায়। যে মঞ্চ থেকে বিচারের দাবি ওঠে সেই একই মঞ্চ থেকে বিচারের রায় দিয়ে দেওয়া হয়। আকাঙ্খিত রায় না পেলে কি পরিণাম

হবে তাও জানিয়ে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রাধীন আদালত অবমানিত হতে ভুলে যান। আমরা দেশপ্রেমের ঠুলি চোখে বেঁধে পুরো ব্যাপারটার প্রহসন উপেক্ষা করি।

৩.

দেশপ্রেমকে ব্যবহার করার সবচেয়ে সফল অস্ত্র—তাকে একটি ধর্ম হিসেবে গড়ে তোলা। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিক গুস্তাভো হার্ভে বলেছিলেন[৯]:

“For the patriotism of modern nations is a religion”

এ দেশেও মানুষের আবেগকে পুঁজি করে ক্ষমতালোভীরা নতুন একটি ধর্মের প্রবর্তন করেছিল—বাঙালি জাতীয়তাবাদ। সে ধর্মের দোহাই দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে উর্দুভাষীদের কচুকাটা করা হয়েছিল। পাকিরা না, বাঙালিরা করেছিল। যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের করা হয়েছিল খোঁয়ারে বন্দী। এখনও ঢাকার বুকে সেই ‘ক্যাম্প’গুলো সগর্বে বর্তমান। দেশ স্বাধীনের পরে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি অবাঙালিদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল: ‘বাঙালি হয়ে যাও’।৩ একটি ধর্ম নাযিল হতে সময় লাগে। বাঙালি ধর্ম নাযিল হয়নি, এ পৃথিবীতে, বঙ্গদেশে উৎপাদিত হয়েছিল।

প্রতিটি ধর্মের দুটি দিক আছে—বিশ্বাস, creed ও আচার-প্রথা, rituals। বাঙালি ধর্মের বিশ্বাস—বাঙালি সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের আনুগত্য। নামে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ হলেও মূলত হিন্দু বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে বেছে নেওয়া হয়েছে বাঙালি ধর্মের জন্য। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং পূর্বপুরুষে দেবীপূজার রীতি থাকায় দেশকে মা হিসেবে মেনে নিতে সমস্যা হয়নি বাঙালি মুসলিমদের। জাতীয় সঙ্গীতে গাওয়া হলো: ‘মা, তোর বদনখানি মলিন হলে...।' যে তরুণ প্রজন্ম বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গর্ব করছে তারাও ভেবে দেখে না প্রকৃতির মুখাবয়ব আছে কিনা। যা নেই তা মলিন হতে পারে কিনা। দেশাত্মবোধে সেজদা করা হলো বিশ্বমাতাকে:

ও আমার দেশের মাটি, তোমার ’পরে ঠেকাই মাথা।

তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

9 I.W.W. pamphlet “Patriotism and the Worker”, 1912.

নিশ্চল প্রকৃতিকে আল্লাহর গুণাবলী দেওয়া হলো নির্দ্বিধায়:

তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,

তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,

তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা॥

কৃষক রোদে জ্বলে, পানিতে ভিজে ধান উৎপাদন করে তার পেটে লাথি মারতে হবে ধানের দাম কমিয়ে। আর বন্দনা করতে হবে অন্নদাত্রী মায়ের, আল্লাহর এক নাম যে আর-রাজ্জাক—সে কথা ভুলেও মুখে আনা যাবে না। ‘রব্বুল ‘আলামিন’ নামটা সুরা ফাতিহাতে তালা মেরে আটকে রেখে দিতে হবে, বাস্তব জীবনে গাইতে হবে মাতার জয়গান। আসলে কী রাষ্ট্র আর মা এক? মা কি বদলানো যায়? আমার দাদার ‘মা’ ভারতকে ভেঙে নতুন ‘মা’ বানাল হয়েছিল—পাকিস্তান। আমার বাবারা নতুন মাকে আবার ভাঙলেন, এলো বাংলাদেশ। আমার বাবারা ভারত মাকে ঘৃণা করা শিখলেন, আমাদের ঘৃণা করতে শেখানো হল পাকিস্তানকে। নতুন মাকে ভালোবাসার শর্ত এটাই—আগের মাকে ঘৃণা করতে হবে। যে মা, মাটিকে রক্ষা করার জন্য প্রাণত্যাগের সংকল্প করা, সেই মায়ের উপরেই হামলে পড়তে হবে ক’দিন পরে। যে মাকে মানুষ কাটে, মানুষ জোড়া লাগায় তাকে ‘ইলাহ্’ হিসেবে মেনে নিতে হবে বাঙালি হতে হলে।

নানা ধর্মের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধর্মে নানা প্রথাগত আচরণও আছে—বিমূর্ত মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পুষ্প অর্ঘ্য দেওয়া, চেহারায় পতাকার তিলক আঁকা, মোমবাতি জ্বেলে শোক জানানো, মৃতদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখা কিংবা আকাশে ফানুশ ওড়ানো। এ ধর্মে আছে উৎসব—শহীদ, স্বাধীনতা কিংবা বিজয় দিবস। আছে তীর্থস্থান—শিখা অনির্বাণ, শহীদ মিনার আর স্মৃতিসৌধ। আছে উৎসর্গ—বিরুদ্ধবাদীদের জীবন, সাধারণ মানুষের জীবন। এ ধর্মে দীক্ষিতরা সোয়াব কামানো চকচকে চোখে স্লোগান দিয়ে রাজপথ কাঁপায়—‘ধরে ধরে জবাই করো’; পিছনে থাকে রাষ্ট্রের রক্ষীবাহিনী। বাঙালি ধর্মের জন্য আলাদা উপাসনালয় লাগে না, বিদ্যালয়ই আচ্ছা। শিশুরা জাতীয় পতাকাকে সালাম করে, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে

দিন শুরু করে। 'চেতনা'ধারী নবী সেজে ধর্মগ্রন্থ লেখেন—শিশুরা তা পড়ে পাঠ্যবইয়ে, বুড়োরা সংবাদপত্রে। লিও তলস্তয় বড় চমৎকারভাবে বর্ণনা করে গেছেন পদ্ধতিটা[10]:

> In the schools, they kindle patriotism in the children by means of histories describing their own people as the best of all peoples and always in the right. Among adults they kindle it by spectacles, jubilees, monuments, and by a lying patriotic press.

বাঙালি ধর্মে পীরপ্রথাও বিদ্যমান। রাজনৈতিক নেতারা মুরিদদের পার্থিব স্বপ্ন দেখায়—দশ টাকার চাল, ঘরে ঘরে চাকরি, পদ্মা সেতু ইত্যাদি ইত্যাদি। পীরদের খাদেম হিসেবে থাকে মুক্তমনারা, বণিকেরা, প্রশাসনিক চাটুকারেরা। পীর এবং খাদেমদের গাড়ির বহর, বাড়ির উচ্চতা দীর্ঘ হতে থাকে। মানুষ সবই বোঝে তাও পাঁচ বছরে একবার গিয়ে ভোটের নজরানা দিয়ে আসে। ভোট কিনে পীরেরা রাষ্ট্রের মালিক বনে যায়—সুখ আর সুখ। বিদেশী গ্যাস-তেল কোম্পানির কাছে মায়ের রক্ত বিক্রির সুখ। মায়ের আকাশ মুক্ত রাখতে বিমান কেনার সুখ। সুখের আগুন থেকে বেরিয়ে আসে শেয়ার বাজার, হলমার্ক, ডেস্টিনি, কাল বেড়াল নামের কিছু স্ফুলিঙ্গ। সুখের আগুনের জ্বালানী হয় সীমান্তের মানুষ, পিলখানার সেনাকর্মকর্তা, ক্ষমতাচ্যুত পীরের অবুঝ মুরিদেরা। ১৯০৫ সালে গুস্তাভো হার্ভে যা বুঝেছিলেন তা আমরা আজো বুঝিনি:

> A country of the present time is nothing but this monstrous social inequality, this monstrous exploitation of man by man.

আস্তে আস্তে পৈত্রিকসূত্রে ধর্ম পাওয়া মুসলিমরা বিশ্বাস আনে বাঙালি জাতীয়তাবাদে, সংস্কৃতি হিসেবে তারা যেটা ধারণ করে তাকে দেখতে কখনও কখনও ইসলামের মতো লাগে বৈকি। তারপরেও হঠাৎ একদিন বাঙালি ইসলাম আর বাঙালি জাতীয়তাবাদে ঠুকোঠুকি লেগে যায়। তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের দীক্ষা দেয়া হয় ইসলাম শিক্ষা বই থেকে: দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।

৪.

---

10 Patriotism and Government, মে ১০, ১৯০০.

ধর্ম হিসেবে দেশপ্রেম বড্ড একচোখা। রবীন্দ্রনাথের উপাধি ‘বিশ্বকবি’ আমরা জানি। উদ্দেশ্য—বাংলা পরীক্ষায় বেশি নম্বর। তিনি যে সীমান্তের বেড়াজাল কাটিয়ে বিশ্বমানবতার মধ্যে ঐক্যের সূত্র বাঁধতে চেয়েছিলেন সে উপলব্ধিটা আমাদের কখনোই শেখানো হলো না। দেশ বলতে যদি রাষ্ট্র ধরা হয় তবে তার উপকরণ দুটি—মাটি ও মানুষ। মাটি মানে প্রকৃতি—অবোধ নদী, মূক পাহাড়, শ্যামল সবুজ, সজীব সব না-মানুষ। এদের সবার জীবন আছে, ভাষা আছে—যদিও তা আমাদের বোধের বাইরে। দেশপ্রেম বলতে যদি আমরা বুঝি রাষ্ট্রের সীমানাকে ঘিরে ভালোবাসা তাহলে পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের বাইরের প্রকৃতিকে কি ভালোবাসতে নেই? সবই তো একই স্রষ্টার সৃষ্টি। আর যদি দেশপ্রেম বলতে আমরা বুঝি দেশের মানুষকে ভালোবাসা তাহলে প্রশ্ন আসে কেন শুধু দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে, কেন গোটা দুনিয়ার মানুষকে নয়? মানবিকতাকে কাঁটাতারে আবদ্ধ করার যুক্তি কী?

১৯৪৭ সালের ৮ই জুলাই জীবনে প্রথমবারের মতো ভারতে আসার পর সাইরিল রেডক্লিফকে দায়িত্ব দেয়া হল ভারত ভাগ করে দাও। তিনি টেবিলে বসে কলম চালালেন, সীমান্ত তৈরী হলো। আমার দাদাকে বলা হলো পশ্চিম দিনাজপুরের যে গ্রামটিতে তুমি বড় হয়েছ সেটা এখন ভারত। তুমি পাকিস্তানী। তল্পি-তল্পা গোটাও। এক অপরিচিত জায়গায় বসিয়ে তাকে জানানো হল এটা তোমার দেশ—একেই তোমার ভালোবাসা দিতে হবে। শৈশবের গ্রাম, গ্রামের মানুষগুলো আর তোমার আপন কেউ না। তোমাকে এখন প্রেম করতে হবে চট্টগ্রামের মানুষের সাথে যাদের একটা কথাও তুমি বোঝ না। রাষ্ট্রীয় আদেশে প্রেম। ধর্ম হিসেবে বাঙালি দেশপ্রেম যে আসলে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রভুদের সংজ্ঞার উপরে টিকে আছে এই তথ্যটুকুই ধর্মটা মিথ্যা হবার জন্য যথেষ্ট।

আমরা বিশ্বাস করি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একজনই এবং এই পৃথিবীর মালিক তিনিই। আমাদের আগে বহু মানুষ এসেছিল যারা ‘দেশ আমার, মাটি আমার’ বলে মিথ্যা গর্ব করেছিল। এই দেশ, মাটি একই আছে কিন্তু সেই মানুষগুলো মাটির তলায় চলে গেছে। যখন আমরা এই পৃথিবীতে আসিনি তখন আমাদের দেশ কী ছিল? আমরা যখন মরে যাবো তখন আমাদের দেশ হবে কোনটা? মাটির তলায় কোন রাজার রাজত্ব চলে? কোন পুলিশ ডাণ্ডা মারে? কোন আদালত বিচার করে? যিনি বলছেন তিনি আগে বাঙালি পরে মুসলিম তিনি কি দেশের নেতাদের আল্লাহর উপরে স্থান দিচ্ছেন না? এই নেতাদের চরিত্র কী আমরা ভালো

করে জানি না? এরা যে আমাদের আখিরাতে কেন দুনিয়াতেই জাহান্নাম দেখানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে সেটা কি আমরা বুঝি না? এদের আমরা আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসছি? এদের ক্ষমতা দখলের লোভে আমরা আমাদের জীবন বিকিয়ে দিচ্ছি? আমরা এত জেনে-বুঝেও এদের হাতের পুতুল হচ্ছি?

আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশ না, পৃথিবীটাও না—আমাদের সত্যিকারের দেশ জান্নাত। আমরা সেই জান্নাতের জন্য কাজ করি যেখানে আমরা একদিন ছিলাম, যেখানে আমরা একদিন যেতে চাই। তাই আমরা প্রকৃতির বদলে প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমরা এই পৃথিবীর ভণ্ডদের না, মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছি। দুটোই আমাদের সচেতন প্রয়াস। আমরা জানি কেন এই বেছে নেওয়া। যদি এই অবস্থানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যেতেও হয় আমরা রাজি। পৃথিবী কখনওই আমাদের ছিলো না, সেটাকে ঘিরে স্বপ্নও তাই আমরা সাজাই না। আমরা সাধারণ মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সাধ্যে যা কুলায় করতে চাই। এই মঙ্গলকামনাটাও সীমানা দিয়ে আবদ্ধ নয়। আমরা এই দেশের মানুষের জন্য যা চাই—সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যেও তাই চাই। আমাদের কাছে এটাই দেশপ্রেম। আর এই দেশপ্রেমের উদ্দেশ্য মানুষের মনোতুষ্টি নয়, একুশে পদক পাওয়া নয়—আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আল্লাহ যেন আমাদের আবেগটাকে সৎ কাজে ব্যবহার করার তৌফিক দেন, মন্দ মানুষদের চক্রান্ত বোঝার তৌফিক দেন, ইসলাম বুঝে জীবনটাকে অর্থবহ করার তৌফিক দেন।

২৩ রবিউস সানি, ১৪৩৪ হিজরি।

বিশ জন বন্দিনী

অন্যায়-ক্লেদ-ক্লেশে ভরেছে ধরা,

বিলুপ্তির তালিকায়

হাতি-ম্যামথেরা নাম লেখায়

খালি টিকে গেছি আমি একেলা

আমি, এক বৃদ্ধ আরশোলা।

দেশ আরশোলাতে ভরে গিয়েছে। পালে পালে তেলাপোকারা চলছে, ছুটছে, ফিরছে। মুসলমান তেলাপোকা। এদের উদ্দেশ্য টিকে থাকা। ইসলাম বিলুপ্ত হোক, আমরা টিকে থাকতে চাই।

ছাত্রীসংস্থার বিশজন বন্দী হওয়ার পর থেকেই মনের ভেতরে একটা তোলপাড় চলছে। ছাত্রীসংস্থা ছাত্রশিবিরের মহিলা উইং। মেয়েদের রাজনীতি করতে হবে একথা আমরা বলি না, নারী অধিকার নেত্রীরা বলে। এইবিশজন মেয়ে রাজনীতি করে বলে বন্দী হয়েছে, রিমান্ডে গিয়েছে, লাঠিপেটা খেয়েছে, পুলিশের কাঁধে ভর দিয়ে আদালতে এসেছে। পর্দা ছাড়া – এমন কাপড়ে যে কাপড়ে তাদের স্বামী-বাবা-ভাই ছাড়া অন্য কেউ দেখার কথা নয়।

নারীনেত্রীরা নারী ক্ষমতায়নের কথা বলেন, মেয়েদের রাস্তায় দেখতে চান, সংসদে। সংসদে আসতে হলে জেল ঘুরতে হবে, কারাভোগে নির্যাতিতের তকমা লাগাতে হবে। এই মেয়েরা জেলে গেলে নারীনেত্রীরা কিছু বলবেন এমন আশা করি না। তাদের মিশন তো এটাই – মেয়েদের থেকে মেয়েত্ব, মাতৃত্ব মাইনাস করবে। তারা সফল। অন্তঃস্বত্ত্বা নারীটিকেও রিমান্ডে যেতে হয়েছে। সফল আমাদের গণতন্ত্র। এটাই বহুদলীয় গণতন্ত্রের আসল চেহারা। নিষিদ্ধ নয় এমন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যদের শুধুমাত্র আদর্শগত বিরোধীতার কারণে গ্রেপ্তার করা হবে, নির্যাতন করা হবে। সভা করার, রাজনৈতিক কর্ম করার অধিকার সবার নেই। অধিকার কাজীর কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই। গোয়াল ভরা লেঠেল বাহিনী। আজ যাকে পাহারা দেয় কাল তাকেই বাড়ি মারে।

আমার আপত্তি মুসলিমদের নিয়ে। যারা মা-বোনদের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে এখন হিকমাহর নামে ঘরে খিল এঁটে বসে আছে। আজ বিশাল বয়ান চলছে, কাল হবে আখেরি মুনাজাত। কেউ সেখানে দু'আ করবে না, 'আল্লাহ যে জালিমেরা পর্দাপরা মেয়েদের অত্যাচার করছে, বেপর্দা করছে – তাদের হিদায়াত দাও, নইলে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দাও।' কিভাবে করবে? সেই আমীনে শরীক হবে সেও যার বিরুদ্ধে ছোড়া হবে অভিশাপের বর্শা। সেও এক নারী, সেও গর্ভে সন্তান ধারণ করেছে, সেও এক সময়ে মাথায় কাপড় দিয়েছে, সেও সময় সময় হাজ্জ করতে কাবাপানে ছোটে। যাক তেলাপোকা মুসল্লিরা টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করুক, মালাইকারা তো অভিশাপ করবে। এভাবেই মানুষ নিজের বিরুদ্ধে আল্লাহরঅভিশাপ ডেকে আনে। ডেকে যে আনছে তা টেরও পায় না।

আসুন আমরা মুসলিম হই। অন্যায়কে অন্যায় বলতে শিখি। সিংহের মত বাঁচি, সিংহের মত মরি। আমাদের আরশোলাময় টিকে থাকাতে ইসলামের কোনউপকার নেই। আরশোলারা মুসলিম হয় না, মুনাফিক হয়। যারা এদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে উঠেপড়ে লেগেছে তাদের ব্যাপারে আমরা স্পষ্ট কথা বলি। তাদের জন্য দু'আ করি – হয় হিদায়াত, নয় ধ্বংস।

আইনশৃংখলা বাহিনীর ভাই-বোনেরা সাবধান। আপনাদের যারা আজাবে শামিলকরছেন তারা আপনাদের শাস্তির একটু ভাগও নেবেন না। তারা আপনাদের বলবে:

আমাদের পালানোর কোন জায়গা নেই[11]

যে শয়তানের বশে আপনারা আমাদের মুসলিম বোনদের গায়ে হাত তুলছেন সেই শয়তান একদিন আপনাদের বলবে:

> 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা। তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না। তবে আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন আমি তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভর্ৎসনাকরো না, বরং নিজদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর তোমরাও আমার

11 সূরা ইবরাহিম, ১৪:২১

উদ্ধারকারী নও। ইতপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব’[12]

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। যখন নড়ে তখন সেটা কেউ থামাতে পারে না। হামান, ফেরাউন, নমরুদ কেউই পারেনি। আপনারাও পারবেন না। সাধু সাবধান।

১ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৪ হিজরি

12 সূরা ইবরাহিম, ১৪:২২

এই শীতে

বাবা হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা বেশী দিনের নয়। বিদেশ থেকে ফিরে দেখলাম ছেলের বয়স আড়াই বছর হয়েছে। ইতমধ্যে সে শুধু কথা বলতেই শেখেনি, আবদার করতেও শিখেছে। যে আমি পারতপক্ষে মিষ্টির ধারে ঘেঁষিনা সে আমিও ‘মিষ্টি খাব, মিষ্টি খাব’ – ধ্বনির ক্রমাগত অত্যাচারে হাটা দেই দোকানপানে। বাবা হওয়ার পর থেকে রাস্তাঘাটে ছোট বাচ্চা দেখলে আমার সন্তান দু’টোর কথা মনে পড়ে যায়। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিল খুঁজতে থাকি। কাউকে দেখি একটা চৌকোণো কাগজের টুকরো চাটতে পেরে খুশিতে গদগদ। কাউকে দেখি মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে কাঁদছে। হয়ত ছেলেটা একটা ভাপা পিঠা খেতে চেয়েছিল। মাসের শেষ। মা বাড়ী ফিরছে চার বাসায় কাজ করে। হয়ত বাসায় চাল বাড়ন্ত। হয়ত গৃহকর্ত্রী মুখ ঝামটা দিয়েছেন। হয়ত অসুস্থ স্বামীর ওষুধ কেনা হয়নি। হয়ত এমন অনেক হয়ত-এর পাল্লায় পড়ে ভাপা পিঠের বদলে ছেলেটা একটা চড় খেয়েছে। তখন আমার চোখের সামনে আমার ছেলেটার ছবি ভাসে। সে সোফায় পা মেলে বসে পোড়াবাড়ির চমচম খাচ্ছে।

যে আল্লাহকে চেনেনি, যে জানেনা তিনি আর-রহমান, যে বোঝেনি আল্লাহ যে কোন মানব সন্তানদের প্রতি তার বাবামা’র চেয়ে অনেক অনেক বেশী গুণে দয়াপরবশ; সে সমাজের সম্পদের বৈষম্য দেখে অবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যে বোঝে আল্লাহ আল আদল, তিনি কাজের বুয়ার বাচ্চাটার প্রতি সামান্যতম অবিচারও করেননি সে চিন্তা করতে বসে কেন কারো কারো জন্য দয়াময় আল্লাহ ক্ষুধাময় চোখের জল লিখে রেখেছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের একদম গোড়ার পড়া – বিভব। বিদ্যুৎ কখন প্রবাহিত হবে? যখন বিভব পার্থক্য থাকবে। পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জের মাঝে যতক্ষণ বিভব পার্থক্য না থাকলে তড়িতের যাবার কোন দিক নেই। বাংলা ভাষায় বিভবের আরেক মানে বিত্ত, সম্পদ। ধনী আর গরিবের ভিতরে থাকে বিভব পার্থক্য। যে আল্লাহ ভৌতবিজ্ঞানের নিয়মগুলো নির্ধারণ করেছেন তিনি অর্থনীতির সূত্রও ঠিক করেছেন। ধনী-গরীবে ব্যবধান এ দুনিয়াতে থাকবেই। থাকবে বলেই পরীক্ষা করে দেখা যাবে যে ধনীর ঐশ্বর্য বেশী, সে কী বিভব পার্থক্য কমাতে তা ব্যয় করে নাকি সিন্দুকে লুকিয়ে রাখে। আল্লাহ তাকে সম্পদ দিয়েছেন, ইচ্ছেশক্তিও

দিয়েছেন। বিভব পার্থক্য আছে বলেই ইচ্ছেশক্তিটার পরীক্ষা আছে। যার ইচ্ছেশক্তি নেই সেই ইলেকট্রিক চার্জ বিভব পার্থক্য নিঃশেষ না হওয়া অবধি ইলেকট্রন বিলিয়েই যাবে। তড়িৎ প্রবাহ আল্লাহর নিয়ম মানে, মানুষের সম্পদের প্রবাহ মানে না।

আমার পরিবারের জন্য আমি খরচ করি – স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মার জন্য। নিজের জন্যও করি। সারাদিনের ধকল শেষে বাসায় ফেরার সময় মাঝেমধ্যে রিকশায় চাপি। দশটাকায় আরাম কিনে নেই। ভাবতে থাকি –আমার মাও কর্মজীবি মহিলা ছিলেন। তিনি তেজঁগা থেকে হেটে বাড়ী এসেছিলেন ছোট্ট আমাকে নিয়ে। তার রিকশা তো দূরের কথা সেদিন বাসভাড়াটাও সাথে ছিলনা। আজ আল্লাহ আমাকে কত দিয়েছেন। কত্ত দিয়েছেন যে আমার ছেলেকে আমি দোকান থেকে মিষ্টি কিনে খাওয়াই। আমার ঘর বড় হয়েছে। ফ্রিজ খুললে খাওয়ার কিছু না কিছু পাওয়া যায়। আমি দুপুরে নান-সব্জি খেয়ে নির্দ্বিধায় চল্লিশ টাকা খরচ করে ফেলি। যে রিকশাওয়ালাটা আমাকে বয়ে নিয়ে যায় সে হয়ত দুপুরে কিছু খায়নি, একেবারে সন্ধ্যায় গিয়ে ভাত খাবে বলে। পেটে ক্ষুধা তারও আছে, অভাব আছে, কিন্তু বিভব নেই।

এককালে আমার পরিবারে বিভব ছিলনা, এখন আছে। ধীরে ধীরে চারপাশের মানুষ আর আমার মধ্যে বিভব পার্থক্য বেড়েছে। সেটা মেটাতে আমি কী করি তা আল্লাহ পরখ করে দেখছেন। হঠাৎ আল্লাহ আমাকে নিঃস্ব করেও দিতে পারেন। কিন্তু যতদিন কিছু উদ্বৃত্ত সম্পদ দিয়ে রেখেছেন ততদিন খুব কঠিন একটা পরীক্ষার মাঝে আছি। পরীক্ষাটা কঠিন এ কারণে যে সম্পদকে মানুষ পরীক্ষা মনে করেনা, আল্লাহর কাছে তার ন্যায্য পাওনা মনে করে।

ইসলাম যতগুলো অদেখাতে বিশ্বাস করতে বলে তার মধ্যে পরকালের বিশ্বাস অন্যতম। পরকালে বিশ্বাস মানে এ পৃথিবীতে আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তার সবগুলোর কি ব্যবহার আমি করলাম সে জবাব আল্লাহর কাছে আমাকে দেয়া লাগবে। যারা মুসলিম নয়, যাদের কাছে আখিরাতের দায়বদ্ধতা কেবলই কথার কথা তাদের এ দুনিয়াতে কোন সমস্যা নেই। নারী আন্দোলনের নেত্রীরা নারী অধিকার নিয়ে কথা বলে বাসার কাজের মানুষটাকে নির্দয় পেটাই করতে পারে। শ্রমিক নেতারা খাটুনী ছেড়ে পুঁজিবাদীদের কাছে শ্রমিকদের বিশ্বাস বিক্রি করতে পারে। কালো বেড়ালরা বস্তা বস্তা টাকা হাপিস করতে পারে। মার্কামারা গ্রুপ অফ ইন্ড্রাস্ট্রির মালিকেরা সাধারণ মানুষের গচ্ছিত টাকায় মোচ্ছব করতে পারে। কিন্তু আমি মুসলিম। অন্যের সম্পদ স্পর্শ তো দূরের কথা, নিজের হালাল টাকা কিভাবে খরচ করলাম –

এই হিসেব আল্লাহর কাছে দিতে হবে এই চিন্তায় আমাকে গলদঘর্ম হতে হয়। আমার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকলে আমার ঈমান নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। সমাজের অনাচার ঠেকানো আমার জন্য ঐচ্ছিক বিষয় নয়, আবশ্যক। অন্যায় দেখে যদি চুপ থাকি তাহলেও আমার ঈমান ফিকে হয়ে আসে।

আমি মুসলিম বলেই যখন সুরা মা'আরিজে পড়ি – "তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে তাকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে?" – তখন আমার বুকটা কেমন কেঁপে যায়। আসলেই তো – আমাদের কর্মে তো আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে না। অনন্তকাল সুখে থাকব এই আশা করে চলেছি কিন্তু আল্লাহ যে মুসল্লিনদের কথা বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আমি পড়ি কি? আমার সম্পদ থেকে 'সাঈল' অর্থাৎ ভিক্ষুক আর 'মাহরুম' অর্থাৎ বঞ্চিতদের হক আমি তাদের ঠিক মত বিতরণ করছি তো? হঠাৎ হিসেব করতে বসলাম মাসে কত আয় করি আর কত আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করি। নিজের আর পরিবারের পেটে যা যায় তার সাথে আল্লাহর রাস্তার বরাদ্দটার একটা অনুপাত বের করলাম। খুব লজ্জায় পড়ে গেলাম, খুব। যে শৌখিন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি সেটা ধরে রাখতে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার অংশটা সম্মানজনক থাকেনা। খাতওয়ারী হিসেবে করলে 'ফি সাবিলিল্লাহ'র অঙ্কটাতে এখনই লজ্জা লাগছে। হাশরের মাঠে যখন ফিরে আসার পথ থাকবেনা তখন আল্লাহর সামনে মুখ তুলব কেমন করে?

আল্লাহ কুরআনে বলছেন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। 'খরচ' কথাটা কেন বললেন? খয়রাত কেন নয়? ভিক্ষা কেন নয়? আল্লাহর রাস্তায় খরচ মানে কী? দুশ টাকা খরচ করলে এক কেজি মিষ্টি মেলে, দশ টাকা খরচ করলে পায়ের আরাম। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের ফল কী? যারা পরকালে অবিশ্বাসী তারা বলবে -লবডঙ্কা। আমরা বলি – না, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। সেটার জন্যই এই পৃথিবীতে আসা। একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে। তাকে সন্তুষ্ট করতে। তিনি যা দিয়েছেন সেখান থেকে তার জন্যে খরচ করতে হবে। তার আর যেসব বান্দাদের দেননি তাদের জন্য ব্যয় করতে হবে। দান আল্লাহ মানুষকে করে, মানুষ মানুষকে করতে পারেনা। মানুষ বড়জোর এক সম্পদবঞ্চিত ভাইয়ের সাথে আল্লাহর দানটা ভাগাভাগি করে নিতে পারে। বিভব পার্থক্য কমানোর চেষ্টা মানুষকে করতে হবে। সমাজতন্ত্রীদের মত গায়ের জোরে নয়। আল্লাহকে ভালোবেসে, তার সৃষ্টিকে

ভালোবেসে। আমরা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদয় হব, তিনিও যেন আমাদের প্রতি সদয় হন – এই আশায়।

আমাদের উচিত আয়ের একটা সম্মানজনক অংশ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। তাতে আরাম যদি একটু কমে কমুক। পৃথিবীতে তো আসলে আরাম করার কথা ছিলনা। যাদের লক্ষ্য দুনিয়াতেই জান্নাত তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ঘাপটি মেরে বসে আছে। দুনিয়াতে সুখের জোয়ারে ভাসার কথা মুসলিমের নয়। অন্তত বিভব পার্থক্য যখন আকাশ ছুঁইছে তখন তো নয়ই। যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিলাসিতা ছেড়ে দেবে তাদের আল্লাহ পরকালে বলবেন – "খাও এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে, এটা তোমাদের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ।" আর যারা দুনিয়া নিয়ে মশগুল তাদের আল্লাহ কিছুটা বিদ্রুপই করছেন – "খাও এবং আনন্দফুর্তি কর অল্প কিছুদিনের জন্য; নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী।" সূরা মুরসালাতের এই দু'টি চিত্রকল্প আমাদের ধাক্কা দেয়, উপহাস করে আমাদের অপরিণামদর্শীতাকে।

খাদ্যের পরে যে মৌলিক চাহিদা মানুষকে তটস্থ রাখে তা হল পোশাক। এই আভরণ দেহে জড়িয়ে মানুষ উলঙ্গ পশুদল থেকে আলাদা হয়, শীত-গ্রীষ্মের প্রখরতা থেকে আত্মরক্ষা করে। ঢাকার জনসংখ্যা আর যন্ত্রসংখ্যার তোড়ে শৈত্যপ্রবাহ টের পাওয়া যায়না। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবশ্য 'আরবান হিট আইল্যান্ড' নেই। সেখানে একটি রাত থাকলে শীতের কামড় কাকে বলে বোঝা যায়। আমেরিকায় যখন বরফের মধ্যে দিয়ে পথ চলতাম তখন অপেক্ষা করতাম কখন ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল হিটেড বিল্ডিংটাতে ঢুকতে পারব। বান্দরবানের পাহাড়ে কোন হিটিং সিস্টেম নেই। লালমনিরহাটের ভাঙ্গা বেড়ার বাড়ীগুলোতে হিট ইনসুলেটর নেই। তিস্তার নদীভাঙ্গা এলাকার মানুষেরা চরে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকে। উত্তুরে হাওয়া যখন বয় তখন নর্থফেস কিংবা কলম্বিয়া জ্যাকেটের উষ্ণতা তাদের কাছে জান্নাতের স্বপ্নের মতই। কচুঘেচু খেয়ে হয়ত দিন চলে যায়, কিন্তু হিমময় লম্বা রাতটা যেন আর কাটে না।

শীত এসে পড়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। ফোনে অনুরোধ আসছে – কিছু যেন করি। গতবার লাইনে দাঁড়ানো দু'হাজার মানুষের মাঝে দেয়ার মত অবশিষ্ট ছিল মাত্র দুশ কম্বল। কিছু দিতে না পারার লজ্জায় গা থেকে গরম কাপড় খুলে দিয়েছিলেন আমাদের ভাইয়েরা। লজ্জাটা যারা বিতরণ করতে গিয়েছিল তাদের একলার না, আমাদেরও। এই লজ্জা ঘরের ভারী পর্দা

ঠেলে ঢুকতে পারেনা। এই লজ্জা পেতে হলে শহর ছেড়ে অন্তত একটাবার গ্রামে যেতে হবে। মানুষ যে কষ্টে আছে এটা নিজে শীতে না কাঁপলে বোঝা যায়না। লজ্জা না পেলে আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যয় করতে হবে এ বোধটাও কাজ করে না। যে আল্লাহ আমাদের সম্পদ দিয়েছেন তার জন্য খরচ করা ন্যূনতম সৌজন্যবোধের মধ্যে পড়ে। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে এ লজ্জাটা তৈরী করে দেন। তিনি যেন মানুষের কষ্ট বোঝার, তাদের জন্য কিছু করার তৌফিক দেন। আমিন।

১১ মুহাররম, ১৪৩৪ হিজরি।

আমার ভাগ্য কী আমার হাতে

The lamb thy riot dooms to bleed today,

Had he thy reason, would he skip and play?

Pleas'd to the last, he crops the flow'ry food,

And licks the hand just rais'd to shed his blood.

Oh blindness to the future! kindly giv'n,

That each may fill the circle mark'd by Heav'n:

কবি আলেকজান্ডার পোপের এই চিত্রকল্পটি যখন প্রথম পড়েছিলাম তখনও আমি ইসলাম বোঝা শুরু করিনি। কিন্তু ব্যাপারটা আসলেই খুব মনে ধরেছিল। একটা ভেড়া যদি জানত আজ তার জীবনের শেষ দিন, সে কি লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতে পারত? সেকি তার এতদিনের পালক কিন্তু ভবিষ্যত হন্তারকের হাত থেকে খাবার খেতে পারত? আসলে আল্লাহ অনেক দয়া করে ভাগ্যকে আমাদের সামনে অজানা রেখেছেন নয়ত আমরা একটি দিনও চলতে পারতামনা।

জ্ঞান প্রকাশ্যের আকাঙ্খা যাদের মধ্যে প্রবল তাদের বিতর্কের একটা প্রিয় বিষয় হচ্ছে ভাগ্য। অবশ্য শুধু পন্ডিত নয়, ভাগ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সাধারণ মুসলিমরাও বিপদে পড়ে যায় প্রায়ই। ভাগ্য অদৃশ্য জগতের ব্যাপার। অতীতকে আমরা দেখি কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে তা কেউ জানে না। হস্ত-বিশারদ নামের কিছু বদ্ধ উন্মাদ ভবিষ্যত জানার দাবী করে কিন্তু এদের একটা কথা মেলে তো দশটা মেলে না। আরে ভবিষ্যত জানলে তো লটারীর টিকিট বা সস্তা শেয়ার কিনে বড়লোক হওয়া উচিত, মানুষের হাত ধরে ধাপ্পাবাজী কেন করা? মানুষ আসলে ভবিষ্যত জানে না, ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে আছে, আর কারো কাছে নেই। ইসলামে ভাগ্য সম্পর্কে শিক্ষাটা খুব স্পষ্ট যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অর্জন করা দরকারী, এতটাই জরুরী যে একে ঈমানের স্তম্ভ বলা হয়েছে। প্রায়োগিক জীবনে এ শিক্ষার সুফল – এতে জীবন সহজ হয়, খুব কষ্টের মুহুর্তগুলোকেও ইসলামের পরশপাথর দিয়ে বদলে দেয়া যায়।

আরবিতে ভাগ্যকে ক্বদর বলা হয়। মুসলিম হিসেবে এর ভালো ও খারাপ ফলাফলে বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ। ক্বদরের চারটি স্তর আছে –

1. জ্ঞান: আল্লাহর জ্ঞান অসীম। তিনি সৃষ্টি করার আগে থেকেই সব কিছু জানেন। পৃথিবী শুরু থেকে ধ্বংস অবধি কি হবে আর কি হবে না, কিভাবে হবে, কেন হবে সব তিনি জানেন।

2. কিতাব: আল্লাহ কিয়ামাত পর্যন্ত যা ঘটবে তার সব কিছু 'লাওহে মাহফুয' নামের একটি কিতাবে লিখে রেখেছেন।

3. ইচ্ছে: আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই হয়। কোন কিছুই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হয় না। আবার তিনি যা ইচ্ছে করেন না তা হয় না।

4. সৃষ্টি: আল্লাহ আমাদের যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমন আমাদের সব কাজ, সব কথাও তিনিই সৃষ্টি করেছেন।[13]

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার পাশাপাশি সে জীবনে কী করবে, কত দিন বাঁচবে, কী খাবে, কোথায় জন্মাবে, কোথায় মারা যাবে ইত্যাদি সব কিছু ঠিক করে রেখেছেন। আল্লাহ যা ঠিক করে রেখেছেন তার বাইরে কিছুই হবে না। আল্লাহ যা চান সেটা হবেই, কেউ সেটা ঠেকাতে পারবে না। আর আল্লাহ যা চান না সেটা কোনভাবেই হবে না, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একসাথে চেষ্টা করলেও সেটা হবে না।[14]

আল্লাহ মানুষ ও জ্বীনকে এমন কিছু দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি, সেটা হল ইচ্ছেশক্তি।

"অতএব যার ইচ্ছা, সে এটা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।"[15]

আল্লাহ ইচ্ছেশক্তি দেয়ার সাথে সাথে দু'ধরণের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন – সৎ ও মন্দ। আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন সে যেন ভাল পথে চলে আর খারাপ পথে না চলে। কিন্তু

13 সূরা আস-সফফাত, ৩৭:৯৬
14 ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিরমিযি
15 সুরা মুদদাস্সির (৭৪), আয়াত ৫৫

মানুষ কোন পথে চলবে সেটা আল্লাহ মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে দুই পথেই চলার ক্ষমতা দিয়েছেন, ভালো কাজ করার শক্তি দিয়েছেন তেমনি খারাপ কাজ করারও শক্তি দিয়েছেন। কিন্ত তিনি মানুষকে তার পছন্দ-অপছন্দের কথা জানিয়ে দিয়েছেন – যে ভালো পথ বেছে নেবে, ভালো কাজ করবে তাকে আল্লাহ পুরষ্কার দেবেন। আর যে খারাপ কাজ করবে, খারাপ পথে চলবে তাকে তিনি সেজন্য শাস্তি দেবেন। আল্লাহ যদিও পছন্দ করেন না যে মানুষ খারাপ কাজ করুক, তবুও যেহেতু তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছেশক্তি দিয়েছেন তাই তিনি সেই অপছন্দনীয় কাজটি করার সামর্থ্য এবং প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহ জানেন মানুষ কী করবে, কিন্তু মানুষ নিজের ইচ্ছেতেই সেটা করবে।

একটা ছাত্র একেবারেই পড়াশোনা করে না। তার শিক্ষক তার পড়াশোনার অবস্থা দেখে বললেন যে, এই ছেলে পরীক্ষায় খারাপ করবে। ফল বের হবার পর দেখা গেল সত্যি সত্যি সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। তাহলে পরীক্ষায় খারাপ করার জন্য কি সেই শিক্ষক দায়ী না সেই ছাত্র দায়ী? অবশ্যই সে ছাত্র দায়ী। ঠিক সেরকম আল্লাহ জানেন যে কে ভাল কাজ করবে আর কে খারাপ কাজ করবে। কিন্তু যেহেতু তার জ্ঞান কাউকে বাধ্য করেননি তাই যে যার নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকবে।

একজন মানুষ কামারের কাছ থেকে একটা বটি কিনে আনল। এই বটি দিয়ে সে একদিন রাগের বশে তার স্ত্রীকে আঘাত করে মেরে ফেলল। এই ঘটনায় বটি তৈরীর কারণে কি কামারকে অভিযুক্ত করা যাবে? ছুরি-বটি ছাড়া রান্নাঘর চলেনা – তার বেশীরভাগ ব্যবহারই উপকারী। কিন্তু এটা দিয়ে যদি কেউ মানুষ মারে তাহলে বুঝতে হবে দোষটা উপকরণের নয়, ব্যবহারকারীর। ঠিক তেমন আল্লাহ আমাদের বুদ্ধি-বিবেক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী করে দিলেন, খাবারের মাধ্যমে শক্তি দিলেন এবং কোন একটা প্রেক্ষাপটে এনে উপস্থিত করলেন। তিনি আমাদের কাজের স্রষ্টা হলেও আমরা কি করব সেটা আমরাই সিদ্ধান্ত নিই।

মানুষ যেহেতু ভবিষ্যত জানে না, তাই তার কর্তব্য যখন আল্লাহ তাকে কোন পরিস্থিতিতে ফেলেন তখন কুর’আন এবং সুন্নাহের মোতাবেক আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী কাজ করা, আপন প্রবৃত্তিকে তোষণ না করা। যেমন, একটা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আমি দেখলাম সুন্দরী বাছাই প্রতিযোগীতা চলছে। আবার ঘরের কোণে কুরআনুল কারীমের একটা অনুবাদও পেলাম। আল্লাহ মানুষকে দিয়ে টেলিভিশন তৈরি করিয়েছেন, এর অনুষ্ঠানগুলো তৈরি

করিয়েছেন এবং এর চলার জন্য দরকারী শক্তি বিদ্যুতের উৎসও সৃষ্টি করেছেন। আবার কুর'আনের বাণী আল্লাহর নিজের, তিনি আলিমদের দিয়ে এর অনুবাদ করিয়ে নিয়েছেন, বিজ্ঞানীদের দিয়ে ছাপাখানা তৈরী করিয়ে নিয়েছেন। এখন আমি কী করব সেটাই আল্লাহ পরীক্ষা করে পুরষ্কার অথবা শাস্তি দেবেন। আমি যদি টিভিতে মেয়েদের নিলামে তোলার আয়োজন দেখি তাহলে শাস্তি পেতে হবে। যদি আমি ঐ সময় কুরআন পড়ে সময়টা পার করি তাহলে আল্লাহ আমাকে সেজন্য পুরষ্কার দেবেন।

কিছু প্রশ্ন ও ভুল ধারণা:

১. যদি আল্লাহ সবই জানেন তাহলে তিনি সবকিছু সৃষ্টি করতে গেলেন কেন?

জান্নাতে যাওয়া যাদের নিশ্চিত তাদের জান্নাতে দিলে তারা যে কিছু ভাল কাজ করে, কিছু ত্যাগের বিনিময়ে, প্রচেষ্টার বিনিময়ে জান্নাত পেয়েছে সেটা থাকত না। কিন্তু দুনিয়ার জীবন পার হয়ে যখন মানুষকে জান্নাতে দেয়া হবে, তার বুঝতে পারবে তারা কতটুকু কষ্ট করেছে আর তার বদলে কত বড় পুরষ্কার পেয়েছে।

জাহান্নামীদের সরাসরি জাহান্নামে দিলে তারা আপত্তি তুলত, আল্লাহ অন্যায় বিচার করেছেন। দুনিয়াতে সময় কাটানোর ফলে তারা নিজেদের অন্যায়টা তারা বুঝতে পারবে। কেন সত্যের খোঁজ করেনি, সত্যটা পেয়েও মানেনি – এ মর্মে আফসোস করতে থাকবে। আমরা জাহান্নামের শারীরিক শাস্তির বর্ণনা পড়ে ভয় পাই, কিন্তু সেখানে কি পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণা আছে তা কী ভেবে দেখেছি? 'কেন ঐ খারাপ কাজটা করেছিলাম' 'কেন ঐ ভাল কাজটা করিনি' – এই পরিতাপের মানসিক যন্ত্রণা এত ভয়াবহ যে মানুষ সারা জীবনে করা একটা ভুলের হিসেব না মেটাতে পারে আত্মহত্যা করে। কিন্তু সারাটা জীবন যখন মিথ্যা হয়ে যায়, সারাটা জীবন যখন পরিতাপের কারণ হয়ে যায় তখন অনুভূতিটা কি ভীষণ ভয়াবহ ভাবা যায়?

২. আল্লাহ খারাপ কাজ/কথা সৃষ্টি করলেন কেন? ভাল একজন সত্ত্বা কি খারাপ কিছু সৃষ্টি করতে পারে?

আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা হয় – 'পুরোপুরি ভালো' অথবা 'অল্প খারাপ বেশি ভালো'; এর মানে আল্লাহ খারাপ কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার কিছুর কোন

খারাপ দিক থাকতে পারে কিন্তু সেটারও ভালো দিক অনেক বেশি। একটা হাদিসে আমরা এই প্রমাণ পাই।

রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে তার সাহাবাদের নিয়ে বসতেন সেখানে একটা ছোট ছেলে খেলা করত। ছেলেটার বাবা রসুলের সাহাবাদের সাথে বসে রসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা শুনতেন। বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি দেখলেন যে সেই লোক আর সেই বাচ্চা কেউই আসে না। তিনি সাহাবাদের জিজ্ঞেস করে জানলেন যে ঐ বাচ্চাটা মারা গেছে আর সেজন্য ঐ লোকটা এত কষ্ট পেয়েছে যে সে আসছে না। রসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন ঐ লোকটার সাথে কথা বললেন। তিনি লোকটাকে জানালেন যে যদি রসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করেন তবে ঐ বাচ্চাটাকে আল্লাহ আবার জীবন ফিরিয়ে দেবেন। তবে লোকটি যদি ধৈর্য ধরে তবে ঐ বাচ্চাটি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।[16]

মৃত্যু একটা কষ্টকর ব্যাপার তা ঠিক কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার আনন্দের তুলনায় মৃত্যু কিছুই নয়। তাই আমাদের কাছে কোন জিনিস খারাপ মনে হলেও আসলে সেটা খারাপ না, তার ভালো কোন দিক আছে। কিন্তু আমরা মানুষেরা সময়ের খুব ছোট একটা অংশ দেখতে পাই বলে আমরা কখনই আল্লাহর সব কাজের কারণ বুঝতে পারবো না। শয়তানকে যদি সৃষ্টি না করা হত, তাহলে মানুষ দুনিয়াতে পরীক্ষাও দিতে পারত না, জান্নাতের মত অকল্পনীয় একটা পুরষ্কারও পেত না। তাই শয়তান আপাত দৃষ্টিতে 'খারাপ' হলেও আদতে সে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার একটা পরীক্ষা মাত্র।

৩. আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তর তালাবদ্ধ করে রেখেছেন বলে তারা সত্যটা বুঝতে পারছে না।

বরং ব্যাপারটা উলটো; কুর'আনের যত জায়গায় অন্তর তালাবাদ্ধ করার কথা এসেছে সবখানেই কোন অপরাধে আল্লাহ মোহর মেরেছেন তা বলে দিয়েছেন। যেমন সুরা বাকারার শুরুতে আল্লাহ 'আল্লাযিনা কাফারু' অর্থাৎ যারা অবিশ্বাস করেছে – একথা বলে তাদের অপরাধ স্পষ্ট করে নিয়েছেন। তারপর তিনি আপন রসুলকে এই বলে সান্তনা দিচ্ছেন যে,

16 সুনানে নাসাঈ

এমন মানুষদের সাবধান করা আর না করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ তারা তাদের অবিশ্বাসের উপর এতটাই দৃঢ়প্রত্তিজ্ঞ যে আল্লাহ তাদের অন্তরে তালা মেরে দিয়েছেন; শ্রবণ-দৃষ্টিশক্তিতে পর্দা দিয়ে রেখেছেন। সুতরাং এ ধরণের মানুষের সাথে সময় নষ্ট করার দরকার নেই, তাদের প্রত্যাখ্যানে ব্যাথিত হবারও কিছু নেই।

মজার ব্যাপার হচ্ছে একজন অবিশ্বাসী যখন দাবী করে তার অন্তরে মোহর আছে সুতরাং তার কোন দোষ নেই তখন আসলে সে নিজেই নিজের অন্তরে মোহর মেরে নিল। মোহর তো আর ভারতীয় গরুর গায়ের সিল না যে সেটা বাইরে থেকে দেখা যাবে। আর অবিশ্বাসীদের কাছে আল্লাহ ওয়াহীর মাধ্যমে কোন তালিকাও পাঠিয়ে দেননি যেখানে সে তার নামটা খুজে পেয়েছে। আল্লাহ যাকে খুশী বিভ্রান্ত করেন এই আয়াতের মাধ্যমে যারা বিভ্রান্ত হতে চায় তারা বিভ্রান্তদের দলে যোগ দেয়। অথচ একই আয়াতে যে আল্লাহ যাকে খুশী হিদায়াত করেন বলে উল্লেখ করেছেন সেটা অবিশ্বাসীদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বাসীরা যখন এই আয়াত পড়ে তখন তারা আশায় বুক বাঁধে – এই পৃথিবীর নানা মতবাদের ডামাডোলে আল্লাহ আমাকে সত্য পথটা নিশ্চয়ই দেখাবেন।

৪. আল্লাহর ইচ্ছেতেই যদি সবকিছু হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছের দাম কী?

আল্লাহর চাওয়া বা ইচ্ছেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় – শারঈ বা বিধানগত, কাওনি বা সৃষ্টিগত।

শারঈ বা বিধানগত ইচ্ছে হল যা আল্লাহ ভালবাসেন কিন্তু এই ইচ্ছেটা আল্লাহ মানুষের ইচ্ছের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন, তিনি মানুষকে এটা মানতে বাধ্য করেননি। একজন মুসলিম তার নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর শারঈ ইচ্ছের অধীন করে দেয়। আল্লাহর কাওনি বা সৃষ্টিগত ইচ্ছের মধ্যে যা আল্লাহ ভালবাসেন এবং যা আল্লাহ ভালবাসেন না, দুটোই পড়ে। আল্লাহর কাওনি ইচ্ছে জীব-জড়, পশু-পাখি, মুসলিম-অমুসলিম, সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, এবং কেউই এক অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

যখন আল্লাহ আল কুর'আনে বলেন যে তিনি ইচ্ছে করলে সবাইকে হিদায়াত করতে পারতেন তখন তিনি তার 'কাওনি' ইচ্ছের কথা বোঝান। কিন্তু তার সাথে সাথেই তিনি জানিয়ে দিলেন তিনি সবাইকে জোর করে হিদায়াত করবেন না, কারণ সত্য তো এই যে

যারা স্বেচ্ছায় তার অবাধ্য হবে তাদের দ্বারা তিনি জাহান্নাম পূর্ণ করবেন, সেটা মানুষ হোক আর জ্বীন।[17] এখানে অন্য কোন সৃষ্টির কথা আসেনি কারণ কেবলমাত্র এ দু'টো সৃষ্টিরই স্বাধীন ইচ্ছেশক্তি দেয়া হয়েছে। আল-কুরানে আল্লাহ বলেন, মানুষ ইচ্ছে করতে পারবে না যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছে করেন[18] – এখানেও আল্লাহর 'সৃষ্টিগত' ইচ্ছে বুঝিয়েছে কারণ তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছেশক্তি এবং বিবেচনাবোধ দিয়েছেন বলেই সে আল্লাহর পথ বেছে নিতে পারে।

মহান আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছে কিন্তু নেহায়েত খামখেয়ালি নয় বরং তার ভিত্তি আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং অসীম প্রজ্ঞা। কুর'আনে সৃষ্টিগত ইচ্ছের কথা বার বার উল্লেখিত হওয়ার কিছু কারণ আছে –

প্রথমত, যাতে বিশ্বাসী মুসলিমরা আত্মশ্লাঘাতে না ভোগে, তাদের যেন সবসময় মাথার মধ্যে থাকে যে তারা যে সুপথ পেয়েছে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। মুমিনের মনে অহংকার এসে বাসা বাঁধার সুযোগ যেন তৈরী না হয়।

দ্বিতীয়ত, যাতে ইসলামের পথে আহবানকারীরা এটুকু মনে রাখেন যে, তাদের দায়িত্ব শুধু আহবান জানান। কে মানবে, কে মানবেনা – এটা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছে যেখানে আল্লাহ হস্তক্ষেপ করেন না। সেখানে কাউকে জোর করে মুসলিম বানানোর যেমন সুযোগ নেই তেমনি ইসলামের দাওয়াত গৃহীত না হলে হতাশ হবারও কিছু নেই। মানুষ তার সাধ্যমত দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ সেই চেষ্টার বিচার করবেন, ফলাফলের নয়।

তৃতীয়ত, যে মানুষটা একবার বুঝে গেছে যে আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া তার কোন ক্ষতি হবে না এবং হলেও ততটুকুই হবে যতটুকু আল্লাহ চেয়েছেন, তাকে পৃথিবীর কোন শক্তির ভয় দেখিয়ে সত্য প্রচারে থামান যাবে না। যে মানুষটা বুঝে গেছে যে আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া তার কোন উপকার কেউ করতে পারবে না এবং পারলেও ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ চেয়েছেন, তাকে পৃথিবীর কোন কিছুর লোভ দেখিয়ে অন্যায় কাজে লিপ্ত করা যাবে না। এটা

17 সুরা আস-সাজদা (৩২), আয়াত ১৩
18 সুরা আল-ইনসান (৭৬), আয়াত ৩০

ঈমানের সর্বোচ্চ শিখর, যেখানে উঠতে পেরেছিলেন বলে সাহাবারা অর্ধশতাব্দীর কম সময়েই অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের বাণী পৌছে দিতে পেরেছিলেন।

চতুর্থত, পার্থিব জীবনে সুখী থাকা। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন –

> আদম সন্তানের সুখ নির্ভর করে তার প্রাপ্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার উপরে। আদম সন্তানের দুঃখ ইস্তিখারা না করাতে, প্রাপ্তি নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকাতে।[19]

মানুষকে মেনে নিতে হবে যে তার ভাগ্যে যা আছে তা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাকে তাই যেকোন অবস্থাতেই আল্লাহর উপর খুশি থাকতে হবে। তার মানে এই না যে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব। আমাদের দায়িত্ব পার্থিব এবং পরকালীন সফলতার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। সর্বোচ্চ চেষ্টার পরেও যদি পার্থিব কোন ব্যাপারে আমরা ব্যর্থ হই, তাহলে আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা রেখেছেন সেটাই মঙ্গলকর এ বিশ্বাস করতে হবে। তা খুশি মনে মেনে নিতে হবে। আর যেহেতু আল্লাহ আমাদের পরকালে কি হবে জানিয়ে দেননি সেহেতু আমৃত্যু ভাল কাজ করে যেতে হবে; আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে যেন তিনি আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, জান্নাতে স্থান দেন।

কোন বিপদে মন খারাপ না করে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তার প্রশংসা করতে হয় কারণ এর চেয়ে বড় বিপদ তিনি দিতে পারতেন। আল্লাহ যখন কোন মানুষের জীবনে কোন বিপদ বা দুঃখ-কষ্ট দেন তখন তার তিনটি ভাল দিক থাকে –

১. যদি সেই মানুষটি খারাপ কাজ করতে থাকে তবে সে যেন বিরত হয় এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

২. সেই মানুষটি যেসব অন্যায় কাজ করেছে, পাপ করেছে তার প্রতিফল হিসেবে বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পৃথিবীতেই তার অপরাধের শাস্তি দিয়ে দেয়া।

৩. বিপদে মানুষটি ধৈর্য ধরে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং সে ধৈর্য ধরলে তার অনেক বড় পুরষ্কার দেয়া।

---

19 হাকিমের মতে সহীহ, ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে হাসান হিসেবে রায় দিয়েছেন

তাই বিপদে পড়লে আমাদের উচিত পাপ স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, আল্লাহ যেন আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন সে জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা কারণ একমাত্র দু'আতে আল্লাহ ভাগ্য পরিবর্তন করেন।[20] অতঃপর কর্তব্য ঐ পরিস্থিতিতে আল্লাহর অনুমোদিত পথে যা করলে বিপদ কাটবে তা করা।

বিশাল এ পৃথিবীতে সময় কিংবা স্থানের বিচারে আমরা আসলে অতি ক্ষুদ্র অস্তিত্ব। আমরা অনেক বড় বড় কথা বলতে পারি, অনেকের সমালোচনা করতে পারি কিন্তু দিন শেষে আমাদের প্রভাব বলয় অতি সীমিত। অহেতুক কথা না বলে, অনর্থক কাজ না করে আমাদের উচিত যে পরিস্থিতিতে আল্লাহ আমাদের রেখেছেন সে পরিস্থিতিতে সাধ্যমত সর্বোৎকৃষ্ট কাজটা করা। শেষ বিচারের দিনে আসলে বিচার হবে এটারই – আমার বেছে নেয়া ইচ্ছেগুলো কী ছিল। অন্যদের ইচ্ছেগুলো আমার জীবন প্রভাবিত করে সত্যি, কিন্তু আসলে তো আমি সেগুলো চাইলেই বদলে ফেলতে পারব না। তাই আমি যেখানে আমার ইচ্ছেশক্তি খাটাতে পারব – আমার আপন ব্যক্তিসত্ত্বার উপরে, সেখান থেকেই শুরু হোক পথ চলা, পরকালের অসীম মুক্তির পথে। আল্লাহ যেন তার যাবতীয় ইচ্ছে মেনে, আমাদের ইচ্ছেটাকে তার ইচ্ছেমত পরিচালিত করার ক্ষমতা দেন। আমিন।

২১ যুল-ক্বদা, ১৪৩৩ হিজরি।

20 তিরমিযি, ইবনে মাযাহ

অপমানের জ্বালা প্রতিবাদের দৌড়

হুজুগে বাঙালী বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। সম্প্রতি রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো থেকে মনে হয়েছে অবিলম্বে এই প্রবাদ বদলে 'হুজুগে মুসলমান' করা উচিত। সমুদ্রের ফেনার মত অগণিত মুসলমান, গর্জন করে তীরে আছড়ে পড়ছে। তারপরেই সেই বুদবুদ গায়েব।

সারা দুনিয়াতে মুসলিমরা অভিযোগ করছে মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা করা হয়েছে। এ কথা বলার আগে কেউ ভেবেও দেখল না আসলে কি রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা করা যায়? সূর্যের দিকে থুথু ফেললে কি সেটা সূর্যের গায়ে লাগে? সারা পৃথিবীর মানুষ যদি এক হয়ে থুথু ছোড়ে তাহলেও সেটা মাধ্যকর্ষণের বাঁধা পার হতে পারবেনা; সূর্যে পৌছা তোবহু দূরের কথা।

রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন এমন মানুষ যিনি ইসলামের কথা বলতে গিয়ে পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। তিনি তায়েফে মাস্তানি করতে যাননি, এলাকা দখল করতেও না। তিনি মানুষকে বলতে গিয়েছিলেন তোমরা এই সব পাথরের পূজা করার বদলে এক আল্লাহর ইবাদাত কর। ধারাল ছুরি দিয়ে রক্ত বের করা সহজ কিন্তু দূর থেকে পাথর মেরে রক্ত বের করতে হলে কতগুলো পাথরকতক্ষণ ধরে ছুড়তে হয় ভাবা যায়? সেই রক্ত বয়ে শরীর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জুতাটাকে চামড়ার সাথে শক্ত করে আটকে ফেলল। তিনি একটা খেজুর বাগানে এসে আশ্রয় নিয়ে কি ভাবলেন? তিনি ভাবলেন হয়ততিনি ঠিকভাবে দাওয়াহ দিতে পারেননি। আঘাত পেয়েও তিনি নিজেকে দুষলেন।

জিবরিল আমিন মালাকুল জিবাল বা পাহাড়ের ফেরেশতাকে নিয়েআসলেন তায়েফবাসীকে দু পাহাড়ের মাঝে পিষে ফেলার অনুমতি চাইতে। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দেননি, তিনি তাদের ক্ষমা করেছিলেন। তিনি তাদের হিদায়াতের জন্য দু'আ করেছিলেন।

এই মানুষটাকে কি অপমান করার সাধ্য কি কারো আছে? শত কোটি চেষ্টাতেও এই মানুষটাকে কি অবমাননা করা যায়? করা যে যায়না তিনি নিজেই কি সেকথা বলেননি?

> তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে কিভাবে আল্লাহ আমাকে কুরাইশদের অবমাননাকর গালি, অভিশম্পাত থেকে রক্ষা করেন? তারা আমাকে মুযাম্মামকে গালি দেয়, মুযাম্মামকে অভিশম্পাত করে; আর আমি মুহাম্মাদ।[21]

মুহাম্মাদ মানে প্রশংসিত, যে প্রশংসিত তাকে তো আর গালি দেয়া যায়না। তাই কাফেররা রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম বিকৃত করে ডাকতো মুযাম্মাম অর্থাৎ নিন্দিত। এখন যখন কাফেররা মুযাম্মামকে গালি দিচ্ছে তখন তারা মুযাম্মামকে গালিদিচ্ছে, মুহাম্মাদকে তো গালি দিতে পারছে না।

সারা দুনিয়াতে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন ছবি নেই। যাকে বিকৃতভাবে এঁকে, মুভিতে উপস্থাপন করে শয়তানরানাম কামাতে চাচ্ছে সেটা কি আসলেই রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? শেখ হাসিনার ক্যারিকেচার করা যায়, হিটলার-বুশ সবারই কার্টুন আঁকা যায় কিন্তু যাকে বর্তমান বিশ্বের কেউ কখনও দেখেনি তার ছবি আঁকা চলে কিভাবে? নগ্ন ঐ দেহটা তো নাস্তিকদের নবী ডারউইন কিংবা কার্ল মার্ক্সেরও হতে পারে!

একজন ভদ্রলোককে যদি রাস্তার ছোটলোক একটা খারাপ কথা বলে তাহলে বুদ্ধিমানের কাজ তাকে অবজ্ঞা করা। রগচটা কেউ হয়ত মারামারি করে বসতে পারে কিন্তু তাতে আঘাত যেমন জুটবে বাড়তি আরো অনেকগুলো গালিও জুটবে। কিন্তু সুস্থ মাথার এমন কাউকে পাওয়া যাবেনা যে অপমানের কথাকে পাঁচকান করে বেড়াবে। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন্দ্র করে যা কিছু মিথ্যা অপবাদ রটানো হচ্ছে সেগুলোর আলোচনার রুচি আমাদের কি করে হতে পারে? 'ইনোসেন্স অফ মুসলিম' দেখার মত বা মুক্তমনার ব্লগ পড়ার মত, পড়ে অন্যদের সাথে শেয়ার করার মত মানসিকতা আমাদের হয় কি করে? যে জিনিসটা কোনোই দৃষ্টি আকর্ষণ করতোনা সেটাকে আমরা সার্চ ইঞ্জিনের প্রথমে ঠেলে দিলাম। বিকৃত তথ্যের এই ছবির প্রচারণা চালালাম আমরা – এই মুসলিমরা। কোথাকার কোন উজবুককে আমরা বিশ্ববিখ্যাত বানিয়ে দিলাম। ইসলাম অবমাননা প্রকল্পে তাদের হাতের গুটি হিসেবে আমরা ব্যবহৃত হলাম। আমাদের বুদ্ধি কি হাটুতে নেমে গেছে?

---

21 সহীহ বুখারী ৩৫৩৩২

ইন্টারনেটে যাদের ভাল ঘাটাঘাটি আছে তারা জানে কি পরিমাণ নোংরামি তাতে ছড়িয়ে আছে। ধর্মকে আক্রমণ করার সাইট আছে হাজার হাজার। যখননাস্তিকরা ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অপবিত্র কথা বলেছে, মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নোংরামোতে জড়িয়েছে তখন কেন প্রতিবাদ হয়নি? তারা কি আমাদের নাবী নন? ইহুদি-খ্রীষ্টান নামধারীরা যখন বাক-স্বাধীনতার নামে নিজেদের ধর্মকে ব্যঙ্গ করেছেতখন আমরা আঙ্গুল চুষেছি, এখন কেন আমাদের এত আঘাত লাগছে?

কোন জিনিস একবার ইন্টারনেটে চলে আসলে সেটা মুছে ফেলা যায়না। একটা মুভি যদি একবার প্রচার পেয়ে যায় তাহলে সেটা কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবেই। ইউটিউব থেকে যদি স্যাম ব্যাসিলের একাউন্ট বন্ধও করে দেয়া হত, আরকেউ আরেকটা একাউন্ট থেকে ভিডিওটা আপলোড করত। ইনোসেন্স অফ মুসলিমে যে ৪৩ হাজার লাইক পড়েছে এরাই করত। বিশ্বে বর্তমানে ৭১ এর বেশী ভিডিও হোস্টিং সাইট আছে। ইউটিউব থেকেসরালে মেটাক্যাফেতে দিত, মাইস্পেসে দিত, হুলুতে দিত, মেভিওতে দিত।কথার কথা ধরে নেই – পৃথিবীর সব সাইট থেকে সরিয়ে দেয়া হল – টরেন্ট থেকে মানুষ তখন ডাউনলোড করত। নতুন নতুন সাইট বানাত শুধু এই একটা মুভিকে জায়গা করে দেয়ার জন্য। আমরা একটা জিনিস বুঝিনা যে ভার্চুয়াল জগতে কোন কিছু মোকাবেলা করার সবচেয়ে ভাল কৌশল হচ্ছে সেটাকে উপেক্ষা করা, পাত্তা না দেয়া। এটা গ্রীক পুরাণের হাইড্রার মত, একটা মাথা কাটলে দু'টো গজাবে। এখানে প্রতিক্রিয়া দেখানোই মানে ক্ষতি। লিবিয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দুনিয়া বিষয়টি নিয়ে এভাবে মেতে উঠল। ফ্রেঞ্চ ম্যাগাজিন আরো নোংরা কার্টুন আঁকার আগ্রহ পেল।

আমরা এ জমানার মুসলিমরা না দ্বীন বুঝি, না দুনিয়া। কিভাবে কার্যকরী প্রতিবাদ করতে হবে, তার ভাষা কি হবে, ধরণ কি হবে সেটা নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। ভিডিও নির্মাণ করল কে, আর সেজন্য প্রাণ দিতে হল কাদের! মহান আল্লাহ যেখানে কুরানে স্পষ্ট বললেন –

> হে যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের সাক্ষ্য দেয়ায় তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে

প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সব খবর রাখেন।[22]

মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা কোন ন্যায়বিচার হল? একের অপরাধে অন্যকে হত্যা করা কি ইসলামী রীতি? ওরা ইরাক-আফগানিস্তানে নির্বিচারে মানুষ মারছে বলে আমরাও নির্বিচারে মানুষ মারব এটাই যদি যুক্তি হয় তাহলে ওদের আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য রইল কি?

কারো আদর্শকে সহ্য করতে না পারলে সাধারণত তার বিরুদ্ধে ব্যক্তি আক্রমণ করা হয়। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কাতে যা প্রচার করতেন – এক আল্লাহর ইবাদাত করা, দরিদ্রদের প্রাপ্য দেয়া, মেয়ে শিশুদের হত্যা না করা, ইয়াতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ না করা – এসবের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে তাকেপাগল বলা হত, মিথ্যাবাদী বলা হত, কবি বলা হত। যে মানুষটিকে তারা এতদিন আল-আমীন বলে ডাকত হঠাৎ তিনি মিথ্যা বলা শুরু করলেন? যে পাগল সেকি ছন্দ মিলিয়ে কবিতা বানাতে পারে? তাদের এই ব্যক্তি আক্রমণের পরস্পর বিরোধীতা থেকে বোঝা যায় যে ব্যক্তি আক্রমণ কত ঠুনকো।

আদর্শের মোকাবেলায় যারা ব্যক্তিকে অপবাদ দিয়ে খাটো করার চেষ্টা করে তারা কাপুরুষ। কোন যুক্তিবাদী মানুষ যদি ইসলামের আদর্শের বিরুদ্ধে যৌক্তিক কিছু বলত – আমরা পালটা যুক্তিদিতাম। কিন্তু মিথ্যা কথার প্রতিবাদ কি যুক্তি দিয়ে করা যায়? এর প্রতিবাদ হচ্ছে এমন সবকিছুকে অবজ্ঞা করা আর সত্যটা মানুষের সামনে তুলে ধরা – ইতিহাস থেকে প্রমাণসহ। যে মানুষের মধ্যে ন্যূনতম সৌজন্যতাবোধ আছে সে সত্য মানুক আর না মানুক, সত্য থেকে মিথ্যাটাকে আলাদা করতে পারে। আমরা খালি মানুষকে ধমকই দিয়ে যাব – ‘‘এই মিথ্যা কথা বলবানা’’, কিন্তু সত্যটা কি সেটা না বলে চুপ করে থাকব – এটা কি শোভনীয়?

সমস্যা হচ্ছে আমরা সত্যটা বলব কিভাবে? বলতে হলে তো জানতে হবে। আর জানার ব্যাপারেই আমাদের যত আপত্তি। যারা রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষার্থে রাস্তায় এসে বিক্ষোভ করছেন তাদের ক’জন তার জীবনকথা পড়েছেন? এদের মাহফিল তো ভর্তি থাকে নাম-না-জানা ওলীদের বানোয়াট কেচ্ছায়। এদের ওয়াজে নাবী

22 সুরা আল মায়িদা ৫:৮

কিকরেছেন, কি করতে বলেছেন সেগুলো শুনিনি বললেই চলে। এমনকি রসুল নিজে যে দরুদ শিখিয়ে গেছেন সেই দরুদ বাদ দিয়ে হুজুরদের 'বালাগাল উলাবি কামালিহি' পড়তে শোনা যায়। আর যখনই শ্রোতাদের মধ্যে ঘুম ঘুম ভাব দেখা যায় তখনই তাদের কোরাসে দরুদ গাইতে লাগিয়ে দেয়া হয়। একজন মুসলিমের জন্য রসুলের শিক্ষাকে উপেক্ষাকরার চাইতে আর বেশী কি অবমাননাকর হতে পারে?

আমরা যারা অন্তর্জাল উত্তপ্ত করছি তারা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন করি, আমি আমার নাবী সম্পর্কে কতটুকু জানি? আমরা কি তার সব স্ত্রীর নাম জানি যাদের তিনি 'আমাদের মা – উম্মুল মু'মিনিন' হিসেবে সম্মানিত করেছেন? তার সাহাবাদের ক'জনের নাম আমরা জানি? নিজেই নিজের পরীক্ষা নেই। ক'জন ক্রিকেটার, ফুটবলার আর মুভিস্টারের নাম জানি সেটাও একটা কাগজে লিখে ফেলি। এরপর দু'টো তালিকা মিলিয়ে রসুলের প্রতি ভালবাসার দাবীর সত্যতাটা বিচার করি।

রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুসলিমের রক্ত এবং সম্পদ অন্য মুসলিমের জন্য হারাম করেছেন। ঢাকায় বাস ভাংচুর করে, পাকিস্তানে দোকান লুট করে, লিবিয়ায় মানুষ খুন করে বিক্ষোভকারীরা রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সম্মান রক্ষা করল? যিনি আমাদের শিক্ষা দিলেন –

> দু'জন মানুষের মাঝে ইনসাফ দেয়া হচ্ছে সাদকাহ্, কোন আরোহীকে তার বাহনের উপর আরোহন করতে বা তার উপর বোঝা উঠাতে সাহায্য করা হচ্ছে সাদকাহ্,ভাল কথা হচ্ছে সাদকাহ্, সালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ হচ্ছে সাদকাহ্ এবং কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরানো হচ্ছে সাদকাহ্।[23]

সেখানে আমরা কোটি মানুষকে কাজ করতে না দিয়ে বেইনসাফি করলাম। যান-বাহন চলাচল বন্ধ করে, মাঠে-ঘাটে চিৎকার করে, রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা দিয়ে – হরতাল করলাম। এই জন্যই বোধহয় কিয়ামাতের দিন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর

23 সহীহ বুখারী ২৯৮৯, সহীহ মুসলিম ১০০৯

কাছে অনুযোগ করবেন যে তার উম্মাত কুরানকে, কুরানের শিক্ষাকে পরিত্যাগ করেছিল।[24] রসুলের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে আমরা তার সুন্নাহকে অপাংক্তেয় করে ফেলেছি।

পাকিস্তানে যে মানুষগুলো বিক্ষোভ করতে গিয়ে জীবন দিল তাদের যদি প্রশ্ন করা হয় কেন জীবন দিলে – তার হয়ত বলবে রসুলকে ভালোবেসে। কিন্তু যদি প্রশ্ন তোলা হয় রসুল কি আসলেই তার উম্মাতকে এভাবে জীবন দিতে বলেছিলেন তাহলে তার উত্তর কিহবে? আল্লাহর দেয়া জীবন কি এতই ফেলনা? অপাত্রে, অস্থানে জীবন অপচয় করা এমনই ভুল যার প্রায়শ্চিত্ত করার কোন সুযোগ থাকেনা। জীবন দেয়ার আগে জেনে তো নেই কিসের জন্য জীবন দিচ্ছি!

ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে একটা বড় দিক হচ্ছে এর ভারসাম্যতা। ইসলামে ক্ষমা যেমন আছে তেমন শাস্তিও আছে। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন তায়েফবাসীকে ক্ষমা করেছিলেন তেমনি তিনি মদীনাতে কাব ইবন আশরাফ এবং আবু রাফে’কে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। এ দু’জনেরই অপরাধ ছিল তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কবিতা লিখত। কবিতা লেখার অপরাধে মৃত্যুদন্ড – এটা আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু মনে রাখতে হবে তখনকার কবিতা আজকের মত আজিজ মার্কেটে বিক্রয়যোগ্য পণ্য ছিলনা। তখন কবিতাই ছিল মুভি, কবিতাই ছিল টিভি, কবিতাই ছিল গণমাধ্যম তথা প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার। কবিতার প্রোপাগান্ডাতে দিনকে রাত করা হত, সত্যকে মিথ্যা। দূর-দূরান্তের মানুষের মনে ইসলামের সত্য দিকটার বদলে একটা মিথ্যা বিদ্বেষ দিয়ে বুক ভার করে ফেলা হত কবিতা দিয়ে।

এই ইন্টারনেটের যুগেও প্রোপাগান্ডাকে কতটা শক্তিশালী ধরা হয় তার প্রমাণ আমরা পাই আল-কায়েদাকে কেন্দ্র করে ডেপুটি এটর্নি জেনারেল পল ম্যাকনাল্টির বক্তব্য থেকে –

> They want to demoralize us. That’s why propaganda is so important to them, and why facilitating that propaganda issuch an egregious crime.

24 সুরা আল ফুরকান ২৫:৩০

ইমাম আনওয়ার আল আওলাকিকে ইয়েমেনে ড্রোন হামলা চালিয়ে হত্যা করার পিছনে আমেরিকানদের এই যুক্তিই ছিল যে তিনি ইংরেজি ভাষাভাষীদের মধ্যে আল কায়েদার প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন। মদীনার ইহুদিদের সাথে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি ছিল যে তারা মুসলিমদের কোন ক্ষতি করবেনা এবং তার বদলে মুসলিমরা তাদের নিরাপত্তা দেবে। কিন্তু যখন কাব ইবন আশরাফ কিংবা আবু রাফে' সেই চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে থাকল তখন তাদের হত্যার আদেশ দেয়া হল। এই হত্যাদুটো ছিল গুপ্তহত্যা যাতে একজনের অপরাধে পুরো গোত্রটিকে যুদ্ধে জড়াতে না হয়। উল্লেখ্য এ হত্যাকান্ডের আদেশ দিয়েছিলেন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি ছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক। তিনি এরপরে এই হত্যার দায়িত্বই শুধু নেননি, কেনএ হত্যার আদেশ দেয়া হয়েছিল সেটা তিনি ইহুদিদের ব্যাখ্যা করেছিলেন।[25]

একইভাবে একজন অন্ধ সাহাবার মুক্ত করে দেয়া দাসী, উম্ম ওয়ালাদ, যখন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান করে কথা বলত, বারবার সাবধান করার পরেও ক্ষান্ত হতনা, তখন সেই সাহাবা সেই দাসীকে হত্যা করেন। ইহুদিরা এর বিচার চাইতে গেলে সাহাবা যখন দায় স্বীকার করে কারণ বর্ণনা করেন তখন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হত্যা বৈধ বলে রায় দেন।[26]

রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো মক্কাবাসীর মধ্যে কেবল ছ'জনকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন।[27] মাফ করেদেয়া অনেকেই বদর আর উহুদে সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যাদের হত্যার আদেশ দেয়া হয়েছিল এরা যুক্ত ছিল নানান ধরণের প্রোপাগান্ডার কাজে, ইসলাম ও মুসলিমদের হেয় করার কাজে।

ইসলামী শরিয়া প্রবর্তন পাঁচটি বিষয় রক্ষা করতে - মানুষের দ্বীন, জীবন, সম্মান, সম্পদ এবং বিবেকবোধ। একজন নারীর নামে যদি কেউ ব্যাভিচারের অভিযোগ আনে কিন্তু চারজন চাক্ষুস সাক্ষী না আনতে পারে তবে সেই অভিযোগকারীর শাস্তি হবে আশিটি বেত্রাঘাত; নারীটি সত্যি ব্যভিচার করে থাকলেও। যেখানে সাধারণ মানুষের সম্মানের ক্ষেত্রে ইসলাম

25 সীরাতে ইবনে হিশাম
26 সিলসিলায়ে সাহীহা, আবু দাউদ
27 সিলসিলায়ে সাহীহা আবু দাউদ ২৩৩৪

এত সজাগ সেখানে শেষ নাবী ও রসুলের সম্মান রক্ষার্থে আইনটি যে অনেক কড়া হবে তা বলাই বাহুল্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তার “আশ-শারিম আল মাসলুল ‘আলা শাতিম আর-রসুল” বইটিতে বিভিন্ন দলিলসহ প্রমাণ করেছেন যে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা অপবাদ/কটাক্ষ/অবমাননার চেষ্টার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ এবং রিসালাত। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মানে ইসলামিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। এই অপরাধটাকে ইংরেজিতে বলে ‘হাই ট্রিজন’।' দু’শ বছর আগেও ব্রিটিশ আইনে এই অন্যায়ের শাস্তি ছিল - hanged, drawn and quartered; অর্থাৎ ঘোড়াতে ছেঁচড়ে শহরের মধ্যেখানে এনে মৃতপ্রায় অবস্থা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা, পুরুষাঙ্গ কেটে, পেট থেকে নাড়ী-ভূড়ি বের করে, মাথা কেটে, সারা শরীর চার টুকরো করে লন্ডন ব্রিজে ঝুলিয়ে রাখা।[28] অপরাধী যদি নারী হত তাহলে অবশ্য তাদের প্রতি অনেক রহমত করা হত, জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হত। আমাদের সৌভাগ্য যে ইসলামী শরীয়তে ব্রিটিশ ভদ্রতা নেই।

ইসলামী শরীয়তের হিসাবটা অনেক সোজা, তোমাকে জোর করে মুসলিম হতে হবেনা; জিযিয়া দাও – নিরাপত্তা পাবে। মুনাফিক হও, জিযিয়া দেয়া লাগবেনা। তোমার মনে যত ইসলাম বিরোধীতা থাক – প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারবেনা। মত প্রকাশের স্বাধীনতা পৃথিবীর কোথাও নেই, আমেরিকাতে এক বছর থেকে সেটা চাক্ষুস দেখে এসেছি। জুলিয়ান আসাঞ্জের হেনস্তা চোখে লেগে আছে, তারেক মেহান্না এখনও সলিটারি কনফাইনমেন্ট থেকে বেরোতে পারেননি। ইসলামে গণতন্ত্রের মত দ্বিমুখীতা নেই – যেটা করা যাবেনা সেটা স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে। সীমালঙ্ঘনের শাস্তিও বলা আছে।

ইসলামের ক্ষেত্রে যদি আমরা আইন নেই কিন্তু আইনের প্রেক্ষাপট বাদ দেই তাহলে মহা মুশকিল। হুদুদ শাস্তি কায়িমের জন্য ইসলামিক আইনের শাসন থাকা আবশ্যক। শাসক না থাকলে অপমানকারীদের হত্যাকারীকে নিরাপত্তা কে দেবে যেটা রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবাকে দিয়েছিলেন? এ জন্য মক্কায় যখন শাসন ক্ষমতা ছিলনা তখন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব অত্যাচার অপমান সহ্য করেও মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, দ্বীন শিখিয়েছেন। তের বছর প্রচেষ্টার পরেও যারা সেই

28 The Treason Act 1814 Chapter 54 Geo. III c. 146

দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে তাদের তিনি মৃত্যুদন্ড দিতে পারেন। কিন্তু যারা একজন অমুসলিমকেও ইসলামের কথা বলতে পারেনি, তারা যখন মৃত্যুদন্ডের দাবীতে রাস্তায় নামে তখন হাসিই আসে। কার্টুনিস্টের মৃত্যুদন্ড কে দেবে? তাগুতী আইন? তাগুতের ক্ষমতা আছে বলে পাকিস্তানে এসে উসামা বিন লাদিনকে মেরে গেছে, লাশ নিয়ে চলে গেছে। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। আর আমাদের দৌড় পতাকা আর পুতুল পোড়ানো অবধি। আমাদের অসভ্য আচরণ দিয়ে সত্যি সত্যি 'ইনোসেন্স অফ মুসলিম' নামকরণ সার্থক করে ফেলেছি।

খিলাফাত ব্যাতিরেকে গুপ্তহত্যা যে কল্যাণ বয়ে আনেনা তার প্রমাণভুরি ভুরি। এক হুমায়ুন আজাদের শত সন্তান এখন বাংলা ব্লগ বিচরণ করে চলছে – প্রতিনিয়ত আল্লাহ এবং তার রসুলকে অবমাননার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'সাবমিশন' চলচ্চিত্রের নির্মাতা থিও ভ্যান গঘকে মুহাম্মদ বুয়েরি হত্যা করে আজীবন কারারুদ্ধ হলেন। ইসলামকে অপমান করেও এখন থিও ভ্যান গঘ অমর বীর। চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্যের লেখিকা আয়ান হিরসি আলিকে আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউটে ফেলো হিসেবে নিয়োগ দেয়া হল। এখন কিভাবে ইসলামের ক্ষতি করা যায় সেটা নিয়ে নিশ্চিন্তে গবেষণা কর। কাজের কাজ কি হল? শুধু ২০০৫ সালেই নেদারল্যান্ডে বিভিন্ন মসজিদ এবং ইসলামিক স্কুল হামলার শিকার হল ৩১ বার।

আমাদের মুসলিমদের একটি জিনিস বুঝে নেওয়া দরকার। কে কার সম্পর্কে কি ভাববে সেটার উপরে আমাদের কোন হাত নেই। জোর করে সুধারণা সৃষ্টি করা যায়না। যারা রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জানেনা তাদের যা বলা হবে তারা তেমনই ধারণা পাবে। আর ধারণা পাবে যারা কথাগুলো বলছে তাদের কীর্তিকলাপ দেখে। আমাদের মুসলিমদের কাজ দেখে কি আমাদের শিক্ষক সম্পর্কে ভাল ধারণা পাবার কোন উপায় আছে? আমেরিকা-ইউরোপের কথা বাদ দেই, এই বাংলাদেশে,লালমনিরহাটের অজগাঁয়ে, কানের মোবাইলের ইয়ারফোনে গান শুনতে থাকা মুসলিম তরুণকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাদের রসুলের নাম কি? সে বলতে পারেনি। আমি কোন মুক্তমনার কথা বলছি না, একটা চাষার ছেলের কথা বলছি। আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

আমাদের যখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন রসুলকে ভালোবাসার দাবীর প্রমাণে কি করেছি তখন কি উত্তর দেব? রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের একটি দিনের

২৪ ঘন্টা মিলিয়ে দেখি – কয়টি মুহূর্ত মেলে? তার আদর্শ শিখি, তার চরিত্র, তার ভদ্রতা, তার কর্মপন্থা নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করি। একটু মানার চেষ্টা করি। এরপরে সেগুলো মানুষকে জানাই। যতটা সম্ভব জানাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠমানুষ মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ রহমাতুললিল মুসলিমিন নয়, রহমাতুললিল 'আলামীন করে পাঠিয়েছেন। তিনি কেন এবং কিভাবে সমগ্র সৃষ্টির জন্য দয়া এটা নিজে জানা এবং মানুষকে জানানোর ভার আমাদের। আল্লাহ যেন আমাদের এ দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেন। আমিন।

৯ যুল ক্বাদা, ১৪৩৩ হিজরি।

খাদ্য ও ক্ষুধা

২০০৫ সালের কথা। দীপালিদের বাসায় নিয়ম ছিল যে সে খাবে রাতের ভাত, আর দুপুরে খাবে তার ভাই। এই নিয়মের পিছনে জিরো ফিগারের বাসনা না - ছিল তার বাবার চাল কেনার অক্ষমতা। একদিন সন্ধ্যায় দীপালীর ভাই এমনই ক্ষুধার্ত ছিল যে সে তার বোনের রাতের ভাগটুকু খেয়ে নেয়। প্রায় ২৪ ঘন্টার অভুক্ত দীপালি যখন দেখে তার ভাত তার আপন ভাই চুরি করেছে তখন অভিমানে তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। আর কোনদিন যেন বাবা-মার কাছে ভাত না চাইতে হয়, তাই সে কন্ঠে কাপড় জড়িয়ে ঝুলে পড়ে। জীবনের মত সে তার ভাগের ভাতটা ভাইকে দিয়ে যায়।

আমরা জানি আত্মহত্যা মহাপাপ। তবে আমরা এটা জানিনা যে আজ রাতে আমাদের হাঁড়ি ধোয়ার সময় যে ভাতগুলো ফেলে দেয়া হবে তাতে দীপালির ভাগ ছিল। যতই জনসংখ্যা বাড়ুক, এই দুনিয়াতে আল্লাহ যত মুখ সৃষ্টি করেছেন তাদের সবার খাবারের ভাগও তিনি রেখেছেন। যখন কেউ কারো মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় তখন মানুষ অনাহারে আত্মহত্যা করে। গরীব মানুষের মুখের গ্রাস শুধু মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো একা কেড়ে নেয়না, আমরাও নিই।

রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন তোমরা বেশী খেওনা। যদি খাও তবে অপর ভাইয়ের ভাগ খেয়ে ফেলতে পার। আমরা শুধুই যে বেশী খাই তা নয়, বেশী খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে উচ্ছিষ্টাংশটি ডাস্টবিনের কুকুরদের সমর্পণ করি। চারপেয়ে এবং দু’পেয়ে কুকুর।

বাংলাদেশে বিয়ে বাড়িতে মোচ্ছব চলে প্লেটভর্তিকরার। পিজা হাট অফার দেয় – এস কত খেতে পার। সিয়াম মানে সংযম কে বলেছে? সিয়াম মানে রাক্ষসের মত খাওয়া, যত বেশী খাওয়া যাবে ততই লাভ। সারা বছরে মাত্র একবার পিজা হাট ইসলামের শিক্ষাকে বুড়ো আঙুল দেখায় – সেটা রমাদান মাসে। সিয়াম মানে সংযম কে বলেছে? যিনি দশ পদের কমে ইফতার করেননা তিনি?

আমেরিকায় দেখেছি মসজিদ মসজিদে মুফতে ইফতার দেয়। মানুষ ডিসপোজ্যাবল প্লেট ভরে খাবার নেয়, কিছুটা খায়, কিছুটা ছড়ায় তারপরে প্লেট ভাজ করে ট্র্যাশে ফেলে দেয়। বিরিয়ানি ভর্তি প্লেট। রুটি-মাংশ ভর্তি প্লেট। নাশপাতি-আঙুর-খেজুর ভর্তি প্লেট। বাবা-ছেলে পাশাপাশি বসে একই কাজ করে। ফেলে দেয়ার আগে একটুও হাত কাঁপেনা। মাথায় একটুও আসেনাযে সোমালিয়াতে সেই মূহুর্তে মানুষ ইফতার করছে শুধু বাতাস দিয়ে। সৌদি আলিমদের কাছে ফতোয়া জানতে চাচ্ছে – তাদের সেহরিতে খাবার কিছু নেই, ইফতারেও কিছু জোটেনা; তাদের রোজা হবে তো?

সৌদি মুফতি উত্তর দিতে পারেননি, ঝরঝর করে কেঁদেছেন। আমরা কেউ প্রশ্নটাশুনতে পাইনি। আমরা তখন খেতে ব্যস্ত ছিলাম।

পৃথিবী কত বদলে যায়। এইতো বছর পঞ্চাশেক আগেও সোমালিয়াকে বলা হতআফ্রিকার রুটির ঝুড়ি। সেই সবুজ আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে গরু-ছাগলের পাল। মানুষের পাল এখন খোঁয়ারে থাকে। আইএমএফ দয়া আর মমতার বাঁধনে বেঁধে রেখেছে ওদের। ভালবেসে ঋণ দিয়েছে। তারপর বাতলে দিয়েছে ঋণ শোধের উপায়। এই বাঁধন কি আর ছেড়া যায়? বিজ্ঞানীরা বলবেন ক্লাইমেট চেঞ্জ – জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণেই নাকি এ দুর্ভিক্ষ। পশ্চিমা মিডিয়া বলবে আল-শাবাব মুসলিম চরমপন্থীদের জন্যই আজ এই দশা। খিলাফাতওয়ালারা বলবে তাগুতের তাবেদার সরকারের দোষ।

আমি কিছু বলবনা। আমার চোখে ভাসতে থাকবে বিশাল সব ট্র্যাশব্যাগ। কালো কালো ট্র্যাশব্যাগ। একটা ব্যাগে যে পরিমাণ খাবার ফেলে দেয়া হয়েছে তাতে একটা গ্রামের সবগুলো ক্ষুধার্ত মানুষ পেটপুরে খেতে পারত।

শস্য-শ্যামলা-সুজলা বাংলাদেশে এখন জল নেই। আমনের মৌসুমে যেখানে খেত জলে থই থই করে সেখানে এখন পাম্প বসিয়ে সেচ দিতে হয়। ডীপ টিউবওয়েল। পানির স্তর নেমে গেছে বহু দূর, আশি ফুট গভীরতাতেও কাজ চলে না। আমেরিকায় চলছে পঞ্চাশ বছরের সবচে ভয়াবহ খরা। তবু আমাদের বুক কাঁপেনা। ভাবখানা এমন যেন আল্লাহর সাথে পানিচুক্তি করা আছে। অথচ আল্লাহ বলছেন নেই। মহান আল্লাহ হুমকি দিলেন সুরা মুলকের শেষে – তিনি যদি পানির স্তর নামিয়ে নেন তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে কে দেবে পানি?

আমরা এই হুমকির থোড়াই কেয়ার করি।

আল্লাহ আল কুরানের দুই জায়গাতে বলেছেন, তোমরা অপচয় করোনা, আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেননা। আমরা আল্লাহর ভালোবাসার থোড়াইকেয়ার করি। নানান জাতের ভালোবাসাতে ভর্তি হয়ে আছে টিভি। আল্লাহর ভালোবাসা না দেখা যায়, না বেচা যায়। এ ভালোবাসা দিয়ে কি করব?

রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কারো কাছ থেকে মাটিতে খাবার পড়ে গেলে সে যেন সেটা তুলে, ধুলোটা ঝেড়ে খেয়ে ফেলে; শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। তিনি খাবার পরে হাত চেটেখেতে বলেছেন, কারণ খাবারের কোন অংশে বারাকাহ আছে সেটা মানুষ জানেনা।[29] আমাদের যে টেবল ভদ্রতা শেখান হয় তাতে পতিত খাবার অচ্ছুত ময়লা, তুলে খাওয়া তো দূরে থাক সেটা স্পর্শই করা যাবেনা। কাজের মানুষেরা পরে ঝাড়ু দিয়ে সেটা ফেলে দেবে। হাতের আঙুল বা থালা মুছে খাওয়া তো নিতান্ত অসৌজন্যতা। ইহুদিরা জেরুজালেমে মুসলিমদের হারিয়ে দিয়েছে বলে আমরা হায় হায় করি। আর এদিকে আমরা নিজেরা নিজেদের ডাইনিং টেবলে ইসলামকে হারিয়ে দিয়েছি। শয়তান এখন আর আমাদের শত্রু না – বন্ধু। তাকে আসন পেতে দেই খেতে। পেট ভরার পরে বাকি খাবারটা তার জন্য বরাদ্দ করে রাখি। আর বারাকাহ দিয়ে আমরা কি করব? বারাকাহ কমছে বলেই খাবারে বিষ দেয়া হচ্ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে খাবারের দাম বাড়ছে, খাবারের স্বাদ-তৃপ্তি সব উধাও হয়ে যাচ্ছে। আপন হাতে কল্যাণের দরজা বন্ধ করে রেখে অন্যকে দুষে কি লাভ?

ইসলামের কথা বাদ দেই, খাবার নষ্ট মানে তো কৃষককে অপমান করা। তার শ্রম, তার কষ্টটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। আমরা শহুরে মানুষ; একগোছা ধান ফলাতে কি কষ্ট আমরা কি করে বুঝব? আমাদের কাছে পাতে ফেলে রাখা এক মুঠ ভাতের দাম কয়েক পয়সা মাত্র – এর চেয়ে বেশী কিছু তো নয়। রান্না করা খাবার ফেলে দেয়া মানে সেই মানুষটার প্রতি অশ্রদ্ধা যে কষ্ট করে খাবারটা রান্না করল চুলার আঁচ সহ্য করে। সেই মানুষটার প্রতি অসম্মান যে কষ্ট করে খাবারটা বয়ে নিয়েআসল বাজার থেকে। আমরা বুদ্ধিজীবি মানুষ। কাজের

29 সহীহ মুসলিম অধ্যায় ২৩ হাদিস ৫০৪৪

মানুষদের সময় আর শ্রম কিনে নিয়েছি কয়েক টাকায়। টাকা দিয়ে সব কিছু শোধ করা যায়না – এটা আমরা বুঝতে চাইনা।

পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ ছিলেন রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম। মদিনাতে হিজরত করার পরথেকে তার মৃত্যু অবধি তার পরিবার পরপর তিনদিন পেটপুরে খেতে পারেনি।[30] সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মানুষদের এমন সময়ের মধ্যে যেতে হয়েছে যখন হাবালা গাছের পাতা ছাড়া তাদের আর কোন খাবার ছিলনা। তাদের মল আর ভেড়ার মলের কোন পার্থক্য ছিলনা।[31] আমাদের আল্লাহ খাবারের যে প্রাচুর্য দিয়েছেন সেটাকে আল্লাহর নিয়ামাত বলে আমরা ভাবতে ভালবাসি; ভুলেও চিন্তা করিনা এটা আল্লাহর পরীক্ষাও বটে। আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে খাবার নষ্টের মাধ্যমে আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা করছি। শাস্তি হিসেবে ক্ষুধাকে চেয়ে নিচ্ছি।

ভাই, আপনি যদি কুরানকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে এরপর যখন আপনি থালায় একটিও ভাত রেখে উঠে যাবেন তখন মনে রেখেন – ইন্নাহু লা ইয়ুহিব্বুল মুসরিফিন – নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেননা। বোন, আপনি যখন আপনার সন্তানের উচ্ছিষ্ট খাবারটি ফেলে দিচ্ছেন তখন মনে রেখেন - ইন্নাহু লা ইয়ুহিব্বুল মুসরিফিন। বেগুনের এক কোণে একটু দাগ থাকার কারণে যখন পুরোটা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন তখন মনে রেখেন - ইন্নাহু লা ইয়ুহিব্বুল মুসরিফিন।

পৃথিবীর মানুষের ভালবাসা না পেলেও জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়; পৃথিবীর রব্ব আল্লাহর ভালবাসা না পেলে ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ যেন আমাদের মুসরিফিন হবার হাত থেকে রক্ষা করেন। খাবার নষ্ট করা যাবেনা এটা যেন আল্লাহ আমাদের মননে-জীবনে গেঁথে দেন।

২৫ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরি।

30 সহীহ বুখারি অধ্যায় ৬৫ হাদিস ৩২৭৩
31 সহীহ বুখারি অধ্যায় ৬৫ হাদিস ৩২৩

প্রস্থান পত্র

জবুথুবু হয়ে শুয়ে ছিলাম, ছোট্ট একটা ছেলের কথার খইয়ে ঘুম ভাঙল। নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমট্র্যাকের ৩০ ক্যাপিটল লিমিটেডের ট্রেনে। সকালে ফজরের সলাত শেষে দেখেছিলাম পিটসবার্গ পার হচ্ছি। এখন নাম না জানা কোন এক জঙ্গলে বসে আছি, সামনে রেললাইনের কি যেন সমস্যা হয়েছে, আধ ঘন্টা বসে থাকতে হবে। আমেরিকাতে সাধারণত কেউ রেলে চাপেনা। আমি ভাবলাম জাহাজ, প্লেন সবই যখন চড়া হল তাহলে আর দোতলা এসি ট্রেন বাদ থাকবে কেন। এতে অবশ্য আমার ঘনিষ্ঠকিছু মানুষেরা আপত্তি করবে, তাদের মতে আমি টাকা বাঁচানোর জন্য এ কাজ করেছি। আমি টাকা বাঁচানোর চেষ্টা করি কথাটা নেহায়েত মিথ্যা না, কিন্তু আজ সকালে যে অসাধারণ কিছু দৃশ্য দেখেছি, উড়ে আসলে কি সেগুলো দেখতে পেতাম? আমার ঘনিষ্ঠ মানুষেরা এ ব্যাপারগুলো বোঝেনা, তারা খামোকাই আমাকে কিপটা বলে খোঁচাখুঁচি করে। এ তালিকায় শেষ যুক্ত হয়েছে সুদীপ্ত। সুদীপ্ত শরীফ।

আসার সময় যখন ব্যাগ গুছাচ্ছি, তখন ছেলেটা পাগলের মত যা পাচ্ছে সেটাই ব্যাগে ভরে দিচ্ছে। আমার সুপারভাইজর মুস্তাফা স্যার ওকে শনপাপড়ি খেতে দিয়েছিলেন – সেটাও সে আমার সুটক্যাসে ভরে দিল। বললাম, ভাইয়া আমি শনপাপড়ি খাইনা। উত্তর দিল, আপনি খান না তো ভাল – ভাবী খাবে। স্যার বললেন, মানুষ বাংলাদেশ থেকে শনপাপড়ি কিনে আমেরিকাতে আনে। সুদীপ্ত নির্লিপ্তমুখে বলল, শরীফ ভাই জীবনে কিনবে? এ ধরণের কথা বলতে হলে মানুষের কাছে আসতে হয়। সব মানুষ কাছে আসেনা। মানুষের কাছে আসার গুণটা সবার থাকেনা। আসার আগে যখন ছেলেটা হঠাত করে বলে ফেলল, “শরীফ ভাই, আপনি মনে করিয়েননা যে আপনি চলে যাচ্ছেন বলে আমি কাঁদব”; তখন ধাক্কা খেলাম। আমি খুব কাট্টাখোট্টা, হিসেবী মানুষ – আবেগ থেকে যথাসাধ্য দূরে থাকি। এ ধরণের কথার কোন আসর আমার উপরে পড়ার কথা না, কিন্তু এবার কেন যেন পড়ল।

কোন একদিন রাত এগারোটায় সুদীপ্তের বাসায় ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম ইশার নামায পড়েছ? বলল – ওয়াক্ত তো মাত্র হল। আমি বললাম – আমার জন্য অপেক্ষা কর, একসাথে পড়ব। এগারোজ জেল রান শেষে ইউভি রশ্মিতে ছবি তুলে আবিষ্কার করলাম – কিচ্ছু নেই। তার মানে এবারও আরটি পিসিআর (Reverse transcriptase polymerase chain

reaction, কোন নির্দিষ্ট একটি আরএনএ অণুর উপস্থিতি বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়) কাজ করেনি। হতাশ মনে সাইকেল চালিয়ে গেলাম ওর বাসায় গিয়ে পৌছাতে পৌছাতে রাত একটা। সলাত শেষে ছেলেটা ভাত বেড়ে দিল, তরকারী গরম করে দিল। দু'জন একসাথে খেয়ে নিলাম। এ ধরণের ঘটনা বহুবার ঘটেছে। রিসার্চের শেষদিকে যখন দিন-রাত এক করে ফেলেছি তখন আল্লাহর রহমতে সুদীপ্তের কল্যাণে ঘরে রান্না নেই বলে চিন্তা করতে হয়নি। আমার একা একা খেতে খুব খারাপ লাগে। সুদীপ্ত প্রথম প্রথম বাংলাদেশ থেকে আসার পরে ওকে রান্না শেখানোর উসিলায় প্রায়ই আমি ডাইনিং টেবলের সঙ্গী জুটিয়ে নিতাম। খাওয়ার পরে চলত আলোচনা – ট্রানজিশন ধাতুগুলো কেন একেকসময় একেক রঙ দেখায়, উপমহাদেশ আর আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি, বার্মাতে রোহিঙ্গাদের গণহত্যা… আর কথা চলত ইসলাম নিয়ে। আমি শিক্ষক মানুষ, ছাত্র পেলে খুশী হই। যখন দেখি আমার কথা শুনে কারো ইসলামের প্রতি আগ্রহ এসেছে, সে ইসলাম কি সেটা জানতে, বুঝতে চেষ্টা করছে, মানার চেষ্টা করছে – তখন আমার আনন্দ ধরেনা।

কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা একে অপরের পড়শী। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাই তার প্রতি ভালোবাসার জন্ম দেয়। যেসব মানুষের মধ্যে ন্যুনতম সৌজন্যতাবোধ অবশিষ্ট রয়ে গেছে তারা উপকৃত হলে প্রত্যুত্তরে অন্য কিছু না দিতে পারলেও মনে মনে উপকারীকে ভালবাসে। কিন্তু আমাদের মুসলিমদের জন্য ভালবাসার সংজ্ঞাটা একটু অন্যরকম। আমরা যারা আল্লাহকে ভালবাসি, তারা শুধু আল্লাহকে ভালবাসার কারণে একে অপরকেও ভালবাসে। এই ভালবাসা এমন একটা ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে দেয় যেটা অনেক সময় রক্তের ভ্রাতৃত্ববোধের থেকেও বড় হয়ে যায়। ইসলামের প্রাথমিকযুগের মুহাজিররা ঘর-বাড়ী-সহায়-সম্পদ ছেড়ে যখন মদিনাতে হিজরত করেছিলেন তখন আনসার সাহাবারা নিজেদের দু'টো ঘরের একটা ঘর কিংবা খেজুর বাগানের অর্ধেক দিয়ে তাদের সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসার সুবিধেই হল এটা যে এর প্রতিদান আমরা আল্লাহর কাছে চাই বিধায় এই ভালবাসাটা কখনও ব্যর্থ হয়না। একজন মুসলিমকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা মানে আল্লাহর আনুগত্যে একে অপরকে সাহায্য করা, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে একে অপরকে সচেতন রাখা।

বাংলাদেশ থেকে আসার পর সবচেয়ে বেশী যে ব্যাপারটা কষ্ট দিত তা হল মসজিদে জামাতে সলাত না আদায় করতে পারা। এক বছরের জন্য জামাতে ২৭গুণ সাওয়াবের বদলে বিদেশে উচ্চশিক্ষাটাকে যে আমি বেছে নিয়েছি সেটা মনে একটা ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। প্রায়ই মনে হত দ্বীন আর দুনিয়া – এ দুটোর মধ্যে আমি দুনিয়াকে বেছে নিয়েছি। তাই এখানে কারো সাথে জামাতে সলাত আদায় করতে পারলে সেই ক্ষতের কিছুটা উপশম হত।

আমি সুদীপ্তের কাছে কৃতজ্ঞ – আমার একাকীত্বে সঙ্গ দেবার জন্য, তার রিযক আমার সাথে ভাগ করার জন্য, বাসা ছেড়ে দেয়ার পর আমাকে থাকতে দেবার জন্য, মানুষের মধ্যে যে সারল্য হারিয়ে যায়নি সেটা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু কৃতজ্ঞতার লম্বা তালিকার কাজগুলো কোন কিছুই যদি সে না করত, তাও আমি তাকে ভালবাসতাম। সে ভালোবাসার পিছনে একটা কারণই যথেষ্ট। সে আমাকে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে সাহায্য করেছে, সে আমার সাথে জামাতে সলাত পড়েছে। আল মিক্বদাম বিন মা'দি আল কারিব থেকে বর্ণিত যে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার ভাইকে ভালবাসে সে যেন তাকে জানিয়ে দেয়।"[32]

আমার এই লেখাটা সুদীপ্তকে জানানোর জন্য যে – আনা উহিব্বুক ফিল্লাহ। আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি। আল্লাহ যেন তোমার বুকটা তার দ্বীন বোঝার মত প্রশস্ত করে দেন। তিনি যেন তোমাকে ইহকাল এবং পরকালে সাফল্য দান করেন।

আর আমার মত অধমকে যদি কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবেসে থাকে তার জন্য দু'আ – আহাব্বাকাল্লাযি আহবাবতানি লাহু, যার উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে ভালবাস, তিনি যেন তোমাকে ভালবাসেন।[33] এই পৃথিবীতে আল্লাহর ভালবাসার চাইতে বড় পাওয়া আর কি আছে।

২২ রমাদান, ১৪৩৩ হিজরি।

32 সুনানে তিরমিযি, হাদিসটি হাসান সহীহ

33 আবু দাউদ ৪/৩৩৩

উপবাসী কথা

আরভি পেলিক্যানে বসে আছি। এটা একটা গবেষণা জাহাজ, গালফ অফ মেক্সিকোতে পানি দূষণের কারণে সৃষ্ট অক্সিজেন স্বল্পতা কিভাবে বিভিন্ন জলজ প্রাণীকে প্রভাবিত করছে সেটা নিয়ে গবেষণা চলছে। আকারে ছোট বলে থাকার ব্যবস্থা বাঙ্কে, তবে খাওয়ার ব্যবস্থা রাজসিক। গবেষকদলের অনেক সদস্যদেরই ধারণা আমাদের এ জাহাজের কুক আমেরিকার সবচেয়ে ভাল শেফদের একজন। তার কাজ ভোর ছ'টায় নাস্তা, দুপুর বারটায় লাঞ্চ আর সন্ধ্যা ছটায় ডিনার দেয়া। কিন্তু এখানে সুবহে সাদিক ভোর ছ'টার অনেক আগে আর ইফতারের সময় হতে হতে প্রায় রাত ন'টা। সফর হিসেবে যদিও কিছু ছাড় আছে, তাও রমাদানের কল্যাণটা ছাড়তে ইচ্ছে করল না। প্রথমবারের মত সমুদ্রে আসার প্রতিক্রিয়া হিসেবে একদিকে মাথার মগজ পেন্ডুলামের মত দুলছে, অন্য দিকে চোখের সামনে অন্যদের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে ভূরি-ভোজন করতে দেখছি। মনে পড়ল বহুদিন আগে একজন আত্মীয় প্রশ্ন করেছিলেন, "তুমি না খেয়ে থাকাতে আল্লাহ্‌র কি লাভ? তোমাকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহ্‌র কি লাভ?" আসলেই তো, আমরা যে পুরো একমাস দিনে না খাওয়ার নিয়ত করে ফেলেছি, বুঝে হোক-না বুঝে হোক রোযা রাখছি – কেন?

একজন সচেতন আর একজন অজ্ঞ মানুষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে জ্ঞান। অজ্ঞেরা অনেকটা ভাসমান শ্যাওলার মত, স্রোত যখন যেদিকে যায় সেও সেদিকে ভেসে চলে। মাছের পেটে গেল, নাকি নৌকার বৈঠাতে জড়িয়ে গেল,নাকি তীরে থমকে গেল – এতে তার খুব বেশী আসে যায়না। কিন্তু যারা সচেতন মানুষ তারা কোন কাজ করার আগে ভাবে – কেন করছি? ফলাফল কি হবে? সচেতন মানুষ মাত্রই যে মস্ত বড় জ্ঞানী তা নয়; কিন্তু সে জানতে চায়, বুঝতে চায়।

আমাদের মুসলিমদের যখন কেউ প্রশ্ন করে, "এ কাজটা কেন করলে?" তখন তার উত্তর হওয়া উচিত - আল্লাহ বলেছেন তাই। এরপর যখন প্রশ্নকর্তা জানতে চাইবে আল্লাহ কোথায় বলেছেন তখন আমরা কুরান-সুন্নাহ ঘেটে তাকে খুঁজে বের করে দেব। এর নাম আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপরে ভরসা; তিনি যেহেতু সর্বজ্ঞানী তাই তিনি আমাদের কিছুকরতে বলবেন আর তাতে কল্যাণ থাকবেনা – এমনটি অসম্ভব। এই কল্যাণটা কেমন সেটা আমরা নাও জানতে

পারি, জানার পরেও নাও বুঝতে পারি – কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমাদের জন্য ভাল কিছু নিশ্চয়ই আছে। মানুষ যত গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করে কেন সে কাজটা করছে তত সে কাজটাকে ভালোবাসতে শুরু করে, তত সুন্দর করে সে কাজটা করে। এজন্য কিছু কিছু কাজের আদেশ দিয়ে আল্লাহ সাথে সাথে জানিয়েও দিয়েছেন কেন তিনি সে আদেশ দিলেন। রমাদান আসলেই আমরা তাই মসজিদে মসজিদে খতিবদের মুখে সুরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াত শুনি – লা'আল্লাকুম তাত্তাকুন। আমাদের হতভাগ্য যে কেউ আমাদের বুঝিয়ে দেয়না আসলেতাক্বওয়া বলতে কি বোঝায়, কেন আল্লাহ আমাদের পুরো একমাস সিয়াম পালন করতে বাধ্য করেছেন।

তাকওয়া শব্দটি যে আরবি মূল থেকে এসেছে তার অর্থ নিরাপত্তা। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়ামকে ঢালের[34] সাথে তুলনা করেছেন, যে ঢাল তাকে নিরাপত্তা দেবে। কিসের থেকে নিরাপত্তা? ব্যক্তির অন্যায় থেকে তাকে এবং অন্যান্যকে নিরাপদ রাখে তাকওয়া। অন্যায়ের ফলাফল থেকে নিরাপদ থাকতে হবে এই বোধের নাম তাকওয়া। এই বোধটা যখন মানুষের মনে জাগ্রত থাকে তখন সে খারাপ কাজ করার আগে দু'বার ভাবে, কোন একটা ভাল কাজ করার সুযোগ পেলে ঝাপিয়ে পড়ে সেটা করতে। জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে সজাগ থাকার নাম তাকওয়া। ইমাম ইবনে কাসিরের মতে তাকওয়া মানে অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা। উবাই বিন কা'ব উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুম্মা) বলেছিলেন – কাঁটাভরা পথে কাপড় গুটিয়ে সাবধানে চলার নাম তাকওয়া।[35]

রমাদান মাসের বাধ্যতামূলক সিয়ামটা আসলে একটা পুনর্বাসন প্রকল্প। এ প্রকল্পটা মানুষের সত্ত্বার সাথে সম্পর্কিত বিধায় মহান আল্লাহ আগেও মানুষকে সিয়ামের বিধান দিয়েছিলেন। এজন্য আমরা ইহুদিদের ইয়োম কিপুর বা তিশআ বা'ভ, নাসারাদের absolute fasting কিংবা হিন্দুদের নিরম্বু উপবাসের মত ধর্মীয় আচার পালন করতে দেখি। কালের স্রোতে এদের মত আমাদের মুসলিমদের 'সিয়াম'টাও নেহায়েত 'রোযা' অর্থাৎ না খেয়ে থাকা হয়ে গিয়েছে। অথচ সিয়াম শব্দটার অর্থ ছিল বিরত থাকা, ফযরের শুরু

34 বুখারী, মুসলিম
35 তাফসির ইবন কাসির, সুরা বাকারা আয়াত ২

থেকে সূর্যাস্ত অবধি আল্লাহর নিষিদ্ধ করা সব কিছু থেকে বিরত থাকা। মানুষ আর বছর নিজের খেয়ালখুশী মত চলতে চলতে পশুর পর্যায়ে নেমে যায়, রমাদানের এক মাসে আল্লাহ মানুষকে এমন একটা ইবাদাত পালনে বাধ্য করেন যার মাধ্যমে সে আবার তার হারানো মনুষ্যত্ব ফিরে পেতে পারে।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম দেখিয়েছেন যে একেক মানুষের মধ্যে একেকরকম পশুসত্ত্বা প্রবল। কারো স্বভাব কুকুরের মত, যতক্ষণ না তাকে একটা হাড় ছুড়ে দেয়া হবে ততক্ষণ ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। এরা কিছু পাওয়ার জন্য হাত পেতে থাকে - কিছু পেলে খুশীতে গদগদ হয়ে লেজ নাড়তে থাকে, যদি না দেওয়া হয় তবে দাঁত বের করে তাড়া করবে। যে কিছু দেবে তার সে গোলাম বনে যাবে; দাতার মহত্ব তাকে এমনই গ্রাস করবে যে ন্যায়-অন্যায় বিচার গৌণ হয়ে যাবে, দাতার তুষ্টি হয়ে যাবে মূখ্য। অপরদিকে যার কাছ থেকে সে কিছু পাবেনা, তার ক্ষতি করতেসে বিন্দুমাত্র পিছপা হবেনা। সিয়াম রাখতে হয় দিনে, যখন সে জেগে থাকে, কাজ করতে থাকে। একজন সায়েম কিভাবে উপার্জন করছে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে, কতটুকু তার প্রাপ্য, কতটুকু প্রাপ্য নয় সেটা সে চিন্তা করে দেখবে।

আবার তার প্রাপ্তির বিনিময়ে সে কি দিল সেটাও সে মাথায় রাখবে। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের বিশ্রী ব্যবহারের রাশ টেনে ধরার জন্য সিয়াম খুব বড় একটা অস্ত্র। কারো সাথে খারাপ আচরণ তো দূরের কথা, কেউ গায়ে পড়ে এসে ঝগড়া করতে চাইলে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলতে বলেছেন - 'আনা স'ঈমুন, আনা স'ঈমুন', অর্থাৎ দু'বার বলা যে ‘‘আমি সিয়াম পালন করছি’’।[36] এর মানে এই না যে তাকে জানান দিলাম - আমি রোযা আছি দেখে তুই আজকে বেঁচে গেলি। এর মানে নিজেকে বার বার বলা - আমি আত্মনিয়ন্ত্রণ শিখছি। আল্লাহকে খুশী করার জন্য আমার ক্রোধ, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেকে দমন করা শিখছি। এর অন্যথা হলে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করেছেন:

36 বুখারী, মুসলিম

> “যে বাতিল কথা ও কাজ এবং মূর্খতাপূর্ণ আচরণ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।”[37]

রমাদানের সমার্থক শব্দ দান। পৃথিবীতে মানুষ পেতে আসেনি, দিতে এসেছে – এই বোধটা তার মধ্যে জাগ্রত হবে। আরেকজন সায়েমকে ইফতার করানো মানে যে একটা সিয়ামের সমান সাওয়াব – এই তথ্যটা তাকে মনে করিয়ে দেবে রিযক নিয়ে কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করা মানুষের কাজ নয়, মানুষের কাজ অল্প একটু খাবার হলেও সেটা সবার সাথে ভাগ করে মিলেমিশে খাওয়া।

গাধা বোঝা বহন করে। জ্বালানী কাঠ, খাবার বা পোশাক – কোন কিছুতেই তার ভাগ নেই – তবু সে পিঠে ভার নিয়ে চলতেই থাকে। আমাদের মধ্যেও তেমনি কিছু মানুষ আছে যাদের পিঠে জ্ঞানের বোঝা, অথচ তা থেকে তাদেরবিন্দুমাত্র উপকার হয়না। এরা অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করে একটি মাত্র হরমোন কিভাবে পুরো দেহে শতখানেক জৈবিক বিক্রিয়া শুরু করে যার প্রভাবে মানুষ আস্তে আস্তে রাতে ঘুমিয়ে যায়। অথচ যে আল্লাহএত নিখুঁতভাবে ধারাবাহিক বিক্রিয়াসমেত পুরো ঘটনাকে সাজালেন, সেআল্লাহ মানুষকে ঘুমের মাধ্যমে কি শিক্ষা দিলেন সেটা আর তার জ্ঞানী মাথায় ধরেনা।

স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি থেকে পিলপিল করে শিক্ষিত মানুষ বের হচ্ছে যাদের অর্জিত শিক্ষা তাদের কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ শেখাতে পারেনি। আপাত ধার্মিক এমন অনেক মানুষেরই রাতের তারাউইর সলাত কষ্টের বোঝা বাড়ায়, না জীবনে, না মননে কোন পরিবর্তন আনে। এ মাসে কুরান অবতীর্ণ হয়েছিল, রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শিক্ষক জিবরিলের কাছে রমাদানে একাধিকবার কুরান পড়ে শেষ করতেন। তাই আমরাও কুরানকে ‘খতম’ করি মসজিদে মসজিদে। আমরা হাফেজ সাহেবকে তাড়া দিয়ে যাই তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য, কারো কাছে বসে কুরান পড়তে শেখা, মানে বোঝা তো বহু দূরের কথা। সারাবছর যে গাধাগুলো বোঝা বহন করে চলেছে, রমাদানে তারা বাড়তি বোঝা চাপাল; মানুষ হবার সুযোগ আর পেলনা।

---

37 বুখারী

মানুষের মধ্যে একদলকে বলদ বললে অত্যুক্তি হয়না। এদের জীবনের লক্ষ্য ‘কাজ’ করা। ঘানি ঘুরলে তেল বের হয়, মাঠ চাষ করলে ফসল ফলে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘানি কিংবা জোয়াল টেনে এরা ঘরে গিয়ে ঘুমায় আবার পরের দিনে একই কাজ করার জন্য। যে কাজের ফলাফল চোখে দেখা যায়না সেটা তাদের কাছে অকাজ। এভাবে আমৃত্যু তারা অন্য মানুষের গোলাঘর কিংবা তেলের শিশি ভরে যায়। কাজের ব্যস্ততায় তারা ভুলে যায় যে মানুষ পৃথিবীতে আয় করতে আসেনি, এসেছে আল্লাহর ইবাদাত করতে। হালাল অর্থ উপার্জন করা ইবাদাতের অংশ, কিন্তু এটাই জীবনের সব নয়। জীবনের অংশকে যেন মানুষ পুরো জীবন ভেবে ভুল না করে সেজন্য আল্লাহ সিয়ামের মাধ্যমে তার কাজকে থমকে দেন, কর্মস্পৃহা কমিয়ে দেন; আল্লাহর জন্য, পরিবারের জন্য সময় বের করতে বাধ্য করেন।

কিন্তু আমরা পুরো ব্যাপারটাকে উলটোভাবে নিয়েছি। যে বাসায় এগার মাস দু’পদ রান্না হত সে বাসায় রমাদানে চার পদ খাবার হয় - গৃহকর্ত্রীর আর কুরান পড়ার সময় জোটেনা। ইফতারের পর যদিওবা ফুরসত মেলে, সেই সময় চলে যায় ঈদের জন্য কেনাকাটা করতে। ব্যবসায়ী আর ক্রেতা সবারই নাভিশ্বাস ওঠে, ফরজ সলাতটাও ইফতারের উচ্ছিষ্ট সালাদের মত ভাগাড়ে চলে যায়।

কিছু মানুষ আছে স্বভাবগতভাবেই বিদ্রোহী। এরা অনেকটা ইদুঁরের মত, খাদ্য-অখাদ্য - সামনে যা পায় তাই দাঁতে কাটতে থাকে। কারো কর্তৃত্ব মানতে এরা রাজী নয় - সবকিছুকে ধ্বংস করা, নষ্ট করা এদের কাজ। এমন মানুষদের আল্লাহ সিয়ামের মাধ্যমে শিক্ষা দেন যে যেখানে কারো কর্তৃত্ব চলে না, সেখানেও আল্লাহর কর্তৃত্ব আছে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষকে অবকাশ দিলেও তিনি সবকিছু দেখছেন, শুনছেন। ক্ষুধা এবং পিপাসার মত অবিচ্ছেদ্য জৈবিক সত্ত্বাকে যদি মানুষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দমন করতে পারে তাহলে কেন সে নিজের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে পারবেনা? হালাল খাবারকে একটা সময়সীমায় হারাম সাব্যস্ত করে মহান আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দেনহালাল-হারামের সীমা নির্ধারণ মানুষের জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে না, আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। এই সীমা যে লঙ্ঘন করবে তার জন্য ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছুই নেই। সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতারের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের

জানিয়েছেন।[38] আমরা যেমন না খেয়ে ছিলাম আল্লাহর আদেশে, সূর্যাস্তের সাথে সাথে খাবার মুখে দেয়াও আল্লাহর নির্দেশ মানার জন্য। লক্ষ্যণীয়, এখানে আরো কিছুক্ষণ না খেয়ে থেকে কষ্ট করার মধ্যে তাকওয়া নেই; তাকওয়া আছে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে।

কিছু মানুষের মধ্যে রয়েছে বিষধর সাপের বৈশিষ্ট্য। এরা মানুষের ভাল দেখলে সহ্য করতে পারেনা, 'আইনুল হাসাদ' অর্থাৎ দৃষ্টির হিংসারবিষে এরা মানুষের ক্ষতি করে। এদের কথার বিষে ভাই-ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, পরিবার ভেঙ্গে যায়। নিজের অজান্তে বলে ফেলা একটা ছোট্ট কথা মানুষকে বড় আঘাত করতে পারে, তার মনের শান্তি কেড়ে নিতে পারে। এজন্য সিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে আদেশ দিলেন জিহবা সংবরণ করার জন্য – পরনিন্দা এবং পরচর্চা না ছেড়ে দিলে সিয়াম পালন করে লাভ নেই, আছে শুধু অনর্থক ক্ষুধার কষ্ট।[39]

মানুষের উন্নতি দেখে, সুন্দর কিছু দেখে ঈর্ষাকাতর হবার বদলে ইসলাম আমাদের তাই শিক্ষা দিয়েছে তার কল্যাণের জন্য দু'আ করতে।[40] যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মঙ্গল তা যেন আল্লাহ বাড়িয়ে দেন – মানুষের মনকে উদার করার, ভেবেচিন্তে কথা বলার যে শিক্ষা সিয়াম দিয়েছিল সেটাও আজ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

বনের হিংস্র পশুদের সাথে মানুষের পার্থক্য হল - পশুরা অন্যের অধিকারের তোয়াক্কা করেনা, মানুষ করে। কিন্তু আজ সন্ধ্যাতেই কিছু মানুষ ঝাপিয়ে পড়বে অফিসফেরতা কারো উপরে, ছিনিয়ে নেবে মাসের বেতনটা। হালালভাবে টাকা আয় করা যে কত পরিশ্রমের ব্যাপার এটা যারা করে তারাই বোঝে। সেই কষ্টের উপার্জনটা যখন অন্যায়ভাবে কেউ ছিনিয়ে নেয়, তখন যে কি কষ্ট লাগে সেটা যার গেছে শুধু সেই বোঝে। দেশের গরীব মানুষদের উপরে চাপিয়ে দেয়া করের টাকাতে যেসব সংসদ সদস্য-মন্ত্রী-আমলারা বাড়ী-গাড়ি করে, তারা আবার সারাদিন সিয়াম শেষে ইফতার পার্টিও দেয়। আল্লাহর দ্বীনের সাথে এতবড় প্রহসন করা মানুষগুলো বোঝেনা আল্লাহর সাথে করা পাপ হয়ত আল্লাহ ক্ষমা করবেন, কিন্তু মানুষের

38 বুখারী, মুসলিম

39 আহমাদ, আদ-দারিমী, ইবনু খুযাইমা

40 ইবনুল সুন্নী 'আমল আল ইয়াওম ওয়াল লাইলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানি আল কালিমা আল তায়্যিব গ্রন্থে হাদিসটির বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করেছেন।

সাথে করা পাপের ক্ষমা মানুষের কাছ থেকেই নিতে হবে। পৃথিবীর আদালতে বিচার হয়না বলে কি আল্লাহর আদালতে বিচার হবেনা?

সিয়াম আমাদের শিক্ষা দেয় লোভ সংবরণ করতে। হারাম টাকা দিয়ে কেনা চকবাজার থেকে ইফতারির চেয়ে রিকশা চালিয়ে এক মুঠ মুড়ি দিয়ে ইফতার করা ভাল। ভাল থাকার লোভ, ভাল পড়ার লোভ, ভাল খাওয়ার লোভে যদি পেটে আগুনই ভরলাম তাহলে আর রোযা থাকার মানেটা কি?

কিছু মানুষের মধ্যে আছে শুকরের চরিত্র। পৃথিবীর যাবতীয় ক্লেদ-মলের প্রতি এদের আগ্রহ, ভাল কোন কিছু এদের মুখে রোচে না। স্বভাবগতনোংরামির কারণে এদের কাছে সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষার চেয়ে জননেন্দ্রিয়ের সুখই প্রধান। বিবেকহীন ভোগ আর যৌনতায় আক্রান্ত মানুষদের জন্য সিয়াম অনেক বড় একটা ধাক্কা। বিয়ের মত পবিত্র একটা সম্পর্কে বাঁধা দুটো মানুষ যখন সিয়ামের জন্য দিনের সিংহভাগ সময় বৈধ মেলামেশাকে 'না' বলতে বাধ্য হয়, তখন অভিশপ্ত অবৈধ সম্পর্কের পরিণাম কি হতে পারে?

মানুষ আর জানোয়ারে তফাৎ কি? মানুষও তো একধরণের জানোয়ার। উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো কি আমাদের মধ্যে নেই? নিজের বিবেকের কাছে যদি প্রশ্ন করি তাহলে জবাব পাব – আছে; কোনটা কম, কোনটা বেশি। যেসব মানুষদের মধ্যে অনেকগুলো পশুর বৈশিষ্ট্য প্রবল হয়ে ওঠে তখন তারা চারপেয়ে পশুদের চেয়েও নিম্নস্তরে নেমে যায়। এরকম মানুষেরা অন্য মানুষদের প্রতি বর্ণনাতীত নৃশংসতা দেখায় যেটা পশুরাও করতে অক্ষম।

কিন্তু মানুষ কিন্তু এমন পর্যায়ে একদিনে নামেনা, ধীরে ধীরে নামে। তাই মানুষের অধঃপতনটা ঠেকানোর জন্য আল্লাহ যেসব ইবাদাতের ব্যবস্থা করেছেন তার মধ্যে সিয়াম অন্যতম।সিয়ামের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সেই সৃষ্টির অনুকরণ করে যাদের খাদ্য গ্রহণ অথবা প্রজনন কোনটারই প্রয়োজন পড়েনা। মালাইকা বা ফেরেশতাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে যে তাদের জৈবিক তাড়নাবা পাপ করার ক্ষমতা কোনটাই নেই কিন্তু মানুষের তা আছে। মানুষ যখন জৈবিক চাহিদাকে দমন করে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য; লোভ-হিংসা-পরচর্চা-পরনিন্দা পরিত্যাগ করে নিজেকে বিশুদ্ধ করার জন্য; অন্যের

সম্পদ-সম্মান-অধিকারকে সংরক্ষণ করে আল্লাহর শাস্তির ভয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য তখন সে তার সব সীমাবদ্ধতা নিয়েও মালাইকাদের চেয়ে অধিক সম্মানিত বলে বিবেচিত হয়।

আমরা সিয়াম পালন করি আল্লাহর কাছে ফিরে যাবার জন্য, যে পাপের পোকাগুলো আমাদের মনুষ্যত্বকে খেয়ে ফেলে সেগুলো থেকে বাঁচার জন্য, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য। বছরজুড়ে প্রতিদিন যেসব কাজ করে আমরা জাহান্নামের শাস্তি আমাদের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছি সেই কাজগুলো থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমরা সিয়াম থাকি। সিয়াম থেকে আমরা আল্লাহকে ধন্য করে দেইনা, নিজেরা নিজেদের বাঁচাই। তাই রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন যেন আমরা রমাদানের শেষ লগ্নে এসে রাতের সলাতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহকে বলি – ‘‘আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফুয়ান্নি’’ – হে আল্লাহ নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।[41]

আল্লাহ যেন আমাদের পাশবিকতা থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করেন, সিয়ামের মর্মবাণীটা বুঝে আমাদের সিয়াম পালনের তৌফিক দেন। আমিন।

১৫ রমাদান, ১৪৩৩ হিজরি।

41 মুসনাদে আহমাদ, ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানির মতে সহীহ।

শঙ্খ ও স্বাধীনতা

আমরা তখন সোবহানবাগ কলোনীতে থাকি। একদিন সকালে নাস্তা খেতে খেতে আবিষ্কার করলাম গ্যারেজের ছাদে কাকেদের বিশাল জটলা। নিতান্তই উৎসুক হয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলাম একটা বাদামী রঙের প্রাণীকে ঘিরে রেখেছে কাকের দল, একটা ঠোকর মারছে, বাকি সবাই চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে - অনেকটা আমাদের দেশের পকেটমার পেটানোর মত। তবে কাকেরা নিজেরা নিজেদের মাংস খায় না, মানুষ খায়। যাহোক, প্রাণীটার জন্য আমার মনের পশুপ্রেমী অংশ জেগে উঠল। ঠুনকো টিনের চাল ভার সইতে পারবে না বিধায় হাঁচড়ে-পাঁচড়ে প্রাচীর বেয়ে চললাম ঘটনাস্থান লক্ষ্য করে। কাকেরা দল বেধে থাকলে ভারী বিপদজনক, তাই হাতে একটা লাঠি নিয়ে হুশ-হুশ করে ভয় দেখাচ্ছি। কাছে গিয়ে দেখি ক্ষত-বিক্ষত একটা চিল ডানার মাঝে মুখ লুকিয়ে আছে। অনেক কায়দা করে চিলটাকে কোলে তুলে কিভাবে যে বাসায় আসলাম আল্লাহই জানেন। ভাগ্যিস কাকগুলো আলফ্রেড হিচককের দ্য বার্ডস দেখেনি।

বাসায় আসার পরে গবেষণা শুরু হল উঁচু আকাশের পাখি কিভাবে মাটিতে এল সেই মর্মে। হতে পারে আগের রাতে যে ঝড় হয়েছিল তাতে ডেন্টাল কলেজ ছাত্রাবাসের বিশাল গাছগুলোর কোন একটা বাসা থেকে এই চিলটি পড়ে গেছে। দেখতে বিশাল মনে হলেও চিলটা আসলে ছিল নেহায়েত একটা বাচ্চা – ওড়াও শেখেনি। এমনিতে কাকেরা চিলকে সমঝে চলে – কিন্তু শত্রুর অসহায় শিশুকে বাগে পাবার সুযোগ কেউ কি আর ছাড়ে?

আজকেই যখন কেউ ইসলাম মেনে চলতে চায় তখন অমুসলিম তো বটেই মুসলিম নামধারী কাকেদের কথার আঘাতে, মিথ্যা ধমকানিতে আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়। আমার চিলটাকে সাইকেলের পিছনে বাক্সবন্দী করে গুলিস্তানে সরকারী পশু হাসপাতালে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। আল্লাহর দয়ায়, সেই সহৃদয় ডাক্তারের দেয়া ওষুধখেয়ে আমার চিলটার ক্ষতগুলো সেরে গিয়েছিল। আল্লাহ আমাদের মুসলিমদের জন্যও দয়া করেছেন – আল কুরান, যার আরেকনাম আশ-শিফা – তা মন কিংবা দেহের ব্যাধির আরোগ্য হিসেবে নাযিল করেছেন। আমরা মুসলিমরা আজ এতই হতভাগা যে রক্তাক্ত মন

নিয়ে আমরা গান শুনি, দুঃখভুলে যেতে তরল দ্রব্যে পিনিক করি। আর আশ-শিফা কাপড়ের ভাজে মসজিদের র্যাকে অবহেলায় শুয়ে থাকে।

চিলটার নাম রাখলাম শঙ্খ। বিশাল বাথরুমে তাক বানিয়ে তার থাকার জায়গা করা হল। ডিমভাজি খেতে ভালবাসত। ছোট একটা মেনি মাছ আস্ত খেয়ে ফেলত, কাঁটার কঙ্কালটা পড়ে থাকত। যে পাখিটা ছোট্ট বেলা থেকে মানুষের কাছে আছে তাকে কিভাবে এমনভাবে কাঁটা বেছে খাওয়া শেখালেন আল্লাহ তিনিই জানেন। পাখিটাকে উড়তে শেখান কর্তব্য জ্ঞান করে মাঝে মাঝে মাঠে নিয়ে যেতাম। একটু ওড়ার চেষ্টা করেই ধুপ করে পড়ে যেত। চারদেয়ালের মাঝে বন্দী থাকতে শঙ্খেরও হয়ত আরভাল লাগত না। সে কেবলি উড়তে চাইত। একদিন ছাদে খেলার সময় তাকে নিয়ে গিয়েছি – ওড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে পাশের বিল্ডিং এর সাথে ধাক্কা খেয়ে একদম নীচে পড়ে গেল। পাখি বলেই বেঁচে গিয়েছিল বোধহয় সে যাত্রায়।

আমরা মানুষেরাও আসলে শঙ্খের মত। আমরা বুঝিনা যে আমাদের ওড়ার সময় হয়নি। আমাদের পাখাগুলোতে ওড়ার শক্তি আসেনি। শঙ্খের মত আমরাও স্বাধীনতা চাই – কিন্তু স্বাধীনতা কি সেটা আমরা বুঝিনা। বুঝিনা বলেই স্বাধীনতা পাবার চেষ্টায় কত কি করি, পরিণামে কেবলই নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়।

এই পৃথিবীতে কি কোন মানুষ সত্যি সত্যি স্বাধীন হতে পারে? আমাদের প্রতিদিন প্রতিটা কাজের জন্য কত মানুষের উপরে নির্ভর করতে হয়। আমরা খাবারের জন্য কৃষকের উপরে নির্ভরশীল, পানির জন্য ওয়াসার দ্বারস্থ হই, বিদ্যুতের জন্য ডেসা। যারা চাকরি করে তারা ভয়ে ভয়ে থাকে – চাকরি চলে গেলে যা যা কিনে আমাদের জীবন বাঁচে তার কিছুই যে কিনতে পারবনা। যে ব্যবসা করে সে তাই খদ্দেরদের মন রক্ষা করে চলে। যে মানুষ সমাজের একটা অংশ এবং এই সমাজের বাইরে গেলে সে মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে পারবে না – তাকে আসলে ঠিক কি অর্থে স্ব-অধীন বলা যায়? ইনডিপেনডেন্ট তো সে কখনই নয়।

ফ্রিডম অর্থেও যে মানুষ স্বাধীন তা আমি মানতে পারিনা। আমার কি যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা আছে? আমি চাইলেই কি শঙ্খের মত আকাশে শাইশাই করে উড়তে পারব? ব্যর্থ

প্রেমিক কি চাইলেই মনের মানুষটার মন জয় করতে পারে? প্রেমিকার মনে যে আছে তাকে সরিয়ে নিজেকে সেখানে বসিয়ে দিতে পারে? কেউ কি চাইলেই ওয়ারেন বাফেটের মত ধনকুবের হতে পারবে? কিংবা লিনাস পলিং এর মত বিশাল বিজ্ঞানী? আমারতো কত ইচ্ছে করে – তাও তো আমি ইয়াসমিন মোজাহেদের মত শব্দ বুনতে পারিনা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মত ছন্দ মেলাতে পারিনা, জীবননান্দের মত চিত্রপট আঁকতে পারিনা। আমি কত্ত ভাবি – আমি খুব ভাল একটা মানুষ হব। উমার রাদিয়াল্লাহু তা'আল আনহুর মত হব – যে শয়তান আমাকে দেখলেই রাস্তা ছেড়ে পালাবে। কই পারিনাতো। শয়তান রাস্তা ছাড়া তো দূরে থাক – সুযোগ পেলেই সোজা বুকের ভিতরে গিয়ে বসে থাকে, সলাতে দাড়ালে রাজ্যের গল্প বলা শুরু করে। আমার ইচ্ছের জোর পৃথিবী তো দূরের কথা – আমার নিজের উপরই খাটেনা। 'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়' – কথাটা হয়ত সত্য তবে এর পরিসর বড্ড ছোট।

আল্লাহ এ বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন, তাকে কিছু নিয়ম কানুন দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। ভৌত বিজ্ঞানের নিয়ম – মানুষ মাটি থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে এসেই পড়বে। জীববিজ্ঞানের নিয়ম – মাঝারি বাঙালির ছেলে তেমনই হবে - ভাইকিংদের মত দানবাকৃতির নয়। আল্লাহ তার অর্থনীতির নিয়ম দিয়ে পৃথিবী চালাবেন – তিনি যাকে সম্পদ দেবেন, সে সম্পদশালী হবে। তিনি তার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞানে যাকে ক্ষমতা দেবেন সেই সবার উপরে ছড়ি ঘোরাবে। তিনি যাকে খুশী জ্ঞান দান করবেন, যাকে খুশী মেধা দেবেন। তার নিয়ম ভাঙার শক্তি আমাদের নেই, সাধ্যও নেই। প্রাকৃতিক এসব নিয়মের বাঁধায় আমাদের ইচ্ছে বাঁধা পড়ে। কালের বাঁধনে আটকে থাকি বলে আমরা আমাদের শৈশবেফিরে যেতে পারিনা। স্থানের নিগড়ে বন্দী থাকি বলে শত ইচ্ছেতেও দেশে ফেলে আসা প্রিয়জনদের মুখ দেখতে পারিনা। এ ধরিত্রিতে আমরা তাই স্বাধীন নই – প্রাকৃতিক আইনের অধীন, সমাজের আইনের অধীন। অন্যমানুষের অধিকারের প্রাচীর আমাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে দেয়।

কিন্তু আল্লাহ তো আমাদেরও সৃষ্টি করেছেন। আমাদের বুকের ভেতরে স্বাধীনতার যে আকুতিটা আছে সেটার খবর কি তিনি রাখেননা? তিনি কি জানেননা যে আমাদের যা খুশী করতে ইচ্ছে করে, যা খুশী পেতে ইচ্ছে করে, যেখানে খুশী যেতে ইচ্ছে করে, যেভাবে খুশী যেতে ইচ্ছে করে। তিনি জানেন বলেই জান্নাত বানিয়েছেন যেখানে মানুষ যেখানে খুশী

সেখানে থাকতে পারবে।[42] তারা যা চাবে তাই তাদের দেয়া হবে – যা চাবে, যা খুশী তার সব, সব।[43] জান্নাতে সময়ের প্রতীকি মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে সময় নামক পার্থিব মাত্রাতে জান্নাত আবদ্ধ নয়। জান্নাতে সম্পদের সীমাবদ্ধতা নেই – একজন পেলে অন্যজনের ভাগে কম পড়বে সেই ভয়টা নেই। সেখানে মানবদেহের কোষ বিভাজিত হতে হতে শেষে বুড়ো হয়ে যাবে না – জরা বা ব্যাধি মানুষকে স্পর্শ করবেনা। এই যে অনন্তকালের স্বাধীনতা – এটা মানুষকে আল্লাহ দান করবেন একটা মাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে: এই পৃথিবীতে মানুষ তার নিজের স্বাধীনতাটা কার হাতে তুলে দিচ্ছে – আল্লাহর হাতে না অন্য কিছুর পায়ে।

শয়তানের যতগুলো বুদ্ধি আছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার – তথাকথিত স্বাধীনতার দাবী অন্যতম। শয়তান মানুষকে তার নিজের দাস বানায়, অর্থের দাস বানায়, প্রেমাষ্পদের দাস বানায়, নেতা-নেত্রীর দাস বানায়, প্রবৃত্তির দাস বানায়। এত কিছুর দাস বানানোর পরেও সে মানুষকে বলে - এই যে তুমি স্বাধীন। একসময় মহাসাগরের ওপার থেকে আসা ব্রিটিশরা আমাদের প্রভুত্ব করেছে, আমাদের তারা অশিক্ষা-কুশিক্ষা থেকে স্বাধীনতা দিয়েছে – আমরা বর্তে গিয়েছি। এরপরে দেশ ভাগ হল – আজাদী এলো। পশ্চিম পাকিস্তানের গোলামি করবনা বলে আমরা যুদ্ধ করলাম – আমাদের বলা হল দেশ স্বাধীন হয়েছে।

কিন্তু আমরা মানুষেরা স্বাধীন হয়েছি কি? ৭১ এর আগে ক্ষমতার কেন্দ্র ছিলইসলামাবাদ, আজ সেটা গোপালগঞ্জ। পুরনো প্রভুরা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের শোষণ করত, এখনকার প্রভুদের বাহন কালো বেড়াল। একজন সুস্থ মানুষ নেতার আদেশে আরেকটা মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে – এটাই কি ব্যক্তির স্বাধীনতা? সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে ভাই ভাইকে খুন করে – এটা কি অর্থের দাসত্ব নয়? একজন নারীকে ধর্ষণ শেষে কেটে টুকরো টুকরো করা – এটা কি প্রবৃত্তির দাসত্ব না? মাসে মাসে নজরানা ঠিক মত দিলে পীর সাহেব সাথে করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন – এটা কি তাগুত্বের দাসত্ব না? আপন সন্তানকে হত্যা করে প্রেমিকের সাথে পালিয়ে যাওয়া – এটাই কি সেই স্বাধীনতা যা আমাদের শেখানো হচ্ছে - "আমার দেহ আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব"।

42 সুরা আয-যুমার, ৩৯:৭৪
43 সুরা ইয়াসিন, ৩৬:৫৭

মানুষ এ পৃথিবীতে স্বাধীন নয়। সবচে যে স্বাধীনচেতা – সেও নিজের অজান্তে তার দেহের ভিতরে থাকা 'নাফসে আম্মারা'র দাসত্ব করে। এই নাফস ব্যক্তির ভিতরে থাকলেও সে ব্যক্তির অংশ নয়। সে ব্যক্তিকে সুখের খোজে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। যেটা দেখতে ভাল লাগে – নাচ, মুভি, চিত্রকর্ম – এই দেখাটাকেই সে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে দেয়। যেটা শুনতে ভাল লাগে – অর্থহীন প্রলাপ, মানুষকে অবমাননা করা কৌতুক, শাস্ত্রীয় কিংবা অশাস্ত্রীয় সংগীত – এই শোনাগুলোতেই সে মানুষের জীবনকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। জিহবাকে নিত্য-নতুন স্বাদ উপহার দিতে সে জীবন উৎসর্গ করে দেয়। ছোট্ট এক বোতল সুগন্ধীর বিনিময় মূল্য হয় শ'খানেক উপোসী শিশুর একদিনের খাবার। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে পাওয়া এই যে নানান ধরণের ভালোলাগা, ভালো থাকা – সবকিছু আবৃত্ত হয় নিজেকে কেন্দ্র করে। 'আমি' এবং 'আমার' এ দুটি শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে যায়।

শঙ্খ আমার বন্ধু ছিল। আমি ঘুমিয়ে থাকলে ও মাথার কাছে বিছানার কিনারে বসে থাকত। মাঝে মধ্যে ওকে কাঁধে নিয়ে হাটতে বেরোতাম সন্ধ্যায়। কিন্তু যখন দেখলাম ও বড় হয়ে যাচ্ছে – আমাদের বিশাল বাথরুমটাও ওর কাছে ছোট্ট একটা খাচার মত মনে হচ্ছে তখন মা আর ছোটভাইটা মিলে ওকে বোটানিকাল গার্ডেনে রেখে এসেছিলেন। আমার কাছেওর সান্নিধ্যের চেয়ে স্বাধীনতাটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। দূর আকাশ থেকে উড়ে এসে হাতে বসবে – হলিউডি মুভিতে দেখা এই দৃশ্য আমার জীবনে সত্যি হয়নি। শঙ্খকে নিয়ে যাওয়ার পরে বহুদিন মন খারাপ ছিল। বহুদিন কোন চিল ডাকলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে শঙ্খকে কল্পনা করে নিয়েছি।

কিন্তু দিনশেষে সত্য এটাই যে আমাদের অনেক প্রিয় কিছুকেও ছেড়ে দিতে হয় বৃহত্তর স্বার্থে। আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা - অনন্তকাল ধরে যা ইচ্ছে করার সুযোগ চাইলে এ পৃথিবীতে আমাদের আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। আমাদের স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে কার কাছে আমরা আমাদের সীমিত পার্থিব স্বাধীনতা সমর্পণ করব - আল্লাহর কাছে না অন্যান্য মিথ্যা প্রভুদের কাছে।

এই স্বাধীনতা বিসর্জন কোন লোক দেখানো আচরণ নয় – এটা বিশাল একটা আত্মোপলব্ধির ব্যাপার। যে আল্লাহ আমাদের অসীম স্বাধীনতা, সত্যিকারের স্বাধীনতা উপহার দিচ্ছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে, তাকে ভালবেসে, তার অসন্তুষ্টিকে ঘৃণা করে ছোট্ট এ জীবনে আমরা আত্মসমর্পণ করব। মহান আল্লাহকে তো আমরা তার দয়ার প্রতিদান হিসেবে কিছুই দিতে পারিনা, তাকে একটুখানি সন্তুষ্ট করার চেষ্টাটুকু তো করতে পারি। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে তো খুব বেশী কিছু করতে হয়না, আমরা মননে-চলনে-বলনে সত্যিকার মুসলিম হব – আল্লাহর এই সামান্য চাওয়াটা কি খুব অযৌক্তিক?

আল্লাহ যেন তার দ্বীনের অসীম সৌন্দর্যটা আমাদের চোখ মেলে দেখার সুযোগ দেন। সীমিত স্বাধীনতার বিনিময়ে সত্যিকার স্বাধীনতা পাবার সুযোগ দেন। আমিন।

২০ রজব, ১৪৩৩ হিজরি।

এভারেস্ট বিজয়

বেড়াতে যাওয়া ব্যাপারটা আমার রক্তে মিশে আছে। বন্ধুরা মিলে ঘুরতে যাওয়ার সময় ‘কোথায় যাওয়া যায়’ – এ মর্মে যখন তর্ক উঠত – আমার ভোট সব সময় পাহাড়ের পক্ষে ছিল। বান্দরবান, রাঙামাটির বাটেকনাফের পিচ্চি পিচ্চি পাহাড়, কিংবা সিলেটের টিলাগুলো – মাটি থেকে আকাশপানে উঠে গেছে এমন কিছু দেখলেই আমার তাতে উঠতে ইচ্ছে করত। মাধবকুন্ডে এমনিভাবে পাহাড় বাইতে গিয়ে একবার আবিষ্কার করেছিলাম আর নামতে পারছিনা। সেদিন সচেতনভাবে মৃত্যুভয় উপলব্ধি করার পরেও পাহাড়ের প্রতি টান আমার একটুও কমেনি। সম্প্রতি আমার মতই পাহাড়-প্রাণ কিছু বাঙালী পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছে –ব্যাপারটাতে আমার তীব্র আনন্দ হওয়ার কথা ছিল। হল তার পুরো উলটো। মিডিয়া এবং মধ্যবিত্তের উচ্ছাস দেখে গভীর একটা মন খারাপ করা বোধগ্রাস করল।

বেশ টানাপোড়েনের সংসারে বড় হওয়ায় কোন কাজ করার আগে সেটার অর্থনৈতিক বিষয়গুলো বিবেচনা করা আমার ছোটবেলার অভ্যাস। মাকে দেখতাম বিশাল টেবুলেশন খাতায় ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের নম্বর উঠাচ্ছেন। সীমিত বেতনের বাইরে এ অতিরিক্ত কামাইটুকু দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবেন কক্সবাজারে বেড়াতে। আবার কখনও ভাগ্য তত সুপ্রসন্ন হয়নি, স্কুল থেকে জাম্বুরিতে যাচ্ছে স্কাউট দল, ক্যাম্প ফি ৫০০ টাকা। জানি মা দিতে পারবেন না, তাই তাকে বলেছি – ধুর জাম্বুরিতে গিয়ে কি হবে? সন্ধ্যায় গোধূলী আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্যাম্পফায়ারের আগুনটা কল্পনা করে নিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে যতবার বেড়াতে গিয়েছি, ছাত্র পড়ানোর জমানো টাকার উপরে চলেছি – মার কাছে হাত পাতিনি কখনও।

মাউন্ট এভারেস্টে উঠতে নিদেনপক্ষে খরচ হয় ৪০,০০০ হাজার ডলার, ৩২ লক্ষ টাকা। যারা ‘পর্বত বিজয়’ করছেন তাদের নিজেদের এত টাকা নেই; তারা হাত পেতেছেন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর কাছে - ভদ্রভাষায় বললে ‘স্পন্সর’।খবরের কাগজ জুড়ে ছবি আসবে, প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী দলীয় নেত্রী ঐক্যমত্যে শুভেচ্ছা বাণী দেবেন, সুশীল সমাজ সম্বর্ধনা দেবে। স্পন্সর মেলাটা অস্বাভাবিক না, এত বড় অর্জনকে ছোট করে দেখাও ঠিক না। আমার খালি বুকে খচখচ করতে থাকে যে নাজমুল ইসলাম অপু তার বোনেরগিলিয়ান-ব্যেরি সিনড্রোম রোগের চিকিৎসার জন্য ১৩ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পারছে না। সারাদিন

বুয়েটে ক্লাস করে, বিকেলে ছাত্র পড়িয়ে, যখন সে বাংলাদেশ মেডিকেলে গিয়ে ভাগ্নে-ভাগ্নীকে কোলে নিচ্ছে তখনও তার গলায় বিশাল একটা কষ্টের দলা। আমার নিজেরও জিবিএস হয়েছিল ছোটবেলায়। মাহফুজা আক্তারের মত আমারও সারা শরীরঅবশ ছিল। আমার মা গলার হার নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের কাছে গিয়েছিলেন – বন্ধক রেখে টাকা ধার করার জন্য।

মাহফুজা আক্তার মরলে বা বাঁচলে কি যায় আসে? তার ছোট দু'টো বাচ্চামা-হারা হলে কি যায় আসে? অপুর কান্না তো কোন জাতীয় সমস্যা না। টাকা নেই, তাই চিকিৎসার অভাবে মারা যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এটাতো কোন জাতীয় অপমান না। বোধহয় একানব্বুই সালের রোগটা আমার মস্তিষ্কের সেই জায়গাটা এখনও অবশ করে রেখেছে যেটা ৪৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এভারেস্ট বিজয়ের সম্মান বুঝতে পারত।

যেহেতু আমি নিম্ন-মধ্যবিত্তের সন্তান, নিম্নবিত্তের মানুষদের কখনও পর মনে হয়নি। নিঝুম দ্বীপ কি সেন্টমার্টিন বেড়াতে গেলে কথা বলেছি জেলেদের সাথে। সিরাজগঞ্জের নদীভাঙা মানুষ কিংবা লালমনিরহাটের চরের বাসিন্দা – প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার শিকার শত মানুষের সাথে কথা বলেও কখন যে পদটি শুনতে পাইনি তা হল – 'প্রকৃতিরসাথে যুদ্ধ'; এটি নিতান্তই সেসব বাবুদের আবিষ্কার যারা এনজিওর নামে এদেশের দারিদ্র্য বিপণন করে ভোগবাদী পশ্চিমাদের কাছে। তাইতো ব্র্যাকের মত বহুজাতিক এবং বহুমাত্রিক ব্যবসা পরিচালনাকারী ধনকুবের সংস্থাটির ওয়েবসাইটে গেলে জ্বলজ্বল করে দানের বাক্স – Donate Now!

আচ্ছা প্রকৃতি বলে কি কেউ আছে? সাগরের কি মন আছে যে সে ঠিক করল আজ রাতে জলোচ্ছাস করবে উপকূলে? বাতাসের কি মস্তিষ্ক আছে যে সে ঘূর্ণিঝড়ে সব কিছু লন্ডভন্ড করার পরিকল্পনা করবে? ভূমিকম্প কি মাটির ইচ্ছেয় হয়? আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি – মাটি, পানি, বাতাস, আগুন ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলো আল্লাহর হুকুমাধীন। যখন কোন জনপদ তার অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘন করে তখন তিনি তাদের সাবধান করার জন্য এই উপাদানগুলো ব্যবহার করেন। প্রকৃতির সাথে তাই যুদ্ধ করা চলেনা। আল্লাহর সাথে কেউ যুদ্ধ করতে পারেনা। এই পৃথিবীর সাথে মানুষের সহাবস্থান চলতে পারে কারণ পার্থিব উপাদানগুলোকে অপচয় ছাড়া ব্যবহার করার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীতে অধর্মের বাণী যখন থেকে জোরেশোরে প্রচার হতে লাগল,তখন থেকে মানুষকে বোঝানো শুরু হল যে আমরা প্রকৃতিকে বদলে দেয়ার ক্ষমতা রাখি। সিনেমাগুলোতে দেখান শুরু হল কিভাবে ঝড়, আগ্নেয়গিরি, ভূমিধ্বস, সুনামি ইত্যাদির সাথে যুদ্ধ করে দিব্যি মানুষ জিতে যাচ্ছে। পৃথিবী ধ্বংসকারী কিয়ামাতকে হলিউড বিকৃত করল এবং বিক্রি করল। কখন এলিয়েনের ছদ্মবেশে মহাজাগতিক শক্তি, কখনও বিশাল কোন ধূমকেতু – সবাই চায় ধরিত্রী ধ্বংস করতে। আর পৃথিবীর মানুষেরা একজন বুদ্ধিমান সাহসী পুরুষ এবং একজন সুদর্শনানারীর বদৌলতে সে বিপদ ঠেকিয়ে দেয় শেষমেশ। মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া হল – এখন আমরা অনেক উন্নত, সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখি। পৃথিবী ধ্বংসের যেসব বর্ণনা ধর্মগ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় সবই অলীক কেচ্ছা। যে এই পৃথিবী ধ্বংস করতে চায় সে হচ্ছে চরম অশুভ শক্তি – আমাদের মানুষদের কাজ সর্বশক্তিতে এই অশুভ শক্তির বিরোধীতা করা, তাকে ঘৃণা করা। এভাবে যে পৃথিবী আল্লাহর সৃষ্টি করলেন একদিন ধ্বংস করে দেবেন বলে, সে পৃথিবীকে অমরত্ব দেয়া হল। শত্রু ভাবতে শেখানো হল আল্লাহকে, যিনি এ জগত থেকে অনেকগুণে উত্তম বাসস্থান তৈরী করে রেখেছিলেন আমাদের জন্য।

শিল্প বিপ্লবোত্তর বস্তুবাদী পশ্চিমা দর্শন যখন মানুষের মনে গেঁথে গেল তখন সে প্রকৃতিকে ভুল বোঝা শুরু করল। নদীতে বাঁধ দিয়ে তাকে শাসন করাকে আরাধনা হিসেবে বিবেচনা করল। যে পর্বতের সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজের ক্ষুদ্রতার কথা মনে হওয়ার কথা ছিল – সেই পর্বতের চূড়ায় ওঠাকে সে বিজয় বলে মনে করল। কোন পাহাড় তৈরী করা দূরে থাক, সেটার গায়ে গর্ত খুঁড়ে একটা সুড়ঙ্গ তৈরী করতে মানুষের কত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। আর দিনের পর দিন পরিশ্রম করে,কত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে, কত সময় ব্যয় করে – শুধুমাত্র চূড়ায় উঠে পতাকা দোলানোর নাম নাকি বিজয়! ভূমন্ডলের সর্বোচ্চ স্থানটাকে পদাবনত করার নাম নাকি বিশ্বজয়! এটা নাকি মানুষের সাহসিকতার বিজয়, তার শারীরিক সামর্থ্যের বিজয়!

এ পৃথিবীতে ৮ কিলোমিটারের অধিক উচ্চতার ১৪টি পর্বতচূড়া আছে, সবগুলোই হিমালয়-কারাকোরাম রেঞ্জে অবস্থিত। এদের মধ্যে ১৯৫০ সালে প্রথম মানুষ অন্নপূর্ণার চূড়ায় ওঠে। কারা উঠেছিল? ফরাসী এক অভিযাত্রী দল। আচ্ছা, এত বছর ধরে পাক-ভারত-নেপালের যে মানুষেরাএই পাহাড়গুলোতে থাকত, তাদের কি শারীরিক সামর্থ্যের অভাব ছিল?

যেশেরপাদের সাহায্য নিয়ে হিলারি প্রথম এভারেস্টে উঠলেন সেই শেরপাদের কি ক্ষমতা ছিল না চূড়াগুলো জয় করার? বাংলাতে শয়ে শয়ে কবিতা আর গান রচিত হল যে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিয়ে সেটাতে চড়ার শখ কেন হল না বাঙালীদের? হয়ত, আমরা উপমহাদেশের মানুষেরা শান্তশিষ্ট প্রকৃতির – ডানপিটেমো একেবারেই ভালবাসিনা।অথবা হয়ত পাহাড়ে চড়া মানে পাহাড় বিজয়, এবং এটা না করতে পারলেমানবজন্ম বৃথা যাবে, জাতি হিসেবে আমরা খুবই তুচ্ছ, নগণ্য, ছোট হয়ে যাব – এই বোধ কখনও আমাদের মননে আসেনি। যবে থেকে পশ্চিমারা এসে আমাদের পাহাড়ে চড়ে 'পর্বত জয়' করে গিয়েছে তবে থেকে আমাদেরবোধোদয় হয়েছে – পাহাড়ে না উঠলে যে জাতে ওঠা যাচ্ছে না। যখন হিমালয়কে পদানত করে দেবালয়ের অস্তিত্বহীনতাকে প্রমাণ করে দিল ম্লেচ্ছ সাহেবরা, তখন মান বাঁচানোর জন্য তো পর্বতবিজয় অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল।

আমাদের আদর্শ সাদা চামড়ার মানুষেরা, তাদের মত হওয়ার জন্য আমরা ফেয়ার এন্ড লাভলি ঘষে গায়ের রঙ অবধি বদলে ফেলতে চাই – পেশীশক্তি প্রমাণের জন্য যে পাহাড় বাইব সেটাও ভারী যুক্তিযুক্ত। বঙ্গবাজারে দু'শ টাকায় নাইকির 'আসল' জুতা পাওয়া যায়। আমরা যখন কোন কিছুকে নকল করব, তখন যত ভালভাবে নকল করা যায় ততই ভাল। পশ্চিমারা দুর্গমগিরি লঙ্ঘন করে জাতি হিসেবে গর্বিত হয়েছে। আমরা সেই গর্ববোধ নকল করার প্রচেষ্টায় ৪৭তম হয়েছি। এ প্রাপ্তি কম কিসের?

পুরনোদিনে সরিষা ভাঙা হত ঘানিতে। সেখানে যে বলদটি দিনমান একই অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরে ফিরত তার চোখে পরিয়ে দেয়া হত ঠুলি। বলদ নিশ্চিন্তমনে, আনন্দচিত্তে ঘুরপাক খেতে থাকত। আধুনিক সমাজেরশোষণকাঠামোতে বলদের বদলে মানুষ জুড়ে দেয়া হয়েছে। এদের চোখে ঠুলি হিসেবে পরানো হয়েছে মিথ্যা গর্ববোধ। বাংলাদেশী মেয়ে নিশাত এভারেস্ট বিজয় করেছে –আহা কি আনন্দ! বাংলাদেশী সাকিব আইপিএলে ঝড় তুলেছে – আহা এত গর্ব রাখি কোথায়? বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত সিলটি ফুরী ব্রিটেনে এমপি হয়েছে – পাটা মাটিতে পড়েইনা। এদিকে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পুলিশের মার খেয়ে মারা যাচ্ছেন, তাতে আমাদের ভাববিকার নেই। মন্ত্রীর দুর্নীতি ধরা পড়ায় ড্রাইভার বেচারা গুম হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ তো আগেই হচ্ছিল, প্রাক্তন সন্ত্রাসী, দাপুটে রাজনীতিক রাত-দুপুরে হাওয়া হয়ে গেল! আর তার প্রতিবাদে আরেক ড্রাইভারের জ্যান্ত দেহ দাহ করা হল

গাড়ীসমেত। আমার বাবা গ্রামে ফুলকপি চাষ করে তার খরচটুকুও তুলতে পারেননা, আর এদিকে ঢাকায় কাঁচাবাজারে গেলে মুখ কাল করে ফেরেন।

চলছে জনগণ গাধার মত। কাধে ঋণের বোঝা, পিঠে পেটমোটা মন্ত্রী আর আমলার দঙ্গল। খালি চোখের সামনে প্রাপ্তির মূলো – সমুদ্রসীমা জয়, এভারেস্ট বিজয়, দৌড়া – বাংলার বাঘ আইল! একি যা তা মূলো? এ আমাদের জাতীয় অহংকার! শিক্ষিত উচ্চ আর মধ্যবিত্তের মাথায় ঢুকল:খাও-দাও-ফুর্তি কর, এ দেশের অসামান্য সন্তানদের কৃতিত্বে গর্ববোধকরতে থাক। আর সাধারণ মানুষের দুষ্কৃতিতে কষে গালি দিয়ে বল – 'শালার চোরের দেশে সব শালাই চোর''।

আমরা বন্ধুরা মিলে যখন বেড়াতে যেতাম, তখন মূল উদ্দেশ্য থাকত ঢাকার দমবন্ধ করা আটপৌরে জীবন থেকে মুক্তি নেয়া। প্রকৃতির কাছাকাছি হওয়া, তার সৌন্দর্যটা দুচোখ ভরে দেখা। আজ যখন সুরা নাবায় 'জান্নাতুন আলফাফা' বা ঘন সবুজ উদ্যান কথাটা পড়ি তখন মনেরপর্দায় ভেসে যায় শঙ্খনদীর দু'তীরের ছবিগুলো। আমাদের এই সমস্ত ঘুরে বেড়ানো থেকে জাগতিক কোন লাভ হয়নি, বরং জমানো টাকা খরচ হয়েছে। এ ভ্রমণ থেকে কি লাভ হয়েছে সেটা শীশা-লাউঞ্জে বসে মাস্তি করতে থাকা তরুণদের বোঝানো যাবে না। থাইল্যান্ডে ত্রিশ হাজার টাকায় বডি ম্যাসেজ করতে যাওয়া ধনকুবেররা বুঝবেনা নৌকা ভাড়া বাঁচাতে নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে রুমাবাজার পর্যন্ত হেটে এসেও ক্লান্ত এগার জোড়া পা মসজিদে জামাতে দাঁড়িয়েছিল কি জন্য। কারো কোন ভাল কাজ দেখে নিজের সেটি করার ইচ্ছা জাগাকে বলে অনুপ্রেরণা। অন্যের কোন অর্থহীন কাজকে নিয়ে আত্মতৃপ্তি বোধকে বলে বোকামো।

ন'টা-ছ'টা অফিস শেষে তিন ঘন্টা রাস্তায় বসে জীবন কাটিয়ে দেয়া মানুষের পঙ্গপালকে বোঝানো খুব কঠিন যে জীবন মানে কি। এরা এক বিশাল নগরীতে পানি-বাতাস ছাড়াও যে কোন মূল্যে আঁকড়ে পড়ে থাকাকেই জীবনের সফলতা মনে করে। এরা হয়ত কখনও বুঝবে না ফাই-ফরমাশ খাটা পিওনটার চেয়ে একজন পাহাড়ী জুম চাষী অনেক সজীব জীবন যাপন করে। সে নীল আকাশ দেখে, সাদা বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়, আঁজলা ভরে শীতল স্বচ্ছ পানি পান করে। গবাদিপশুর মত জীবন যাপন করে যাওয়া নাগরিকের ইচ্ছে নেই দুনিয়াটা দেখতে চাওয়ার – বুকে সাহস নেই জমানো টাকাতে হাত দেয়ার, দেহে হিম্মত নেই বনের

পথে মাইলকে মাইল হেটে বেড়ানোর। আরে হাটতেই যদি রাজী ছিলাম তাহলে কি মহাখালি থেকেমোহাম্মদপুর, এক ঘন্টার পথ তিন ঘন্টা বাসে বসে থাকি? আমাদের শহুরে মধ্যবিত্তের জন্য তাই পাহাড় জয়ের গল্প ঔষধ হিসেবে কাজ করে। যে ঔষধ জাতির একজন খেলে বাকি সবাই ঔষধপানকারীর সুস্বাস্থ্য কামনার মাধ্যমে আপন কর্তব্য থেকে ভারমুক্ত হয়। ‘মাথায় ছোট বহরেবড় বাঙালি’ সন্তানের উপযুক্ত ঔষধ বটে!

একজন নারীর যে মাহরাম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া ভ্রমণ করা অনুচিত সেই ইসলামী জ্ঞান বিতরণ করব না। চলার পথে আরোহণকারীরা মুসলিম হিসেবে দাবী করার ন্যূনতম কর্তব্য – দৈনিক পাঁচবার সলাত আদায় করেছেন কিনা সে প্রশ্নও তুলব না। মাউন্টেনিয়ারিং এর মত ব্যয়বহুল ক্রীড়া আমাদের মত ছাপোষা গরীব জাতির পোষায় কিনা সে তর্কেও যাবনা। IPL এর অনুকরণে BPL করে যখন সাদা চামড়ার অতীত প্রভুদেরটেক্কা দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি সেখানে মাউন্টেনিয়ারিং আর কি দোষ করল? এক রঙের ঠুলি পরে থাকতে আর কত ভাল লাগে? বলদ বলে কি আমরা মানুষ না?

কোন একটা কঠিন কাজ করার প্রচেষ্টা, সেটা করার জেদ থাকা এবং শেষমেশসফল হওয়া অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু সে কঠিন কাজটা অর্থবহ হলে ভাল হয় না? মানুষ যখন অভিনন্দনের প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে তখন বোন নিশাত মজুমদারের একটা উক্তি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে –

> “একটা প্রশ্ন খালি ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মনের মধ্যে। কেন মানুষ এতোকষ্ট করে পর্বতারোহণ করে। আমি এর কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। এতো কষ্ট করে কি দরকার পর্বতারোহণ করার। তো এভারেস্টের শীর্ষে পা রেখে সেই প্রশ্নটার কি কোন উত্তর পেয়েছেন? এর জবাবে নিশাত বলেন, এখনও নিজেকে সন্তুষ্ট করার মতো উত্তর পাইনি।”

এভারেস্টের তথাকথিত বিজয় এবং সেটা নিয়ে মানুষের আদিখ্যেতাতে মনে হচ্ছে এটাই বুঝি মানবজনমের সাফল্যের মাপকাঠি। আমরা বিনোদনেরজন্য যা করি সেটা জীবনের অনুষঙ্গ হলেও কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। যারা ক্রীড়া-কৌতুককে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছেন তারা কি ভেবে দেখেছে মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

পুরস্কার, সম্মাননা আর তথাকথিত জনগণের ভালবাসা মরার পরে আসলেকি কাজে লাগে? ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা নামের মূল্য কত? প্রকৃতিকে আবিষ্কার করা মানে তাকে হারিয়ে দেয়া নয়, তাকে চেনা – তার স্রষ্টার ক্ষমতার বিশালত্ব উপলব্ধি করা। এভারেস্ট বিজিত হয়েছে এই মিথ্যা গর্ববোধ সেই উপলব্ধি আনবে না। কারণ এ কাজটি করতে হবে প্রত্যেক মানুষকে, একাকী, ব্যক্তিগতভাবে। কারো হয়ত জানালা দিয়ে গলে আসা এক চিলতে চাঁদের আলো চেয়ে দেখলেই চোখটা খুলে যাবে। কারো চোখ খুলবে কুয়াকাটায় সূর্যাস্ত, বগার নীল হ্রদ কিংবা শুভলং এর ঝর্ণা দেখে। আর যারা চোখ খুলতে নারাজ তারা মিথ্যা আত্মতৃপ্তি নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে।

আল্লাহ যেন আমাদের চোখের ঠুলিটা খুলে ফেলে তার দুনিয়াটা দেখার সামর্থ্য দেন। আল্লাহ যেন আমাদের মিথ্যা বিজয়ের আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি দিয়ে সত্য বিজয়টা উপলব্ধি করার তৌফিক দেন। আমিন।

৩০ জমাদাউস সানি, ১৪৩৩ হিজরি।

কনি ২০১২

জোসেফ কনি একজন ভয়াবহ খারাপ মানুষ – সে শিশুদের অপহরণ করে, তাদের ব্রেন-ওয়াশ করে হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং বেপরোয়া খুনী হিসেবে তৈরী করে। মেয়েশিশুদের সে ব্যবহার করে যৌন দাসত্বের জন্য। আন্তর্জাতিক অপরাধী আদালতের তালিকায় এক নম্বরে থাকা এই মানুষ নামের পশুটিকে আমি চিনতাম না, চিনলাম 'ইনভিজিবল চিলড্রেন' নামের একটা সংগঠনের মাধ্যমে যাদের দাবী কনিকে গ্রেফতার করে বিচার করতে হবে। সংগত কারণেই আমি দাবীটির সপক্ষে।

উনত্রিশ মিনিটের যে ভিডিওটির দর্শকসংখ্যা আজ ১৭ই মার্চ, ২০১২ তে দশ কোটি ছুই ছুই, তাতে অনেক কিছুই বলা হয়েছে, আবার অনেক কিছুই বলা হয়নি। যা বলা হয়নি তার মধ্যে খুব ছোট্ট একটা বিষয় হল কিভাবে শিশুদের এমনভাবে 'ব্রেন-ওয়াশ' করা সম্ভব যে তারা তাদের নিজেদের বাবা-মাকেপর্যন্ত হত্যা করতে পারে। বলা হয়নি কারণ তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে যে জোসেফ কনি অত্যন্ত গোঁড়া একজন খ্রীষ্টান যে নিজেকে হলি স্পিরিটের মাধ্যম, অর্থাৎ সাদা বাংলায় 'নবী' বলে দাবী করে। তার দলের নাম 'লর্ডস রেসিসট্যান্স আর্মি' যাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য এমনএকটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যেখানে বাইবেলের দশটি কমান্ডমেন্ট অনুসারে রাষ্ট্র শাসিত হবে!

এটা অবশ্য না বলার কারণও আছে; ডকুমেন্টারিতে অভিনয়কারী জ্যাসন রাসেল একজন ধর্মপ্রাণ ইভাঞ্জেলিকাল খ্রীষ্টান। সুতরাং সে লর্ডের নাম নিয়ে গড়া সৈন্যদলের সাথে খ্রীষ্টান ধর্মের মিল খুঁজে পাবে না এটাই স্বাভাবিক। তবে ইনভিসিবল চিলড্রেনের বানান পোস্টারে জোসেফ কনি আর হিটলারের মাঝের ছবিটা ওসামা বিন লাদেনের। সদ্য মৃত এই ভদ্রলোক ঠিক কি নৃশংসতা দেখিয়ে এ দু'জনের মাঝে জায়গা করে নিল তার কোন প্রামাণ্য ছবি বা ভিডিও আমরা আজো পাইনি। এমনকি মহান যুক্তরাষ্ট্র তার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করেও এখনও কোন সন্দেহাতীত প্রমাণ আনতে পারেনি যে বিন লাদেনই টুইন টাওয়ার ধ্বংস করেছিল। সন্ত্রাস ইসলামের একচেটিয়া ব্যাপার। পৃথিবীর সব সন্ত্রাসী হয় ধর্মহীন নয়ত মুসলিম, তাই তো?

যাকগে ছোট মুখে বড় বড় কথা বলা সাজে না। হালুয়া রুটির অধিকার সবার আছে। কেউ যদি 'কনিকে ধর' - এ কথা প্রচার করে 'হাতের রাখী' বিক্রি করে কিছু ডলার কামাই করে, করুক না। আমি কেবল ভাবি, এই যে আফ্রিকাতে মারামারি হচ্ছে এত – ওরা অস্ত্র পায় কোথা থেকে? রাইফেল তো আর গাছে ফলে না, বুলেটও আকাশ থেকে বর্ষিত হয় না। এগুলো তৈরী হয় কোথায়, আর কাল মানুষেদেরই বা হাতে আসে কোথা থেকে। আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যের খুনখারাবি যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে কাদের? 'মানুষ মানুষকে মারবে' – এর উপর ভিত্তি করে হালুয়া-রুটি জোটে কাদের?

'লর্ড অফ দ্য ওয়ার' ছবির শেষ অংশে আমরা নিকোলাস কেজকে দেখি অস্ত্র এবং মাদকপাচার দুই অপরাধ থেকেই ছাড়া পেতে। কারণ তার মত মানুষ না থাকলে তথাকথিত সভ্য উন্নত বিশ্বের সরকারগুলোর অস্ত্র ব্যবসার কথা ফাঁস হয়ে যাবে যে! আমেরিকানরা ইয়েমেন সরকারকে অস্ত্র দেবে, চীন দেবে লিবিয়াকে, রাশিয়া দেবে সিরিয়াকে, ফ্রান্স আর ইংল্যান্ড দেবে আফ্রিকার দেশগুলোতে। তারপর দিনশেষে এরা ইনভিসিবল চিলড্রেনের ত্রিশ ডলারের একশন কিট কিনে বলবে – ধর ধর কনিকে ধর, মানবতাকে রক্ষা কর।

As a bar chart | As a pie chart

Arms sales (agreements), by Supplier, 2003-2010 (in billions of constant 2010 U.S. dollars)

Supplier	Total Sales in US Dollars (billions)	Percent of total sales
United States	170.764	39%
Russia	81.059	18%
France	37.4	8%
United Kingdom	29.803	7%
China	15.272	3%
Germany	22.807	5%
Italy	15.134	3%
Other European	47.024	11%
Others	23.654	5%

1সূত্র: http://www.globalissues.org/article/74/the-arms-trade-is-big-business#GlobalArmsSalesTrends2003-2010

কী অদ্ভুত এক সভ্য জগতে বাস করছি আমরা, তাই না?

২৫ রবিউস সানি, ১৪৩৩ হিজরি।

ডেভিল'স এডভোকেট

রোমের ক্যাথলিক চার্চের অনেকগুলো 'দৈবিক' কাজের মধ্যে একটা হল মহৎ মৃত খ্রীষ্টানদের 'সাধু' হিসেবে ঘোষণা দেয়া। এখন বললেই তো একটা মানুষকে 'সাধু' ঘোষণা দেয়া যায় না, কিছু নিয়ম-নীতি তো রক্ষা করতে হয়। চার্চ কাউকে দায়িত্ব দিত মৃত মানুষটির দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করতে, তার অলৌকিক কাজ কর্মের ভূয়াত্ব প্রমাণ করতে। যে লোকটিকে এই অপ্রিয় কাজ করার দায়িত্ব পেত, তার নাম হত ডেভিল'স এডভোকেট। সাধারণ কথ্য ইংরেজিতে অবশ্য কথাটার মানে প্রতিপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে আপন মতের বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক পেশ করা।

আমার জীবনটাকে তিনটা মোটা দাগে ভাগ করা যায়, ২৩-২৪ বছর বয়স অবধি আমি ইসলাম বুঝতাম না তাই গতানুগতিকভাবে মানতাম । তারপরে আল্লাহ আমাকে ইসলাম শেখা ও বোঝার সুযোগ দিলেন। বর্তমান পর্যায়ে এসে দেখলাম ইসলাম বুঝে চুপ করে মানার উপায় নেই – কারণ ইসলাম মানতে হলে সেটার পক্ষে কথা বলতে হবেই। সমস্যাটা হল, যখন আমার কথাগুলো ইসলামের পক্ষে হবে, অবধারিতভাবে সেটা অন্য কোন কিছুর বিপক্ষে হবে।

আদর্শের ক্ষেত্রে বিরোধী মতকে সহ্য করতে না পারার বৈশিষ্ট্যটা মানুষের চরিত্রের গভীরে প্রোথিত আছে। আমারও আছে। কিন্তু ইসলাম মানার কারণে অসহনশীলতাটাকে আমি উদ্দাম ছেড়ে দিতে পারিনা, আমার প্রকাশভঙ্গিকেও ইসলামের অনুগতই করতে হয়। ফলে কেউ আমাকে নোংরা একটা গালি দিলেও আমি তাকে আরেকটা নোংরা গালি দিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারি না, অপমানের জবাবে অপমান করতে পারি না। এহেন পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করলাম আমার বেশ কাছের কিছু মানুষ কিভাবে জানি অনেক দূরে সরে গেল। যাদের যুক্তিবোধ, সততা এবং মেধাকে আমি সম্মান করতাম তারা এমন আচরণ করতে থাকল যার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই । আমার একসময়ের আদর্শিক সহযোদ্ধারা রাশি-রাশি ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগল কিন্তু খোলা মন নিয়ে সুস্থ আলোচনায় বসল না। মজার ব্যাপার হচ্ছে 'মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি' থেকে হঠাৎ 'রাজাকার' কিংবা 'উগ্র চরমপন্থী' আমি একা হইনি, এরকম ছাপ আরো অনেকের গায়েই লাগতে দেখেছি।

বাংলাদেশের সুশীল ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ অপছন্দনীয় কথা বলার দোষে 'সাম্প্রদায়িক মৌলবাদের' ছাপ মেরে দেবার আগে যদি একটু ভদ্রতা করে একজন ডেভিল'স এডভোকেট নিয়োগ দিত তাহলে কেমন হত? সুশীল সমাজের গড'স এডভোকেট, সচলের সাথে ডেভিল'স এডভোকেট মুসলিমের এই কথোপকথনটা কাল্পনিক হলেও সত্য খোঁজার একটা চেষ্টা মাত্র –

সচল: তুমি ধর্মান্ধ মৌলবাদী সন্ত্রাসী।

মুসলিম: যদি দয়া করে আমার করা অপরাধের একটা তালিকা দিতেন – কতগুলো খুন, জখম, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই করেছি তা জানালে আমার সন্ত্রাসী সত্ত্বাটাকে আবিষ্কার করতে পারতাম।

সচল: তুমি আমাদের স্বর্ণশাসনের ভয়ে কিছু করছ না, সুযোগ পেলে ঠিকই করতে।

মুসলিম: কেউ যদি কবিতা না লেখে, তবে ভবিষ্যতে লিখলেও লিখতে পারে – এই যুক্তিতে কি তাকে কবি বলা যায়? বাবা বাচ্চাকে হুমকি দেয় – 'মিথ্যা বললে একদম জানে মেরে ফেলব', তার মানে কি বাবা বাচ্চার খুনী?

সচল: তুমি ইরাক আর আফগানিস্থানের তালিবানদের জিহাদ সমর্থন কর না?

মুসলিম: আপনি এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেন না? ৭১ সালে পাকিরা এসে আমার মামাকে মারল, বাড়ির মেয়েদের তুলে নিয়ে গেল, যাওয়ার সময় ঘরে আগুন দিয়ে গেল তখন আমার মামা-চাচারা যুদ্ধ করেছেন। মানুষরূপী শয়তানরা যখন পাকিস্তান থেকে ঝাপিয়ে পড়ে তখন তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নাম হয় মুক্তিযুদ্ধ আর যখন আমেরিকা বা ভারত থেকে আসে তখন রুখে দাঁড়ালে সেটা হয় সন্ত্রাস? কেউ যদি দেশের মানুষকে সাম্রাজ্যবাদীদের গোলামী থেকে মুক্ত করতে, বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবে বলে যুদ্ধ করে সেটা কেন সন্ত্রাস হবে? আফগান-ইরাকিরা কি আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকানদের মারছে? ওদের দেশ দখল করতে এসেছে, ওরা মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে - এটা সন্ত্রাস কেন হবে? ভিয়েতনামীরা তো একই কাজ করেছে, তাদের তো কেউ সন্ত্রাসী বলেনি।

সচল: বড় বড় কথা কম বল, তুমি নিজেই তো কাফিরদের দেশ আমেরিকায় গিয়ে বসে আছ।

মুসলিম: আমি তো এখানে বোমাবাজি করছি না। কাফিরদের কাদের সাথে কিরকম ব্যবহার করতে হবে, কতটা শত্রুতা দেখাতে হবে এবং কিভাবে দেখাতে হবে সেটা ইসলাম আমাকে শিখিয়েছে। ইসলাম ক্ষেত্রবিশেষে কাফিরদের দেশে যাওয়ার, তাদের সাথে ব্যবসা করার, তাদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার অনুমতি দিয়েছে। যে তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলি তাদের দয়া নেই না । কাজ করি-পড়াই, যা বেতন পাই তা দিতে থাকি-খাই। অন্তত মুখে সাম্যবাদের বুলি ছেড়ে তলে তলে ডিভি লটারির জন্য আবেদন তো করি না।

সচল: এই যে তোমার কথাতেই প্রমাণ হয়ে গেল তুমি সাম্প্রদায়িক, কাফিরদের ঘৃণা কর।

মুসলিম: আপনি কি ঘুষখোরদের ভালবাসেন?

সচল: ঘুষখোরদের ভালবাসার কি আছে?

মুসলিম: আপনিও সাম্প্রদায়িক, ঘুষখোর সম্প্রদায়কে আপনি ঘৃণা করেন।

সচল: ঘুষখোর আর অমুসলিম এক হল কিভাবে? ঘুষ খাওয়া অন্যায়, অমুসলিম হওয়া নয়।

মুসলিম: ন্যায়-অন্যায় কি আপনি ঠিক করবেন? আপনার দৃষ্টিতে ঘুষ খাওয়া অন্যায়, অন্য অনেকের কাছেই ঘুষ খাওয়াতে দোষ নেই।

সচল: বললেই হল ঘুষ খাওয়াতে দোষ নেই । কে বলেছে ঘুষ খাওয়াতে দোষ নেই?

মুসলিম: ঘুষখোরদের দৃষ্টিতে ঘুষ খাওয়া খারাপ না, খারাপ হলে তারা তো খেত না।

সচল: ঘুষখোররা বললেই হবে? ওদের কি ঘুষ খেতে চাকরি দেয়া হয়েছে? কাজ করবে – পয়সা পাবে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিতে তো চাকরি দেয়া হয়নি।

মুসলিম: অমুসলিমরা বললেই হবে যে কাঠের ক্রুশ ক্ষমা করে দেয়, মাজারের পীর বিপদ থেকে বাঁচায়, মাটির মূর্তি বিদ্যা দেয়! পৃথিবীতে পাঠান হয়েছে এক আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য, মরা মানুষ আর জড় বস্তুকে আল্লাহর জায়গায় বসানোর জন্য না।

সচল: কিন্তু এটা তো তোমাদের বিশ্বাস, তারা অন্য কিছুতে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাসে আঘাত করার অধিকার তোমার নেই।

মুসলিম: ঘুষখোরেরা মনে করে তারা মানুষের কাছ থেকে টাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করে দেশ ও সমাজের উপকার করছে, তাদের বিশ্বাসেও আঘাত করার অধিকার আপনার নেই।

সচল: অবশ্যই আছে, যেটা অন্যায় – সেটার বিপক্ষে অবশ্যই আমি কথা বলব।

মুসলিম: আমারও তাহলে অধিকার আছে আমি যেটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জঘন্য পাপ মনে করি সেটার বিরুদ্ধে কথা বলার।

সচল: শোন এটা সেকুলার দেশ, কোন ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার তোমার নেই। এখানে সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে – কেউ বাধা দিতে পারবে না।

মুসলিম: কই, এই যে আপনি বাধা দিচ্ছেন।

সচল: আমি কোথায় বাধা দিলাম? আমি তো তোমাকে বাসায় নামায পড়তে মানা করিনি, দান খয়রাত কর, আল্লাহু আল্লাহু জিকির কর। খালি মুখে দাড়ি রেখে জংলি সেজে থাকা আমার ভাল লাগে না। আর এই ঢলঢলা কাপড় আমার কাছে খুব খ্যাত লাগে। আর অসহ্য লাগে মেয়েদের ঢেকেঢুকে চলা । ইসলামের এই সব রক্ষণশীলতা খুবই বিরক্তিকর।

মুসলিম: সর্বনাশ, ইসলাম তো একটা জীবন বিধান। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ইসলাম ঘুমাতে যাওয়ার লুঙ্গি, বাইরে আসার সময় ওটা খুলে আলনায় ভাজ করে রেখে আসতে হবে। সামাজিক জীবনে ইসলাম অবশ্যই পালন করতে হবে। আর ইসলামের কথা মানুষকে বলতে হবে, মিথ্যা মাবুদের ভিত্তিহীনতা অবশ্যই মানুষকে জানাতে হবে। তাদের সাবধান করতে হবে, তারা যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক করে তবে তার শাস্তি অনন্তকালের আগুন। আর যদি তারা এক আল্লাহর ইবাদাত করে রসুলের দেখান পদ্ধতিতে তবে তারা

অসীম সময়ের জন্য সুখ-শান্তিতে থাকবে - এ কথাগুলো বলা আমাদের জন্য ফরয, অবশ্য কর্তব্য। এটা ইসলাম পালনের অংশ।

সচল: এই যে আবার প্রমাণ হয়ে গেল তোমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শত্রু, তোমরা অসহনশীল।

মুসলিম: মিথ্যা ইলাহের বিরুদ্ধে কথা বলা যদি অসহনশীলতা হয় তাহলে, তাহলে মুসলিম হিসেবে ইসলাম প্রচারের অধিকার কেড়ে নেওয়া কি ধরণের সহনশীলতা?

সচল: শোন, আমি জানি তুমি আসলে কি চাও। তুমি ১৪০০ বছরের পুরনো বর্বর শরীয়াহ আইন চালু করতে চাও।

মুসলিম: তাহলে সমাজ চলবে কোন আইনে? তিনশ বছর আগের ইংরেজদের আইনে? যাদের আইনে ছিল নীল চাষ অস্বীকারকারী কৃষকদের ধরে নিয়ে পেটালে, তাদের স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করলেও ইংরেজ সাহেবদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। যে ইংরেজরা এদেশে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বুনেছিল, যারা এদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করেছে – তাদের আইনে? যারা অর্ধেক পৃথিবী নির্লজ্জভাবে শোষণ করেছে এবং শোষণ করাকে আইন বানিয়ে জায়েজও করেছে সেই আইনে? সেই আইনে যাতে খুনিকে করদাতাদের টাকায় বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো হয়; আর যে খুন হল, তার পরিবার না খেতে পেয়ে মারা যায়?

সচল: না, আমরা নিজেরা আমাদের আইন করব।

মুসলিম: বর্তমান সংসদের দশ জন সৎ রাজনীতিবিদের নাম বলেন।

সচল: হাঃ হাঃ, ‘সৎ’ রাজনীতিবিদ! ভাল কৌতুক করলে।

মুসলিম: আইন পাশ হতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগে। যারা নিজেরা চুরি করে তারা করবে চুরির বিরুদ্ধে আইন? যারা সংসদে না এসেও ঠিকই বেতন নেয়, দামী গাড়ীর জন্য লাইন দেয় তারা করবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইন? যাদের ক্যাডারবাহিনী দিনে দুপুরে চাঁদাবাজি করে তারা করবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আইন? যারা পুলিশ লেলিয়ে মানুষ পিটিয়ে মারে তারা করবে

মানুষ হত্যার আইন? তারপর সেই আইনে সই করবে কে? 'মহামান্য' রাষ্ট্রপতি? সেই রাষ্ট্রপতি যে তিনটা খুনের শাস্তি পাওয়ার পরেও ফাঁসির আসামীকে নিজের দলের হওয়ায় ক্ষমা করে দেয়?

সচল: আস্তে আস্তে মানুষ সচেতন হবে। ভাল মানুষেরা ক্ষমতায় যাবে।

মুসলিম: সংসদে ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়ছে। পকেটে যার টাকা নাই, সংসদে তার জায়গাও নাই। মানুষ কাল টাকা কামাই করবে আর সংসদে এসে সেটা সাদা করার ব্যবস্থা করবে। গরীব মানুষকে চুষে আরো গরীব বানাবে। ভোটের সময় দু'শ টাকা ধরিয়ে দেবে সেই লোকটার হাতে যে দু'দিন ধরে না খেয়ে আছে। তিন বেলা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে পেট পুরে ভাত খেতে পারবে বলে সে গিয়ে ভোট দিয়ে আসবে কালো টাকার মালিককেই। আর এদিকে আপনার মত মানুষেরা বড় বড় কোম্পানির চাকরি করবেন নাইলে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে যাবেন। আর মায়াকান্না কাঁদবেন – দেশ গেল, দেশ গেল। কেন যে আমরা এদের ভোট দেই।

সচল: আমাদের সিস্টেমটা বদলাতে হবে।

মুসলিম: জ্বি, আমরাও সেই কথা বলছি – মানুষের বানান গণতন্ত্রের মিথ্যা সিস্টেম ছেড়ে আল্লাহর দেয়া সিস্টেম আনতে হবে। যেখানে নেতারা আল্লাহকে ভয় আর মানুষের সেবা করবে। জনগণও আল্লাহকে ভয় করবে। কাউকে কারো বেডরুম পাহারা দিতে হবে না। পরকালে শাস্তির ভয়ে কেউ কারো জীবন বা সম্পদের উপরে হামলা করবে না।

সচল: গণতন্ত্র বাদ দিয়ে মানে? তুমি দেশটাকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাতে চাও নাকি?

মুসলিম: আমি আমার সহ সকল মানুষের জীবনে ইসলাম কায়িম করতে চাই। সমাজ বা রাষ্ট্র সেটারই একটা অংশ, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য না। ক্ষমতা নিয়ে সরকারে গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা আমাদের নাই। আম্রা চাই যে

রাজনীতিবিদেরা ইসলাম বুঝে নিজেদের বদলে ফেলবে। মেজর আর জেনারেলরা ইসলামের সৌন্দর্য আর আত্মত্যাগ বুঝে নিজেরাই একটা মুসলিম সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে। সাংবাদিকরা ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করবে। শিক্ষকরা

বিজ্ঞান আর ব্যবসার পাশাপাশি ইসলাম শিখবে,

ছাত্রদের শেখাবে। ব্যবসায়ীরা সুদ ছেড়ে দেবে,

ঘুষ দেয়া বন্ধ করবে। আমরা মানুষের পরিবর্তন চাই না, মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন চাই।

সচল: মিথ্যা কথা। তুমি হিজবুত তাহরির, তুমি শিবির।

মুসলিম: আপনি কি শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া সমর্থন করেন?

সচল: অবশ্যই! এটা আমাদের জাতীয় মর্যাদার ব্যাপার।

মুসলিম: আপনি তাহলে জামায়াতে ইসলামি করেন।

সচল: কে? আমি? ছি! ছি! এ বড় স্পর্ধা তোমার!

মুসলিম: দেখেন আগের সরকারের জামায়াতে ইসলামির মন্ত্রী শহীদ মিনারে ফুল দিয়েছে। আপনি সেটা সমর্থন করেন মানে আপনি জামাত করেন।

সচল: কি পাগলের যুক্তি! ওদের একটা ঠিক কাজ সমর্থন করা মানে ঐ দল করা হল কিভাবে?

মুসলিম: তাহলে আপনার যুক্তিটাও পাগলের যুক্তি, হিজবুত তাহরির ইসলামি আইন চায়, আমিও চাই, তার মানে আমি ঐ দলের সদস্য? তাহলে আমাকে এ রকম শ'খানেক তথাকথিত ইসলামিক দলের সদস্য হতে হবে যারা একে অপরকে দেখতে পারেনা। আমি মুসলিম। শিবির/তাবলীগ/হিজবুত তাহরির – কোন কিছুই না। শুধুই মুসলিম।

সচল: আরে মুসলিম তো সবাই, এই আমিও গত ঈদে নতুন পাঞ্জাবি পড়ে নামায পড়তে গেছি।

মুসলিম: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর হিসেবে মুসলিম অনেকেই কিন্তু আল্লাহর হিসেবে মুসলিম কারা সেটা আল্লাহর কাছ থেকে শুনে নিন –

> যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?[44]

আল্লাহ যেন আমাদের সত্যিকার মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করার সুযোগ দেন। আমিন।

১৫ রবিউস সানি, ১৪৩৩ হিজরি।

44 সুরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৩

আনাসের জন্য

প্রিয় আনাস,

যখন দেশ ছেড়ে আসি তখনও তুই কথা বলতে পারতি না আর তোর ছোট ভাই উমার পৃথিবীতেই আসেনি। এখন তুই ফোনে 'বাবা', 'বাবা' বলে ডাকিস, তোর সাথে খেলা করার ঝাপসা ভিডিওটা দেখে কাঁদিস। ঠিক তোর মত সিরিয়ার হোমসে একটা বাচ্চা এভাবেই তার বাবাকে ডাকতে থাকে, বাবার সাথে খেলবে বলে কাঁদতে থাকে। হয়ত ও একদিন বড় হবে, বুঝবে কেন তার বাবাকে চলে যেতে হয়েছিল পৃথিবী ছেড়ে। মানুষেরা সহজে সন্তানদের ছেড়ে যায় না। কর্তব্য বলে অনেক বড় একটা জিনিস যখন ডাক দেয়, তখন না গিয়ে পারা যায় না। তবে কর্তব্য শুধু দেশ বা সমাজের প্রতি না, সন্তানের প্রতিও থাকে। তোর প্রতি আমার সে কর্তব্যবোধের তাগিদেই এ চিঠিটা লেখা। সিরিয়ার ঐ বাবাটা বেঁচে নেই, যখন তোকে এ কথাগুলো বলার সময় হবে তখন যে আমি বেঁচে থাকব এমন কোন নিশ্চয়তাই নেই।

আনাস, তুই একজন মানুষ। মানুষ বলতে আসলে যে কি বোঝায় সেটা এমনি এমনি বোঝা যায় না, সময় করে সেটা নিয়ে ভাবতে হয়। পৃথিবীতে লক্ষ-কোটি ধরণের জীবন আছে – নানা রঙের, নানা গঠনের, নানা বৈশিষ্ট্যের। আশ্চর্য যে এত বৈচিত্র্য ধারণ করেও সবাই তৈরী হাতে গোণা কয়েক রকমের অণু-পরমাণু দিয়ে। কিন্তু একই বস্তু দিয়ে তৈরী হয়েও মানুষ আর সবার থেকে আলাদা। মানুষকে আস্ত খেতে পারে এমন হাজারও রকমের প্রাণী আছে, মানুষকে দৈহিক শক্তিতে হারাতে পারে এমন প্রাণীর সংখ্যা কোটিরও উপরে। কিন্তু তারপরেও মানুষ এদের সবার মাথার উপরে ছড়ি ঘোরায়। যার বলে ঘোরায় সেটার নাম আক্কল, বাংলায় 'বিবেক এবং বুদ্ধি'। মানুষের মত দেহের গঠন, অঙ্গের বুনন আর কোষের বিন্যাস হলেই কিন্তু তার বিবেক-বুদ্ধি থাকবে এমন কোন কথা নেই। তোর একজন বড় চাচা ছিল যে মাত্র আঠাশ বছর বয়সে মারা গেছে। সে সব দেখত, শুনত, কথাও বলতে পারত; কিন্তু কিছু বুঝত না, চিন্তা করতে পারত না। এদের সমাজ 'পাগল' বলে। কিন্তু যে মানুষ সুস্থ অথচ নিজের বিবেক-বুদ্ধির দিকে তাকানোর সময় পায় না, সেটা নিয়ে ভাবার সময় পায় না, সে দেখতেই খালি মানুষের মত; আসলে তার আর পশুর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

আনাস, তুই যেহেতু পশু না, পাগলও না, তাই তোকে ভাবতে হবে নিজেকে নিয়ে। তোর বিবেক আর বুদ্ধি ব্যবহার করে তোকে বের করতে হবে তুই কে, এই পৃথিবীতে তুই কেন এসেছিস। মানুষ হিসেবে এ ভাবনাটা সবারই ভাবা উচিত ছিল। রক্ত-মাংশে গড়া মানুষ কেন রক্ত-মাংশে গড়া অন্য পশুদের থেকে আলাদা - সেটা যদি তুই না ভাবিস তাহলে অব্যবহৃত এই বিবেক-বুদ্ধিই একদিন তোকে বড় বিপদে ফেলে দেবে।

আনাস, তোর শরীরের কোষগুলোতে যে ডিএনএ আছে, তার অর্ধেক আমার থেকে এসেছে, বাকি অর্ধেক তোর মা'র কাছ থেকে। এই ডিএনএ অণুগুলোকে ইচ্ছেমত মিশিয়ে তোর এই সত্ত্বাটাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আল্লাহ। তোর দেহের অণু-পরমাণুগুলোকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীর কিছু তুই খালি চোখে দেখতে পারিস যেমন আমাদের বাসার সামনের বিশাল মাঠটা বা একে ঘিরে থাকা গাছগুলো। আবার কিছু আছে যা তুই কোনভাবে দেখতে পারবি না যেমন যে শক্তিটার কারণে তুই লাফ দিয়ে ছাদ ছুতে পারিস না – মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। মানুষ যেমন নিজে নিজেকে বানায়নি, তেমনি এই শক্তি বা বস্তুগুলোও কিন্তু নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। এর সব, সবকিছুই যিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে আমরা বলি আল্লাহ।

আল্লাহকে কিন্তু দেখা যায় না, আবার মাধ্যকর্ষণ শক্তির মত অঙ্ক করে প্রমাণও করে দেয়া যায় না যে এই যে আল্লাহ আছেন। আল্লাহকে উপলব্ধি করতে হয়, বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজে বের করতে হয়। যদি আল্লাহকে দেখা যেত তাহলে আমাদের সৃষ্টি করা মূল উদ্দেশ্যটাই মিথ্যে হয়ে যেত। তবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের সমস্যা কিন্তু আল্লাহর থাকা-না থাকা নিয়ে নয়, প্রত্যেকটা মানুষই নিজের মনের গভীরে এমন একটা সত্ত্বা, এমন একটা শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে যার কাছে সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। এই সত্ত্বার কথা কেউ স্বীকার করে, কেউ বাহাদুরি দেখাতে বাইরে বাইরে আল্লাহকে অস্বীকার করে। যে বোঝে না, তাকে বোঝান যায়, কিন্তু যে বুঝেশুনে বলে 'বুঝি না', তাকে শত বোঝালেও সেই একই কথা বলবে – 'বুঝি না। সুতরাং এমন নাস্তিকদের আল্লাহ আছে এই মর্মে প্রমাণ দেয়া বৃথা। কারণ যখনই কেউ স্বীকার করে নেবে যে মানুষসহ এ মহাবিশ্বের সবকিছু একজন সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন, তখনই প্রশ্ন আসবে কেন সৃষ্টি করেছেন। আর এই কেন'র যে উত্তরটা আসবে সেটা মানতে আপত্তি শুধু নাস্তিকদের না – পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই আছে।

আনাস, যখন তুই চিন্তা করে নিশ্চিত হবি যে মানুষ সহ এই পুরো মহাবিশ্ব একটা নিখুঁত পরিকল্পনাতে সৃষ্টি হয়েছে, একজন সত্ত্বাই সেই বিশাল পরিকল্পনা করেছেন এবং সে অনুযায়ী আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তখন তোকে ভাবতে হবে কেন তিনি এ কাজ করলেন। কোন উদ্দেশ্যে নিজেকে অদৃশ্য রেখে তিনি আমাদের এ পৃথিবীতে পাঠালেন? কেন তিনি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে পুরো পৃথিবীকে আমাদের অধীন করে দিলেন? বরফঘেরা আল্পস পর্বতকে ভেদ করে সুড়ঙ্গ তৈরী করল মানুষ, উত্তাল সমুদ্রের বুক চিরে ছোটখাট শহর নিয়ে পাড়ি দিল, নীল আকাশে মেঘের রাজ্যেরও উপরে ভেসে বেড়াতে লাগল মানুষ তার আক্কলের জোরে। এই আক্কল দিয়ে আমাদের ভাবতে হবে কেন এই পৃথিবীতে আসা, কেন কিছু সময় থাকা, কেন আবার চলে যাওয়া? কেউ একদিনও থাকার সুযোগ পায় না এই পৃথিবীতে, কেউ থাকে একবছর, কেউ চল্লিশ, কেউ একশ। কেন সময়ে বেধে দেয়া আমাদের? কিছু চান কি আল্লাহ আমাদের কাছে? কি চান তিনি যিনি সব কিছু সৃষ্টি করলেন? আমরা অতি তুচ্ছ মানুষেরা তাকে কি দিতে পারি?

আনাস, তোর মনে হতে পারে এত সব কঠিন দার্শনিক চিন্তা আমরা কিভাবে করব। আল্লাহ তাই আমাদের এত বুদ্ধি দেয়ার পরেও আমাদের মতই কিছু মানুষকে বেছে আমাদের কাছে পাঠালেন। এরা আল্লাহর দূত, তারা এসে আমাদের জানিয়ে দিলেন আল্লাহ কি চান আমাদের কাছে। শুধু জানানোই না, তারা নিজেদের জীবনের পাতায় পাতায় ছবির মত এঁকে গেলেন আল্লাহর আদেশ আর নিষেধগুলো। তারা আমাদের বোঝালেন আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা বিবেক খাটিয়ে আল্লাহকে খুঁজি, তাকে উপলব্ধি করি তারপর তাকে না দেখেই একমাত্র তার ইবাদাত করি। আমাদেরকে তিনি যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন সেটা যেন তার ইচ্ছার অনুগত করি। তাকে ভালবাসি, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হই। যদি আমরা সেটা করি তাহলে তিনি সীমিত এই সময়ে করা কাজগুলোর জন্য অসীম সময় ধরে আমাদের পুরষ্কৃত করবেন। আর আমরা যদি স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করি, তবে তিনি বিবেককে অগ্রাহ্য করার শাস্তি হিসেবে, অকৃতজ্ঞতার ফল হিসেবে অনন্তকালের জন্য শাস্তি দেবেন। তার পুরষ্কার যেমন অকল্পনীয় সুন্দর, তার শাস্তিও তেমনি কল্পনাতীত ভয়াবহ!

আনাস, এটাই মানুষের জীবন – একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়ে তার ভালোবাসা-আশা আর ভয়ের সাথে তার ইবাদাত করা। আর ইবাদাত করার অনুকরণীয়

হিসেবে তার শেষ দূত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করা। ‘লা ইলাহা ইল্লালাহ, মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’ – এটাই যেন তোর জীবনজোড়া উপলব্ধি হয়। এর ছায়া যেন তোর জীবনের সব ভাবনা, কথা আর কাজে পড়ে। এটাই মানবধর্ম, এর নামই ইসলাম। আল্লাহ সুবহানাহু যেন আমাকে, তোকে আর বিবেকবান সব মানুষকে মুসলিম হিসেবে গ্রহণ করে নেন। আমিন।

১৪ রবিউস সানি, ১৪৩৩ হিজরি।

কোথায় পাব তারে

আমি জীবনে যখন প্রথম ‘ক্রাশ খাই’, তখনও বাগধারাটার মানে জানতাম না। জানার কথাও না, কারণ বাগধারাটার মতই খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ‘ক্রাশ’ বেশ আধুনিক। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে মানুষ ‘ক্রাশ’ খাওয়া তো দূরের কথা ক্রাশ খাওয়ার সুযোগও পেত না। আমরা ফিরিঙ্গিদের দেখাদেখি সিনেমা-নভেল-নাটকের বরাতে সভ্য-ভব্য হয়েছি, পাৎলুন পরে শিল্প-ঐতিহ্য চর্চায় নেমেছি। শেষমেশ ঘরের কোণে এক বাক্সে বাঈজীখানা, থিয়েটার আর সিনেমা হল বন্দী করে সভ্যতার সুঁইয়ের মাথায় আরাম করে বসেছি। নব্বইয়ের দশকে আকাশ থেকে সংস্কৃতির বর্ষণ শুরু হবার পরে সেই সূচবৃষ্টি থেকে বাঁচে কার বাবার সাধ্য! তো রাস্তাঘাট থেকে বনেদি বৈঠকখানা, সকাল-সন্ধ্যা ‘এক লাড়কি কো দেখা তো এয়সা লাগা’ শুনে বড় হওয়া আমার জন্য যা অবধারিত ছিল, তাই হয়ে গেল। আমি ক্রাশ খেলাম।

ধর্ম মানি আর না মানি, ধর্মবোধটা আমার মধ্যে সবসময়ই টনটনে ছিল। বিড়ালতপস্বীদের কিভাবে হাত করতে হয় সেটা শয়তান ভালই জানে। অধিকাংশ ক্রাশের সূতিকাগার ‘স্যার’-এর বাসায় যে মেয়েটা আমার মনে ধরল তার মাথাসহ সারা গায়ে জড়ান ছিল বিশাল এক কাল চাদর।

সুন্দর চেহারার সাথে ধার্মিক চলন – আর কি লাগে? পড়ার বইয়ের চেয়ে জানালা দিয়ে আকাশের মেঘ দেখতে বেশী ভাল লাগা শুরু করল। সে সামনে দিয়ে হেটে যায় আর আমি নড়তেই পারিনা। মা লক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন – কাকে পছন্দ। বললাম। তিনি বললেন –

ক. তুই এখনও মেট্রিক পাশ। তোর কি এমন যোগ্যতা আছে যার কারণে মেয়েটা তোকে পছন্দ করবে? (মোটা চশমা আর গোল-গাপ্পু চেহারা নিয়ে আমি আশার কোন কারণ দেখলাম না)

খ. তোর পায়ে সমস্যা আছে। একটা মেয়ে চাইতেই পারে যে তার স্বামী খুঁড়িয়ে হাটবে না, আর দশজনের মত সুস্থ-নীরোগ হবে। (তিতা, কিন্তু সত্যি কথা। আমি লোহার পাত লাগান জুতা পরি, দৌড়াতে পারি না)

গ. যার মাধ্যমে তুই সত্যিকার যোগ্য হয়ে উঠতে পারবি সেটা হল লেখাপড়া। কিন্তু ইন্টারে প্রেমে পড়লে আর যাই হোক লেখাপড়া হয়না। (এ মর্মে মা বিবিধ পরিসংখ্যান এবং জীবন থেকে নেয়া উদাহরণ উপস্থাপন করলেন)

আমি ক্রাশ হজম করে ফেললাম, নিবিষ্টমনে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলাম।

পরে বহুবার ভেবে দেখেছি মানুষ ক্রাশ খায় কেন বা প্রেমে পড়ে কেন। আল্লাহ সুরা রুমে এই প্রশ্নটার চমৎকার একটা জবাব দিয়েছেন – যেন সে 'সুকুন' লাভ করে । সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন মানুষ অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা আর একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাবে কিসে। তিনি দয়া করে আমাদের জন্য সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যারা আমাদের 'সুকুন' দেবে। সুকুন মানে শান্তিময় একটা পরিবেশে নিমজ্জিত থাকা, যেন পাহাড়ী হ্রদের স্বচ্ছ জলে স্তব্ধ এক পাথর। সুকুন মানে জগতের ঝঞ্ঝাময় পরিবেশে হৃদয় জুড়ে থাকা প্রশান্তি, যেন ঝড়ো হাওয়ার তান্ডব আর মুষল বৃষ্টি থেকে পাথুরে প্রাসাদের দেয়া নিরাপত্তা। পুরুষ ও নারী এভাবেই একে অপরকে ভালবাসায় নিমগ্ন করে রাখে, নিরাপত্তা দেয়, প্রশান্তি দেয়, পৃথিবী রূঢ়তা থেকে পালিয়ে বাঁচবার একটা অভয়াশ্রম দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে তাই নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাই শুধুই দৈহিক চাহিদা কিংবা বংশরক্ষার মাধ্যম নয় – এর চেয়ে অনেক গভীর কিছু। এই গভীরতা জৈবিক ডারউইনিসম বা সামাজিক ডারউইনিসম এর চশমা পড়া বস্তুবাদী মানুষ মাপতে পারবে না।

আমাদের মানুষদের খুব বড় একটা সমস্যা হল – আমরা সব ভুলে যাই। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাসায় এসে 'বাড়ীর কাজের' কথা ভুলে যেতাম। এখন যখন ছাত্র পড়াই, তখন হামেশাই ভুলে যাই সে সময়টার কথা যখন আমাদেরও একটুও পড়তে ইচ্ছে করত না। ঠিক তেমনি আমাদের বাবা-মা-বড় ভাইরা দিব্যি ভুলে যান ভাত পেট ভরায়, মন না। 'থার্মোডাইনামিক্স', 'ফার্মাকোলজি' কিংবা 'বিজনেস ল' – সবই মস্তিষ্কে দগদগে ঘা তৈরী করে, হৃদয়ের উপশম তো দূরের কথা। তারুণ্যের অস্থির বয়স পার হয়ে আসা আমাদের

অভিভাবকরা কখন আমাদের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে ভাবেন না – তাদের সন্তানেরাও রক্ত-মাংশে গড়া মানুষ। তাদেরও সুকুন চাইবার অধিকার আছে, সুকুন পাবার দরকার আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো মনে পড়ে। কলাভবনে বসন্ত উৎসবের নাম করে ভবিষ্যৎ কপোতদম্পতি হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমরা ব্যাকটেরিয়ার কনজুগেশন পড়েই কাহিল। ক্লাস, পরীক্ষা, প্র্যাকটিকাল আর ল্যাবরিপোর্ট লেখার যন্ত্রণার মাঝের সময়টা বন্ধুদের সাথে কাটত। বিকেলে-সন্ধ্যায় টুইশনি। রাতে বিধস্ত অবস্থায় যখন বাসায় ঢুকি তখন মন নিয়ে ভাবনার সময় মিলত না খুব। অর্থহীন শতেক কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখা, পাছে বিশাল পৃথিবীতে একা হয়ে যাই! হঠাৎ কখনও বুকের বিশাল শুন্যতা কৃষ্ণ গহবরের মত সব কিছু গ্রাস করে নিতে আসত। একটু সুকুনের জন্য কত পাপের দরজায় কড়া নাড়া! শান্তি তো মিলতই না উলটো নিজের সামনে নিজে ধরা পড়ে গেলে বিবেকের তীব্র দংশন। চারপাশের সম্পর্কগুলো দেখে আর প্রেম করার ইচ্ছে জাগতো না। খালি আল্লাহর কাছে ভিক্ষে চাইতাম এমন একজন মানুষ সঙ্গীকে যে আমার সমস্যাগুলো বুঝবে। যে একান্তই আমার হবে; আর আমি যার কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারব। যে আমার ভাল-মন্দ সব সহই গ্রহণ করবে। যে আমার গুণগুলোর গোলাপ গাছে উৎসাহের পানি দেবে; দোষগুলোর আগাছা ভালবেসে দেখিয়ে দেবে, সেগুলো উপড়ে ফেলতে হাতে হাত রাখবে। এত বড় পৃথিবী – এত মানুষ; অথচ মনের মানুষের খোঁজ মিলল না। সব মিথ্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

এমনই একটা সময়ে ইসলাম সম্পর্কে জানার,

পড়াশোনার আগ্রহ বাড়তে থাকল। জানার সাথে সাথে আবিষ্কার করলাম এতদিন যেসব দিয়ে পরকালের আসল জীবনটাকে ভুলে ছিলাম সেগুলোর অন্তসারহীনতা। তখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম এই বিশাল পৃথিবীরই একটা ছোট কোণে আল্লাহ ঠিক এইভাবেই আরেকজনকে মানুষকে অপেক্ষা করাচ্ছেন। আমাকে যেমন তিনি তৈরী করছেন তাকেও তিনি প্রস্তুত করছেন সেই বিশেষ ক্ষণটির জন্য। যে দিন তিনি আমাকে আমার 'লিবাস', আমার সারা জীবনের পরিচ্ছদের সাথে একত্রিত করবেন। যে মুহূর্তে দু'টো মানুষ কেবল আল্লাহকে ভালবেসে, তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একসাথে জীবনের বাকি পথ পাড়ি দেবার সংকল্প করবে।

একজন মুসলিম তাই যখন আল্লাহর দরবারে হাত তুলে কেঁদে বলে, আল্লাহ এই পৃথিবীতে পবিত্র থাকতে চাই বলেই তোমার কাছে একজন পবিত্র জীবনসঙ্গী চাইছি – আল্লাহ সে হাত ঘুরিয়ে দেন না। কিন্তু তার আগে তিনি পরীক্ষা নেন, আসলেই এই চাওয়াতে কতটা আকুলতা মিশে আছে। যে জিনিসটা খুব সহজে পাওয়া যায়, তার মূল্য মানুষ বোঝে না। যা অনেক চাওয়ার পর, অনেক ধৈর্য ধরার পর মেলে তার কদর থাকে বেশী। একজন মুসলিমের জন্য তার জীবনসঙ্গীর চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই এই পৃথিবীতে। তাই আল্লাহ প্রকৃত মুসলিমদের অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে তবেই তাকে সেটা দেন। এই পরীক্ষা যারা দেয় না, তাদের প্রাপ্তিটার মূল্যও তারা বোঝে না। আমাদের চারপাশে মিথ্যা ভালবাসার বন্যায় যারা ভেসে যায় তাদের সম্পর্কটা তাই খুব ঠুনকো হয়। সামান্য সন্দেহ, ছোট্ট ভুল বোঝাবুঝি কিংবা চাওয়া-পাওয়ার কষে আসা অংকের উত্তরে একটু গরমিল দেখলেই এ সম্পর্কের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে। যে সম্পর্ক সুকুন দেয়ার কথা ছিল, সেই সম্পর্ক নরকযন্ত্রনা নিয়ে হাজির হয়। কত মানুষ সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী ছেড়েই চলে যায়।

বিয়েকে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের অর্ধেক বলে সাব্যস্ত করেছেন[45] এবং কিসের ভিত্তিতে এই সম্পর্কটা হবে তাও তিনি বলে দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের তথাকথিত মুসলিম সমাজ ইসলামের থোড়াই কেয়ার করে। যেখানে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিভাবকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন যদি কোন মুসলিম যুবকের দ্বীন এবং ব্যবহার তোমাকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তোমার অধীনস্থ নারীর সাথে তার বিয়ে দাও। এর অনথ্যা হলে পৃথিবীতে ফিতনা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে বলেও তিনি ভয় দেখিয়েছেন।[46] অথচ আমাদের দেশে ছেলে দেখা বলতে বোঝান হয় ছেলের অর্থসম্পদের পরিমাণ দেখা। চরিত্রও যে একটা সম্পদ এবং একজন মুসলিম তরুণ তার সচ্চরিত্র দিয়ে একটা মেয়েকে কতটা সুখী রাখতে পারে সেটা অভিভাবকেরা ভেবে দেখেননা। একটা লম্পট বিয়ের আগে পাঁচটা প্রেম করলেও লাখ টাকা বেতন পায় বিধায় ভাল পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। টাকার গুণে তার শত লুইচ্চামিও মোল্লা ছেলের দাড়ির চেয়ে অনেক বেশী সহনশীল মনে হয়। অথচ

45 আল হাকিম তার আল মুসতাদরাকে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।
46 আল তিরমিযি তে আবু হুরাইরা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওয়াদা করেছেন কোন অভাবী যদি বিয়ে করে তবে তিনি আপন ঐশ্বর্যের দ্বার তার জন্য খুলে দেবেন, তাকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।[47] মাথায় টুপি পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়া বাবারাও যখন আল্লাহর আয়াতের চেয়ে ব্যাংকের স্টেটমেন্টকে বেশী বিশ্বাস করে, তখন আমার দুঃখে বুক ভারী হয়ে আসে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কি মসজিদের তাকে ধূলার আস্তরণে বন্দী হয়ে থাকবার জন্য নাযিল হয়েছিল? অথচ আজ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন শুধুমাত্র বিবাহিত হবার কারণে প্রতিবছর মানুষের সম্পদ ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে পারে।[48]

কিন্তু দিনশেষে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় বিয়ে একটা সামাজিক ইবাদাত। আমাদের বাবা-মার উপরেই আমাদের জোর চলে না, মেয়ের বাবা-মা তো দূরের কথা। তাই আমরা ফিরে যাই আমাদের শিক্ষক রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যিনি বিবাহযোগ্য অথচ অবিবাহিত তরুণদের শিক্ষা দিয়েছেন বিয়ে না করতে পারলে সিয়াম পালন করতে, কারণ এই সিয়াম তার জন্য ঢাল হয়ে পাপের রাশিকে প্রতিহত করবে।[49] আমি এমন মুসলিম ভাইকে চিনি যিনি বিয়ের আগে নিয়মিত একদিন অন্তর একদিন সিয়াম পালন করতেন। আলহামদুলিল্লাহ, এর ফলে আল্লাহ তাকে খুব চমৎকার একজন স্ত্রী উপহার দিয়েছেন। আমরা ফিরে যাই আমাদের প্রকৃত অভিভাবক, আমাদের রব্ব – আল্লাহর কাছে, তাকে কাতর কন্ঠে বলি –

হে আমার রব্ব, তুমি আমার প্রতি যেই অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তারই মুখাপেক্ষী [50]।

হয়ত আল্লাহ মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত স্ত্রী এবং রিযিক – দুইয়েরই ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা আত্মার শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে আকুলভাবে বলি –

> হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ করুন।[51]

---

47 সুরা আন নূর, ২৪:৩২
48 ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর হিউম্যান রিসোর্স রিসার্চ এর গবেষক জ্য জাগরস্কি এর গবেষণা সূত্রে
49 সহীহ বুখারি ১৯০৫, সহীহ মুসলিম ১৪০০
50 সূরা আল কাসাস, ২৮:২৪

আল্লাহ যেন আমাদের মুসলিম তরুণ ভাইদের জন্য ইসলাম মেনে জীবন ধারণ করা সহজ করে দেন। তিনি যেন আমাদের 'লিবাস', আমাদের প্রাণসখা-দের সাথে আমাদের শীঘ্রই মিলিয়ে অস্থির একাকিত্ব থেকে মুক্তি দেন। আমিন।

২৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩ হিজরি।

51 সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৭৪

ভ্যালেন্টাইনের দিবস

সত্যিকার মুসলিম আসলে কারা?

যারা নিজেদের সীমাবদ্ধতা এবং সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা অনুভব করে নিজেদের আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের অর্থ সন্তুষ্টিচিত্তে আল্লাহর পথ নির্দেশনা মেনে নেয়া যাতে উভয় জীবনেই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা যায়। জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম সম্পুর্ণ - এর মূলনীতিগুলো সময় কিংবা স্থানের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল নয়, তা চিরায়ত। ইসলাম আমাদের যা দিয়েছে তা স্বয়ংসম্পুর্ণ এবং তাতে পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করবার কোন অবকাশ আমাদের নেই। তাই বিদায় হাজ্বের দিন মহান আল্লাহ নতুন কোন জীবন-দর্শন বা ইবাদাতেরপদ্ধতি বা মানবরচিত বিধানের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ বন্ধ করে দিলেন–

> "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পুর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্পুর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[52]

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এতে জাগতিক ও পারলৌকিক - উভয় জীবনের মঙ্গল নিহিত আছে। আমাদের দ্বীনে এমনভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে যেন তা কোন বিষয়কে অবহেলা না করে আবার কোন বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়িও না করে। ইসলামে মূল লক্ষ্য আত্মা কিন্তু তাই বলে দৈহিক চাহিদা উপেক্ষিত নয়। আমাদের প্রাধান্য পরকাল কিন্তু তা প্রাপ্তির মাধ্যম ইহকাল।

> "আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না"[53]

এমন একটা সময় ছিল যখন মুসলিমরা পথ দেখাত, প্রভুভক্ত কুকুরের মত অন্যদের পিছনে হাটত না। একটা সময় ছিল যখন মুসলিমরা হুকুম দিত, হুমকি শুনতনা। যে মানুষেরা

52 মায়িদাহ, ৫-৩
53 কাসাস, ২৮-৭৭

ইসলামকে আকঁড়ে ধরে রাখে আল্লাহ তাদের আঁকড়ে ধরার অনুপাতে ক্ষমতা ও সম্মান দেন, যারা যতটা ইসলাম ত্যাগ করে আল্লাহ তাদের সে অনুপাতে লাঞ্চিত করেন। আজ আমরা কোন দোষে সম্মানের সেই স্থান থেকে সরে এসেছি তা রসুলুল্লাহ (সাঃ) আগেই জানিয়ে দিয়ে গেছেন, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনায় তা এভাবে এসেছে-

> "তোমরা প্রতি পদে পদে তোমাদের আগে যারা এসেছে তাদের পদক্ষেপ অনুসরণ করবে, এমনকি যদি তারা গুইসাপের গর্তেও ঢোকে তবুও তোমরা তাই করবে।" সাহাবিরা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কথা বোঝাচ্ছেন?" রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তারা নয়তো কারা?"

ইহুদি-খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা সবসময়ই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এখনও তারা মুল্যবান সময় ও সম্পদ ব্যয় করে নানামুখী পরিকল্পনা করছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তাদের মেধা-মনন-অর্থ ব্যবহার করছে। শিক্ষা, বিনোদন, তথ্য-প্রযুক্তি, রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র, তথা-কথিত আলোকিত মানুষ এমনকি ইসলামের লেবাসধারী হুজুর ইত্যাদি হাতিয়ারের সুকৌশল ব্যবহারে ইসলাম বিহীন "মডারেট মুসলিম" তৈরি করতে চাইছে। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর একটা সুন্নাত - কেউ যদি পরিশ্রম করে তবে সে অধ্যাবসায় অনুযায়ী ফল পাবেই, এদের ষড়যন্ত্র যে কতটা সফল হয়েছে তা বুঝতে গুলশানের রাস্তায় চারপাশ দেখতে দেখতে এক বিকেল হাটলেই হবে। হাঁটার কষ্ট বাচাতে চাইলে ইসলাম কেন অগ্রহণযোগ্য এ সংক্রান্ত ব্লগগুলো পড়া যেতে পারে বা ফারুকীর দু'একটা নাটকও দেখা যেতে পারে।

১৪ই ফেব্রুয়ারি একটা বিশেষ দিন, ভালোবাসার নামে অনাচারের ঢেউ বয়ে যাবার দিন আসছে। আসলে শয়তানের কৌশলগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম - ভালোর সুদৃশ্য মোড়কে মন্দকে উপহারদেয়া। যে ছেলেটা ঢাবির টিএসসির বারান্দায় বসে প্রেমলীলা করছে তাকে যদি জানানো যায় যে তার বোন ফুলার রোডের ফুটপাথে বসে একই কাজকরছে তবে প্রতিক্রিয়াটা হবে দেখার মত, অথচ তার প্রেমিকাও হয়ত কারো বোন। দুঃখজনকভাবে তার নিজের অন্যায়টা তার চোখে পড়ছেনা।

ইসলামের মূলনীতি হল যে কোন কিছু করতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে ইসলামে তার অনুমোদন আছে কিনা অথবা তা নিষিদ্ধ কিনা। ভ্যালেন্টাইন'স ডে করব কিনা তার আগে তার সম্পর্কে জানতে হবে। বিভিন্ন বর্ণনার ইতিহাস থেকে নিচেরটাই আমার কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে –

পৌত্তলিক গ্রিসে ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে বসন্ত উৎসব করা হতো। সে সময় সম্রাট দ্বিতীয় ক্লদিয়াস তার সৈন্যদের জন্য বিয়ে নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন নামে এক তরুণ খ্রিষ্ট ধর্ম-প্রচারক এই নিষেধ অমান্য করে গোপনে সৈন্যদের বিয়ে পড়াতে থাকে। এই ব্যাপারটা বেশিদিন গোপন থাকেনি, ভ্যালেন্টাইন ধরা পড়ে যান এবং কারারুদ্ধ হন। কারাবাসে তিনি এক কারারক্ষকের মেয়ের প্রেমে পড়েন। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মের একটি বিকৃত নীতি যে ধর্ম যাজকেরা বিয়ে বা নারীদের সাথে কোন সম্পর্কে জড়াতে পারবেনা সেহেতু ভ্যালেন্টাইন শেষমেশ এই প্রেম অস্বীকার করেন। খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি তার এই অনুরাগ দেখে সম্রাট তাকে একটি লোভ দেখান। তিনি প্রস্তাব দেন তিনি ভ্যালেন্টাইনকে ক্ষমা করবেন ও নিজের মেয়ের সাথে বিয়ে দেবেন এই শর্তে যে তাকে খ্রিষ্ট ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। ভ্যালেন্টাইন অস্বীকৃত জানালে তাকে ২৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। একসময় গ্রিস খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করল। পৌত্তলিক বসন্ত উৎসবের নতুন নাম হলো ভ্যালেন্টাইনের দিবস। সাধু ভ্যালেন্টাইনের নতুন নতুন মহিমা শোনা যেতে লাগল - তিনি প্রেমের শহীদ, ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যদিও খ্রিষ্টান ধর্মে বিবাহ বহির্ভুত প্রেম এবং ক্যাথলিক ধর্ম-প্রচারকদের যে কোন ধরণের প্রেমই নিষিদ্ধ তবুও তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম ভ্যালেন্টাইনের দিবস একটি উদযাপনযোগ্য দিবস কিন্তু তারপরেও এটি খ্রিষ্টানদের উৎসব, মুসলিমদের নয়। পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই দিবসের চমৎকার একটা আবেদন আছে। লাল গোলাপ, লাল পোষাক, প্রেম-বার্তা বহনকারী কার্ড, বিভিন্ন উপহার বিপণনের এমন সুব্যবস্থা ভোগবাদীদের লাল-গালিচা অভ্যর্থনা পেয়ে দিনটি হয়ে উঠলো "পবিত্র প্রেম" আর "নিখাঁদ ভালোবাসার" প্রতীক। পুঁজিবাদী প্রচারযন্ত্র যুদ্ধ-বিদীর্ণ পৃথিবী আর অপবিত্র প্রেম-খাঁদযুক্ত ভালোবাসাময় পচা সমাজগুলোতে ভালোবাসারসুবাতাস বইয়ে দেয়ার পবিত্র দায়িত্ব তুলে নিল নিঃসীম

নিঃস্বার্থে। আর আমরা হতভাগা মুসলিমরা পশ্চিমাদের জাতে উঠার এমনসুযোগ পেয়ে সস্তা প্লাস্টিকের নকল ময়ুর-পাখনা খুঁজে মরলাম।

একজন মুসলিম মূলত তিনটি কারণে ভ্যালেন্টাইনের দিবস পালন করবেনা –

প্রথমত, ইসলামে নবআবিষ্কৃত যে কোন উৎসবই প্রত্যাখ্যাত। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে,

> "যে দ্বীন ইসলামে নতুন কিছু প্রবর্তন করবে, তা প্রত্যাখান করা হবে।"[54]

মুসলিমদের আলাহর প্রদত্ত উৎসব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এটা আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালোবাসার নিদর্শন। আর আমাদের উৎসব হল ঈদ। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) মাদিনায় আসলেন তখন তিনি তাদের জাহিলিয়াতের দু'টি দিন উৎসব হিসেবে পালন করতে দেখেন। তিনি তখন বলেন যে,

> "আল্লাহ এই দু'টি দিনেরপরিবর্তে তোমাদের আরো উত্তম দু'টি দিন দিয়েছেন, আর তা হলো - ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর"[55]

দ্বিতীয়ত, একজন মুসলিম বিবাহ বহির্ভুত কোন প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতে পারেনা। আর বিবাহিতদের ক্ষেত্রে একজন স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে বছরের একদিন ঘটা করে ভালোবাসবে, অন্যান্য দিন উদাসীন থাকবে এমনটি হতে পারেনা। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্ন হাদিসে উপহার, সুন্দর কথা এবং ভাল ব্যবহার দিয়ে পরস্পরের মন জয় করতে বলেছেন এবং তা সবসময়, হঠাৎ একদিন নয়।

তৃতীয়ত, আমরা ইসলামের এই মূলনীতি সবসময় মনে রাখব যে,

> "যে যেই সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত"[56]

---

54 বুখারি ও মুসলিম
55 আহমাদ, নাসাঈ, আবু-দাউদ
56 আহমদ , আবু দাউদ

আমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বর্তমান সংস্কৃতিকে করুণার চোখে দেখব, মুগ্ধবোধ নিয়ে নয়। আমাদের মায়া হবে কারণ তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ তাদের সত্য থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর মোহ তাদের এমনভাবে গ্রাস করে ফেলছে যে তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তার অবকাশও পাচ্ছে না। কি হতভাগা এই মানুষেরা। আমরা তাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ দেব বারবার, আর বলব - "রদীতুবিল্লাহি রব্বাও ওয়া বিল ইসলামি দীনাও ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিইয়া"।

আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে সন্তুষ্ট, ইসলাম কে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্‌ট আর মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নাবি হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

আল্লাহ্‌ আমাদের ঘুমিয়ে থাকা বিবেকগুলো কে জাগিয়ে দিন।

১৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩ হিজরি।

ভারত বিরোধিতা

সিলো চেন আর আমি একই বাসায় থাকি। চীনাদের যত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লোকমুখে শুনেছি তার একটিও এই ছেলেটার মাঝে বিদ্যমান নেই। বুদ্ধিমান কিন্তু সহজ-সরল একটা সাধারণ ছেলে। সে পড়া শেষে মেয়েবন্ধুকে বিয়ে করে দু'টো ছেলে এবং দু'টো কুকুর সমেত একটা সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখে। তো, সেদিন আমাদের সাথে ভিয়েতনামী একটা ছেলের দেখা হল। হাই-হ্যালোর পরে আমি পিংপং খেলা নিয়ে কিছু আলাপ করলাম। পুরো সময় চেন শক্ত মুখে তাকিয়ে থাকল। বাসায় এসে আমাকে বলল, আমরা চীনারা ভিয়েতনামীদের পছন্দ করিনা। ওরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমাদের শহরগুলোতে এসে পুরুষদের খুন করত, আর মেয়েদের রেপ করত। এর বিনিময়ে জাপানীদের কাছে ওরা পয়সা পেত।

চীনারা পছন্দ করে না সেই তালিকায় এতদিন ছিল – জাপানী, দক্ষিণ কোরিয়ান, তাইওয়ানিজ, ভারতীয়... এখন নতুন আরেকটা জাত যুক্ত হল। আমি কথা প্রসঙ্গে জানালাম বাংলাদেশীরাও ভারতীয়দের পছন্দ করে না। ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা ভারতীয়দের পছন্দ কর না কেন? বললাম, অনেক কারণ আছে। ওরা আমাদের নদীতে পানি বন্ধ করে দিচ্ছে। ওদের সীমান্তে মাদক উৎপাদন করে এদেশে চালান করে দিচ্ছে। আমাদের দেশের মানুষদের সীমান্তে গুলি করে মারছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপরে থেমে বললাম, আমি কিন্তু ভারতীয়দের ঘৃণা করি না।

ও আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন না?

- আচ্ছা, তুমি যে ভিয়েতনামী ছেলেটাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলে, সে কি কোন চীনাকে মেরেছে? কোন চীনা মহিলাকে রেপ করেছে?

- না!

হয়ত ওর দাদা করেছে। কিন্তু তুমি ওর দাদার করা কাজটার জন্য কেন ওকে ঘৃণা করবে? ও তো কিছু করেনি। ও তো নির্দোষ! একের অপরাধ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া খুব বড় একটা অন্যায়।

চেন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, শরীফ তুমি ঠিক বলেছ।

ভারতের সাম্প্রতিক কিছু কাজকর্মের খবর চাউর হয়ে যাওয়াতে আমরা খুব ক্ষুব্ধ। রেগে যাওয়া মানুষ তাদের স্বাভাবিক চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলে বিধায় চেন যে যুক্তিটা বুঝতে পারছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না, বোঝার চেষ্টাও করছি না।

অর্থনীতির একদম মৌলিক একটা বিষয় – চাহিদা থাকলে উৎপাদন বাড়ে। বাংলাদেশের ফেন্সিডিলের উৎপাদন নেই, কিন্তু চাহিদা আছে। সীমান্ত এলাকার কিছু ভারতীয় তাই সেটা তৈরী করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। ভারত সরকারের তাতে সায় আছে বলে বিএসএফ সেটা ঠেকায় না। চোরাচালান থেকে লাভের বখরা অধুনালুপ্ত বিডিআর আর সীমান্তে সরকারী প্রশাসন পায় বলে তারাও কিছু বলে না। যশোরের তরুণেরা মোটর সাইকেলে চড়ে বেনাপোলে গিয়ে ‘ডাইল’ খেয়ে আসে – দাম কম থাকায় মাস্তি হয় ভাল – সবাই সুখী।

কিন্তু আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী মাথা পুরো ঘটনাটা জানে কিন্তু বিচারের সময় দোষী পায় ভারতকে। আমাদের রাগ ফুঁসে ওঠে । হাতের কাছে মেশিনগান থাকলে ভারতের সীমান্তকে গুলি করে ঝাঁজরা করে দিতাম। কিছু করতে পারিনা বলে বায়ু নিঃসরণের কল্পনা করি – সে মর্মে কার্টুন আঁকি। অথচ যারা ফেন্সিডিল বিপণনের ব্যবস্থা করছে, যারা তাতে সাহায্য করছে, যারা ‘ডাইল’ খেয়ে নেশা করছে – তাদের ব্যাপারে আমাদের সব করণীয়গুলো আমরা জোর করে ভুলে থাকতে চাই। এরা বাংলাদেশী বলেই কি এদের সাত খুন মাফ? আমার বাবার বন্ধু কাস্টমসে চাকরি করেন বলেই কি এ ব্যাপারে আমার কোন বক্তব্য নেই? যে ছেলেগুলো ঢাবির হলে মাঝে মধ্যে ডাইল খায়, তারা আমার বন্ধু বলে কি সেখানে আমার বিবেক থমকে দাঁড়ায়?

ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তো আজকের নতুন কিছু না। যেসব বাবা-মা হিন্দি সিরিয়াল দেখায় ব্যস্ত থাকেন তাদের না হয় সময় হয় না, কিন্তু আমরা যারা ছাত্রাবস্থায় টুইশনি করেছি আমরা কি জানি না ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে কাদের ইতিহাস পড়ান হয়? কাদের ভূগোল পড়ান হয়? এই সিলেবাস কি ভারতীয়রা আমাদের দেশে এসে ঠিক করে দিয়ে গেছে না বাংলাদেশী শিক্ষাবণিকেরা করেছে? মাদ্রাসাশিক্ষার পশ্চাতপদতায় যাদের ঘুম হয় না তারা নিজের সন্তানদের শেখানোর জন্য কোন স্কুল বেছে নিয়েছে সেটা কি আমরা জানি

না? নিজের সন্তানদের অন্তত ছাদে খেলতে নিয়ে যাবার মত সময় দেয়ার ইচ্ছা নেই আজকের মধ্যবিত্ত বাবা-মার। সন্তানদের ডোরিমনের হাতে তুলে দেয়ার অপরাধ কি শুধুই হিন্দি চ্যানেলের আর ডিশ ব্যবসায়ীদের? মাসে মাসে ডিশ ব্যবসায়ীদের টাকা দিচ্ছে কে? ভাবটা এমন সীমান্তে হত্যা বন্ধ করে দিলে হিন্দি চ্যানেল দেখা যায়েজ হয়ে যাবে! অনৈতিক শিক্ষাগুলো বাংলা ভাষাতে দিলেই সেটা খুব আনন্দের ব্যাপার হবে! ভারতের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়া একটা ছেলে কেন বাবা-মাকে বলতে পারে না - "এই বাসায় হয় আমি থাকব না হয় টিভি । তোমাদের সময় না থাকলে ছোট ভাইদের আমি খেলতে নিয়ে যাব।" 'ক্যাটরিনাময় স্বপ্ন' ভঙ্গ হবে এই গোপন কারণে?

পাকিস্তানীরা খুব খারাপ; ওরা ১৯৭১ সালে ত্রিশলক্ষ মানুষের হত্যাযজ্ঞের কথা স্বীকার করে না। আর আমরা হলাম মহান কর্মবীর জাতি, চল্লিশ বছরের মাথায়ও তিন লক্ষ নিহতের একটা তালিকা বানাতে পারলাম না। আমরা খালি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা আপগ্রেড করি, চাকরি-বাকরিতে কোটার দাবী মেটাতে? ভারতীয়রা খুব খারাপ, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করেছে। আমরা হলাম মানুষের সুরতে ফেরেশতা, মিথ্যা কথা বলিই না। বাংলাদেশ সংসদের 'মাননীয়' ডেপুটি স্পিকার শওকত আলির বক্তব্য 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' ১৬ই ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে এভাবে উদ্ধৃত করেছে[57] –

> I would give hundred per cent credit to India for the liberation of Bangladesh. We gained Independence but India fought for it.

অর্থাৎ, ওরা যুদ্ধ করছে আর আমরা মাছি মেরেছি। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ কিংবা নব্বই-দশ এর ভাগাভাগি নেই – শতভাগই ওদের কৃতিত্ব। এই বক্তব্য ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেয়া হয়েছে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে বসে। জাফর ইকবাল স্যারেরা এসব দেখেও দেখবে না। আমাদের বিবেকবান শিক্ষিত ভোটাররা এই ভদ্রলোককে আবার ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবে!

গরুর মাংস ছাড়া আমাদের দাওয়াত জমে না। নিজেদেরকে কখনও প্রশ্ন করে দেখেছি সারা জীবনে গরু খেলাম তো অনেকগুলো, গরু পাললাম কয়টা? ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়ানোর এত গরু আসবে কোথা থেকে? আমরা শহুরে অভিজাত মানুষ, আমরা পালব গরু? ইচ্ছি!

57 দ্যা টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১৬/১২/২০১১

গোবর ঘাটবে গরীব মানুষ, মাংশ খাব আমরা। আচ্ছাও তাও সই। নিজের গ্রামের একটা বিশ্বাসী গরীব মানুষের হাতে দু'টা বাছুর কিনে দিয়ে বলতে পারতাম – যা পার খাওয়াও, বড় কর, দুই বছর পরে একটা তুমি বিক্রি করবা আরেকটা আমি কুরবানী দেব। বলা তো দূরের কথা এই ভাবনা মনেই আসেনি কখনও!

এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি মেরে কেটে খেয়ে সব সাফ করে ফেলতে, পৃথিবীর প্রতি আমাদের কোন কর্তব্য নেই। বারান্দায় একটা কাচামরিচের গাছ লাগিয়ে তাতে পানি দিয়ে দিয়ে অন্তত একটা কাচামরিচ ফলানোর মুরোদ নেই আমাদের। আমাদের যত শক্তি মরিচের দাম এত বেশী কেন, সরকার কি করে - এই মর্মে সমালোচনা করতে করতে শেষ হয়ে যায়। আমরা এত নির্লজ্জ যে নিজেদের কর্তব্যবোধ নিয়ে তো ভাবিই না, কেউ যদি আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয় আমাদের কি করা উচিত কি বর্জন করা উচিত তাহলে তাকে দালাল বলে রায় দিয়ে দেই।

আধুনিক সমাজে শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে জাত্যাভিমান, দেশকেন্দ্রিক গর্ব। আমরা বাংলাদেশীরা মনে করি, বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল দেশ। আমাদের হালকা কিছু সমস্যা থাকলেও আমরা হলাম সবচেয়ে ভাল জাতি। একই কথা ভারতীয়রাও মনে করে, পাকিস্তানিরাও মনে করে। শ্রেষ্ঠত্বের এই মিথ্যা প্রবোধটাকে ব্যবহার করে সরকারের মাথায় বসে থাকা চালাক লোকেরা ফায়দা তোলে। খুব সাধারণ একজন ভারতীয়ও তাই সীমান্তের হত্যাকান্ড দেখে আনন্দিত হয় – ইন্ডিয়া ইস গ্রেট – বাংলাদেশীদের কি সুন্দর ঠান্ডা করে রেখেছে। পাকিস্তানিরা পাক-ভারত ম্যাচে পাকিস্তান জিতলে আনন্দে লাফ দিয়ে বলে, উই আর আনপ্রেডিক্টেবল। আমরা সবাইকে হারাতে পারি।

এই হারা, এই জেতায় কি লাভ?

'আমরা তোমার উপরে' - এ মিথ্যা অহংকার মানুষের মনে এতটাই আসন গেড়ে বসেছে যে ভারতে শচীন টেন্ডুলকারকে পূজা করতে মন্দির তৈরী হয়েছে। অথচ সেখানে হাজার হাজার কৃষক ক্ষুদ্র ঋণের বোঝা বইতে না পেরে আত্মহত্যা করছে। বোমা-মৃত্যু-যুদ্ধে জেরবার পাকিস্তানিদের জন্য নাকি ক্রিকেট দলের জয় সান্তনা হিসেবে কাজ করে। কিসের সান্তনা! ডাঙ্গুলি খেলার আধুনিক সংস্করণ কি বোমা হামলায় মৃত সেই ট্যাক্সিড্রাইভারের পরিবারের

ভরণ-পোষণ চালাবে? গ্রামীন ফোন না খেতে পাওয়া মানুষদের কাজের ব্যবস্থা করার জন্য ক'টাকা খরচ করে আর ক্রিকেটের স্পন্সরশিপে কত টাকা ওড়ায়? যে খেলাটা ছিল হাত-পা নাড়িয়ে খেলে একটা আনন্দ পাওয়ার মাধ্যম সেটা কিছু মানুষের জন্য হয়ে গিয়েছে জীবনের লক্ষ্য। "ইট ক্রিকেট, স্লিপ ক্রিকেট – ড্রিংক অনলি কোকাকোলা" – এত স্পষ্ট শব্দগুলোও আমাদের চিন্তাজগতে একটুও ধাক্কা দেয় না।

বাংলাদেশ দলের জয় মানে আমাদের গর্ব – এত বড় মিথ্যা আত্মতৃপ্তি বোধ সৃষ্টির একটাই কারণ, যাতে আসল গর্ব কিসে, আসল সম্মান কিসে সেটা আমাদের মনে কখনও আসতেই না পারে।

এই অবস্থাটা শুধু আমাদের দেশ, পাকিস্তান বা ভারতে না, সারা দুনিয়াতেই চালু হয়েছে। মার্কিনীদের 'ওয়ে অফ লাইফ' কে ঠিক রাখতে ইরাকে লক্ষ শিশুকে জীবন দিতে হচ্ছে। চীন সরকার দুনিয়ার চোখ ধাঁধাঁতে ৪২৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করে 'পাখির নীড়' নামে স্টেডিয়াম বানাচ্ছে আর এদিকে কয়লাখনিতে শ্রমিকেরা জীবন্ত কবর পাচ্ছে। জীবনের মূল্য কমে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য হারে জীবনের লক্ষ্য উলটে যাওয়ার কারণে।

সম্প্রতি এক আন্দোলনের ডাক পড়েছে – ভারতীয় পণ্য বর্জন করুন। যারা ডেকেছেন তারা কতটা ওয়াকিবহাল জানিনা, তবে আমার বাজার অভিজ্ঞতা বলে ভারতীয় খাদ্যশস্য ছাড়া বাংলাদেশের অতিকরুণ অবস্থা হবে। আমার বিবেক এও বলে, ভারতীয় বাহিনীর সীমান্তে গুলি বর্ষণের শাস্তি মসুর ডাল উৎপাদনকারী ভারতীয় চাষীকে দেওয়া উচিত না। শাস্তি পাওয়া উচিত সেসব আমলাদের যারা 'বাজারদর উৎপাদন মূল্যের চেয়ে কম বিধায় সেটা বিক্রি করা যাবে না' এই যুক্তিতে উৎপাদিত চিনি গুদামে পঁচিয়ে নষ্ট করে। এদিকে সরকার ভারত থেকে চিনি আমদানি করতে বাধ্য হয় আর সরকারী সুগার মিলগুলো হয় দেউলিয়া। বয়কট করতে হলে সুদ-ঘুষ আর দুর্নীতি দিয়ে যারা আমাদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙে দিচ্ছে তাদের আগে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

আল কুর'আনের সুরা আলে-ইমরানের ২৬, ২৭ ও ২৮ এ তিন আয়াতে আল্লাহ অভাবনীয় একটি বিষয় তুলে ধরেছেন। এখানে সম্মান এবং ক্ষমতার মালিক হিসেবে আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য স্বীকার করে নেয়ার পরে মুসলিমদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে তারা যেন কাফিরদের

বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে। আমরা কাফিরদের বন্ধু ভাবলেও তারা আমাদের বন্ধু ভাবে না, তারা নিজেদের প্রভু মনে করে। তাদের আচরণ সিংহভাগ ক্ষেত্রেই হয় প্রভুত্ব দেখানোর আচরণ। এই কাফিরেরা দেশীয় পরিচয়ে ভারতীয় হতে পারে, বাংলাদেশী হতে পারে – পাকিস্তানী বা মার্কিনীও হতে পারে।

আমরা যেন অন্যায়ের বিরোধী হই, সেটা মানুষেরা যে দেশেই করে থাকুক না কেন। আর এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অন্যায় আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা, তার জায়গা অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করা। আমাদের বুঝতে হবে যারা আল্লাহর সাথে শির্ক করে না এবং মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একমাত্র অনুসরণযোগ্য হিসেবে মেনে নিয়েছে তারা আমাদের বন্ধু, আমাদের ভাই। তারা যে দেশের, ভুখন্ডের বাসিন্দা হোক না কেন, তাদের ভালবাসা, তাদের দোষগুলোকে উপেক্ষা করা, তাদের আপন করে নেয়া আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি এটা করতে পারি তার প্রতিদানে আল্লাহ এই পৃথিবীতে আমাদের সম্মানিত করবেন, আমাদের ক্ষমতা দেবেন, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব মিটিয়ে দেবেন। এর ব্যতিক্রম আমাদের অপমান-লাঞ্চনা আর অভাবের মুখে ঠেলে দেবে।

ব্যক্তিগত পরিসরে আমরা কি করতে পারি? বড়লোক মানুষ দেখেই চোখ উল্টানোর অভ্যাস ত্যাগ করি। দুর্নীতি করা লোকদেরকে ঈর্ষা না করুণা করা শুরু করি। ভোগবাদী মনোভাব ত্যাগ করি, যে জিনিসটা না হলেও আমার চলে সেটা কেনা বন্ধ করি; জিনিসটা ভারতে বানান হোক, চীনে কিংবা বসুন্ধরার লিমিটেডের।

যতটুকু সম্ভব, যেখানে সম্ভব উৎপাদনমুখী হই। অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরে হলেও পৃথিবী আমাকে কী দিয়েছে সেই হিসাবের পাশাপাশি আমি তাকে কী দিয়েছি সেই হিসাব করি। সর্বোপরি একমাত্র আল্লাহকে এককভাবে ইবাদাতের সত্তা হিসেবে মেনে নেই। তার আদেশ অনুযায়ী মানুষকে সৎ কাজে উৎসাহিত করি, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেই। প্রতিকূল পরিবেশেও যথাসাধ্য সত্য কথা বলার, সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার এবং ব্যক্তিগত মতবাদ ও ভাললাগা ছেড়ে সত্যকে মেনে নেয়ার সৎ সাহস দেখাই। মুখে ইসলামের কথা বলার সাথে সাথে নিজেদের জীবনে যথাসম্ভব ইসলাম জানা ও মানার চেষ্টা করি।

আল্লাহ যেন আমাদের মানুষের দাসত্বকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখার সামর্থ্য দেন। তিনি যেন অর্থহীন ভারত, পাকিস্তান বা মার্কিন বিরোধীতার বদলে শির্ক ও কুফরের বিরোধীতা করার মানসিকতা দান করেন । আমিন।

৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩ হিজরি।

টিপাইমুখ

" আল্লা ! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"

শরৎচন্দ্রের লেখা মহেশ গল্পের এই শেষ অংশটুকু পড়লে কেন যেন চোখে পানি চলে আসত। পুরো মহেশ গল্পটা জুড়েই ছিল হিন্দু শাসক গোষ্ঠী কিভাবে মুসলিম প্রজাদের শোষণ করেছে সে চিত্র। কিন্তু সে শোষণের হাত থেকে শুধু মানুষ না, হিন্দুদের আপন দেবতাও যে নিস্তার পায়নি সেটা গফুরের এই উক্তিটি সাক্ষ্য দেয়। দিন বদলেছে, কিন্তু জমিদার শিবুবাবু আর পুরোহিত তর্করত্নদের চেহারা বদলায়নি। কি জওহরলাল নেহেরু, কি বাজপেয়ী, কি মনমোহন সিং - ভারতের শাসক শ্রেণী তাদের কদর্য চেহারা দেখিয়েছে গুজরাটে-কাশ্মিরে কখনও খোদ এই বাংলাদেশে।

"ওদের আমরা ভাতে মারব, পানিতে মারব" - ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ ভারত সরকার আজও ভোলেনি, আমাদের ভুলতেও দেয়নি। ১৯৭৫ সালে চালু হওয়ার পর থেকে ফারাক্কা ব্যারেজ ৪০,০০০ কিউসেক অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ১১.৩ লক্ষ লিটারেরও বেশি পানি পদ্মা থেকে ভাগিরথী নদীতে সরাতে থাকে। সংক্ষেপে এর ফলাফল হয় –

১. পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে মরুকরণ হয়। পানির অভাবে পদ্মার শাখা-প্রশাখাগুলো শুকিয়ে যায়। পুরো অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যায় অনেক নীচে। বহু নলকূপ অচল হয়ে যায়। পুকুর এবং বিলগুলোতে পানি কমতে থাকে। সেচের পানি যোগাড় করতে ব্যবস্থা করা হয় গভীর নলকূপের – ফলে মাটির গভীর স্তরে জমে থাকা আর্সেনিক পানিতে মিশতে শুরু করে। দুষিত হতে থাকে পুরো দেশের ভূগর্ভস্থ পানির সঞ্চয়।

২. পানির অভাবে কৃষিকাজ ব্যাহত হতে থাকে চরমভাবে।

বছরপ্রতি ফসল উৎপাদন কমে যায় অন্তত ৩৬ লক্ষ টন – যার মূল্যমান ন্যুনতম ২৩০০ কোটি টাকা।[58] আর এ ক্ষতিটা হয় মূলত প্রান্তিক কৃষকদের, যাদের মূল অবলম্বন ছিল চাষাবাদ। দু'ফসলী-তিন ফসলী জমিতে এখন বছরে বড় জোর একবার শস্য ফলে। তাও নির্ভর করে বৃষ্টি নয়ত সেচের পানির উপরে।

৩. ইলিশ ছিল পদ্মার প্রাণের সখা। সমুদ্রের মাছ হলেও এর প্রজনন বৈশিষ্ট্য স্বাদু পানির স্রোতে গিয়ে ডিম পাড়া। পদ্মার স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই মাছের দল বাংলাদেশের বদলে বেছে নিয়েছে মায়ানমার আর থাইল্যান্ডকে। শুধু ইলিশ নয়, এর মত শত মাছের প্রজননক্ষেত্রে পালটে গেছে। কাকচক্ষু দীঘির বুকে এখন ভরা বর্ষাতেই হাটু পানি জমে। জেলেরা মাছ ধরবে কোথায়? আমিষের একমাত্র উৎস হারিয়ে অপুষ্টিতে ভোগা শুরু করল গোটা জনপদের গরীব মানুষদের ৭৫ পরবর্তী প্রজন্মগুলো। উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা দেখা দেয় প্রকটভাবে। অভাবী উপোসী মানুষের ঢল নামে শহরমুখে। সে ঢলে শরীক হয় চাষা, জেলে, কামার, কুমোর, ক্ষেত মজুর সবাই।

58 HEAVENLY GANGA, THE FARAKKA BARRAGE AND ITS ATROCIOUS AFTERMATH - Jatin H. Desai

৪. নদীর পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ায় সমুদ্রের পানি ঢুকতে থাকে নদীগর্ভে, মাটির তলায়। রূপসা-পশুর নদীর তীরে অবস্থিত খুলনা ছিল শিল্পপ্রধান শহর। পানিতে অত্যধিক পরিমাণ লবন এবং অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের উপস্থিতিতে নষ্ট হতে থাকে যন্ত্রপাতি। এর সাথে যুক্ত হয় কৃষিজ কাঁচামালের অভাব। একে একে বন্ধ হতে থাকে কলকারখানাগুলো।

৫. একটা নদীর চলাকে যখন থমকে দেয়া হয় তখন বয়ে আনা পলিগুলো থিতু হয়ে জমতে থাকে। যখন পানিটাকে নিয়ন্ত্রিতভাবে ছাড়া হয় তখন সে পানিতে দ্রবীভূত প্রায় কিছুই থাকেনা, একে বলে উপোসী পানি। প্রমত্তা পদ্মা আকার হারালেও ক্ষুধা হারায় না – ভেঙে নিতে থাকে নদীর পার। রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া আর রাজবাড়ী জেলা জুড়ে বিস্তৃত হতে থাকে পদ্মার করাল গ্রাস।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জেতা যায় না সেটা ফারাক্কা আরো একবার প্রমাণ করেছে। প্রকৃতির সাথে সহাবস্থান করতে হয়, তাকে সম্মান দেখাতে হয়। প্রকৃতিকে দাস বানানোর চেষ্টা করলে নগণ্য মানুষকে সে দূরে ছুড়ে ফেলে। যে কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্য পদ্মাকে হত্যা করা হল, সে বন্দরের নাব্যতা ধরে রাখা যায়নি। বয়ে আনা পলির স্তুপ

ভাগিরথীতে পানির চালান বন্ধ করে দিয়েছে। ক্ষতির মধ্যে গঙ্গা ছড়িয়ে গেছে আকারে, কমে গেছে গভীরতায়। বেড়েছে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর – ফলে অল্প বৃষ্টিতেই হয় ব্যাপক বন্যা। মালদা আর মুর্শিদাবাদের হাজার হাজার একর জমি নদী ভাঙনে হারিয়ে গেছে নয়ত তলিয়ে গেছে নদীবক্ষে। লক্ষ লক্ষ মানুষ জমি হারিয়েছে, ঘরছাড়া হয়েছে। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী – এমন মিথ্যা অভিযোগ মাথায় নিয়ে মুসলিম প্রধান এসব হতদরিদ্র মানুষগুলো পাড়ি জমিয়েছে গুজরাট, মহারাষ্ট্র আর মুম্বাইয়ে। বড় বড় বস্তি আবাদ করেছে এরা। এসব ‘স্লামডগ’ বা বস্তির কুকুরদের নিয়ে তৈরী করা জমজমাট সিনেমা মানুষের ভালই মনোরঞ্জন করছে। সমাজবাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গঙ্গা ভাঙন কমিটি ১৯৮০ সালেই রায় দিয়েছে –

> “অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে ভাঙ্গন থেকে চাষের জমি রক্ষা করা খরচে পোষায় না।”[59]

মানুষ যে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না সেটা ভারত সরকার আবারও প্রমাণ করেছে মনিপুরে টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে। মনমোহনেরা বোঝে না নদীরও প্রাণ আছে। বরাক নদীর চলার পথ কিংবা গভীরতা হিসেব করা যায় কম্পিউটারে বসে কিন্তু এর তীরে যেই মানুষেরা বাস করে তাদের জীবনের হিসেব কে করে? ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নাহয় ভারত সরকার মিজোরাম-মনিপুরের ৪০ হাজার মানুষকে ছিন্নমূল বানিয়ে দিল; কিন্তু বাংলাদেশের কি হবে?

ফারাক্কা ব্যারেজের যে পাঁচটি ক্ষতে ইতিমধ্যে দেশ অসুস্থ তার সাথে যুক্ত হবে অন্তত তিনটি ভয়াবহ ক্ষতি[60] –

> ১. সিলেট অঞ্চলের হাওড়-বাওর অঞ্চলের বাস্তুসংস্থানের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বর্ষাকালে এর অধিকাংশ এলাকা পানিতে তলিয়ে যায়। এ সময় বিভিন্ন মাছের প্রজনন ঘটে। কিন্তু শীতকালে এর অনেকটাই শুকিয়ে যায়। বর্ষার পলি

---

59 A REPORT ON THE IMPACT OF FARAKKA BARRAGE ON THE HUMAN FABRIC - Manisha Banerjee

60 টিপাইমুখ বাঁধ ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট (ই-বুক) – জাহিদুল ইসলাম

পেয়ে শীতকালে এখানে ফসল ফলে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সারা বছর একটা নির্দিষ্ট হারে পানি ছাড়া হবে, ফলে মাছেদের প্রজনন যেমন নষ্ট হবে তেমন বছরের একটি মাত্র ফসল থেকেও বঞ্চিত হবে হাওড় এলাকার মানুষেরা। নিয়ন্ত্রিত পানি প্রবাহ শুধু মাছই নয়, নানারকমের গাছপালা এবং অন্যান্য পশু-পাখীদের জীবনও হুমকির মুখে ফেলবে।

২. অতি বৃষ্টিতে বাঁধ রক্ষার জন্য ছেড়ে দেয়া পানিতে ভেসে যাবে জনপদ। অতি খরাতে পানি ধরে রাখার চেষ্টায় প্রায় মরুভূমি হয়ে যাবে দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চল। আর যদি বাঁধ থেকে ছাড়া পানি দিয়ে চাষাবাদ করার খায়েশ জাগে ভারতের তাহলে আর দেখতে হবে না।

৩. মনিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সইবাম বলেছেন, "বাঁধের জন্য বেছে নেয়া জায়গাটা একটা 'ফল্ট লাইনের' উপরে অবস্থিত বিধায় খুব অস্থিতিশীল। এ অঞ্চলে গত পঞ্চাশ বছরে রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার দুটি ভূমিকম্প হয়েছে।" বাঁধের ফলে সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদের পানির চাপে ভূ-গর্ভে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বাড়বে। আর যদি ভূমিকম্পে বাঁধ ধসে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটে তবে ৫ মিটার উঁচু সুনামি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সিলেটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পালানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই মারা পড়বে হাজারও মানুষ।

এছাড়াও পরিবেশে যে অন্যান্য সুদূর প্রভাব পড়বে তার মধ্যে গ্রীন হাউস এফেক্ট অন্যতম। বহতা নদীর পানিকে যখন আটকে রাখা হয় তখন অনেক বেশী জায়গা জুড়ে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া চলে। জলীয় বাষ্প কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর মিথেনের পাশাপাশি অন্যতম প্রধান গ্রীনহাউজ গ্যাস। গ্রীন হাউজের প্রতিক্রিয়ার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবার যে আশঙ্কা করা হচ্ছে তাতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় পুরোটাই সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

টিপাইমুখ বাঁধ তাই বাংলাদেশকে গোপনে হত্যা বা ভারতের জন্য আত্মহত্যা নয় বরং পুরো পৃথিবীর জন্য একটি ভয়াবহ হুমকি।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের পানি ধরে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ধরে রাখত কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেননা, তার দিকে তাকাবেনও না। আল্লাহ তার রহমত আটকে দেবেন কারণ সে পানি আটকে রাখত অথচ সে তা সৃষ্টি করেনি।[61] পানি যদি ধরে রাখতেই হয় সেটা যেন গোড়ালির উচ্চতা অতিক্রম না করে এমন নিষেধাজ্ঞাও ইসলাম আরোপ করেছে।[62]

এখন নামে ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার ভারত স্বাভাবিকভাবেই রসুলের নির্দেশের তোয়াক্কা করে না। সমাজ, পরিবেশ, প্রতিবেশী সব গোল্লায় যাক – পৃথিবীতে ভোগ করা হল ওদের মূলমন্ত্র। কিন্তু ওদের ভোগের মাশুল কেন আমাদের দিতে হবে? ওরা এসির বাতাস খাবে, আর আমরা দু'মুঠো ভাতও খেতে পাব না তাতো হয় না। রুখে যদি না দাঁড়াই তবে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মত উত্তর পূর্বাঞ্চলও পঙ্গু হয়ে যাবে। সমস্যা হল আমরা আপাতত ভারতের সাথে মারামারি করে পারব না। আর আন্তর্জাতিক নদী আইন নিয়ে যে জাতিসংঘে বিচার দেব সে পথও রুদ্ধ। বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এখন ভারতের সাথে খাতির রাখতে ব্যস্ত। ভারত আমাদের পানি বন্ধ করে মারল না ভাতে মারল – তাতে তাদের একটুও এসে যায় না। তাহলে আমাদের কর্তব্য কি?

প্রথমত, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। আল্লাহ যেই আয়াতে আমাদের জানিয়েছেন যে পৃথিবীর যাবতীয় বিপদ-আপদ আমাদের নিজেদের হাতের কামাই, সেই একই আয়াতের শেষাংশে বলেছেন যে তিনি অনেক অনেক ক্ষমা করেন।[63] আমরা হিন্দি সিনেমা-সিরিয়াল দেখে, শির্কযুক্ত গান শুনে, ওদের সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়ে যে পাপ করেছি তার প্রতিফল হিসেবে ফারাক্কা পেয়েছি, টিপাইমুখ পেতে যাচ্ছি। ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেতে হবে। আল্লাহর কাছ ক্ষমা চাইলে তিনি বিপোদদ্ধার করেন, এবং করবেন বলে সকল মুমিনকে কথাও দিয়েছেন।[64]

61 আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত – সহীহ বুখারি ও মুসলিম
62 আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
63 সুরা আশ-শূরা, ৪২ : ৩০
64 সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮৮

দ্বিতীয়ত, টিপাইমুখের বিরুদ্ধে আমরা জনমত সৃষ্টি করতে পারি। ভারত সহ সারা পৃথিবীতে নিশ্চয় এখনও কিছু মানুষ আছে যাদের সাধারণ বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়নি। টিপাইমুখের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মনিপুরে আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বজুড়ে একটা সচেতনতার জন্ম দিতে পারি তাহলে লোকভয়ে হলেও ভারত সরকার এ প্রকল্প থেকে পিছু হটবে যেমন হটেছে পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুরে টাটা গাড়ির কারখানা বানানোর সময়ে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের যার যতটুকু পরিচিতি আছে সেটুকু ব্যবহার করতে হবে যেন মানুষ অন্তত জানতে পারে টিপাইমুখে কি ভয়াবহ অন্যায়টা হচ্ছে। আমাদের যার যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু দিয়ে কিছু লিখি, না লিখতে পারলে এখানে - http://farakkacommittee.com/tipaimukh-dam.php বেশ কিছু ভাল লেখার সংকলন আছে, সেগুলো অন্তত পড়ি ও মানুষকে পড়তে দেই। বুয়েটের পানিসম্পদ প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলামের একটা বাংলা ই-বুক আছে (http://www.socolzahid.blogspot.com/) এরকম ইংরেজিতে কিছু লেখা দরকার। প্রধানমন্ত্রীর দুই ভারতভৃত্য উপদেষ্টা এই বাঁধের পক্ষে যে নির্লজ্জ চামচামি করছে তার বিরুদ্ধেও একাডেমিকালি লেখা দরকার।

এগুলোর কোনটিই যদি কাজ না করে তবে আমাদের পথে নামতে হবে। ভারতীয় দূতাবাস বা সংসদ ঘেরাও করে হলেও আমাদের দাবী এই বুদ্ধিভ্রষ্ট সরকারকে শোনাতে হবে। টিপাইমুখের বিরুদ্ধে নীরবতার মূল্য আমাদের দিতে হবে পরকালে, আর আমাদের সন্তানদের ইহকালেই।

৭ সফর, ১৪৩৩ হিজরি।

তুমি অধম হইলে...

বলা হয়ে থাকে মানুষ সামাজিক জীব। কিন্তু আমাদের চারপাশের বেশীভাগ মানুষের সাথে পশুর তফাৎ খুব কম। এরা এ পৃথিবীতে কেন আসল, কেন বাঁচল, কেনই বা চলে যাবে সেগুলো নিয়ে একটুও ভাবেনা। পশু-মানুষে ভরা সমাজের মানুষেরাও তাই ঠিক সামাজিক না। এরা অন্যদের বিপদে এগিয়ে আসেনা, সহমর্মিতা দেখায়না, এমনকি সৌজন্যতা করেও একটু ভাল ব্যবহার করতেও জানেনা। এমন অবস্থায় ভাল মনের মানুষেরা খালি কষ্টই পেয়ে যান। ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ভাল মনের মানুষদের অসামাজিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দিয়েছে চমৎকার একটি অস্ত্র আর আত্মরক্ষার বর্ম।

প্রথমত, আল্লাহ সুবহানাহু সুরা ফুসসিলাতে[65] আমাদের হাতে যে অস্ত্রটা তুলে দিয়েছেন তার নাম সদ্বব্যবহার–

> মন্দকে প্রতিহত কর উত্তম দ্বারা, তখন নিশ্চয়ই তোমার সাথে যাদের শত্রুতা আছে তারা তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যাবে।

অর্থাৎ কেউ যদি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাকে আমি আক্রমণ করব ভাল ব্যবহার দিয়ে । তাহলে শত্রুরাও বন্ধু হয়ে যাবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে আল্লাহ 'শত্রু' কথাটা সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে বলেছেন। অর্থাৎ আমি যাকে শত্রু মনে করছি সে আসলে শত্রু নয়, বরং কোন একটা কারণে তার আর আমার মধ্যে বৈরীতা তৈরী হয়েছে আর সে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। এই বৈরীতাকে নষ্ট করতে আমাকে আগে উদ্যোগ নিতে হবে যদি আমি মুসলিম হই। কেউ যদি রেগে গিয়ে আমাকে 'ছাগল' বলে আর আমি যদি তাকে 'কুকুর' বলে প্রত্যুত্তর দেই তাহলে কিন্তু আসলে তার সাথে আমার কোন পার্থক্য থাকে না। অথচ আমি যদি কোন অভদ্র সম্ভাষণে না যাই তাহলে আমি যে তার চেয়ে আলাদা সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে। 'আমি কি কম গালি জানি' – মনোভাব দেখালে কিছুক্ষণের জন্য মনে শান্তি লাগতে পারে, কেউকেটা ভাব আসতে পারে, কিন্তু আদতে অর্জন হবে একটা স্থায়ী শত্রু এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি। ইহকাল এবং পরকাল দু'টিতেই ক্ষতি। কিন্তু খারাপ ব্যবহার

65 সুরা ফুসসিলাত/ হামীম আস-সাজদাহ, ৪১: ৩৪

পেয়েও আমি যদি মিষ্টি হেসে, ভাল করে একটা কথা বলি, তাকে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলি, তাহলে সে লজ্জা পাবে, নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং পুরো ব্যাপারটা একটা বিশ্রী ঝগড়ায় রূপ নেবেনা। ভাল ব্যবহারকে সাদা চোখে নরম মনে হতে পারে, দুর্বল মনে হতে পারে, কিন্তু ভাল আর মন্দের দ্বন্দে শেষমেশ মন্দ হেরেই যায়।

এ কাজটা করা কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু আল্লাহ বলেন যারা ধৈর্যশীল তারা এটা করতে সক্ষম। আর যারা ধৈর্য ধরে এ কঠিন কাজটা করবে তারা অধিকারী ‘বিশাল সৌভাগ্য’-এর ।

পরকালে জান্নাত পাওয়া বিশাল সৌভাগ্যের ব্যাপার এটা আমরা মুখে বললেও আসলে ঠিক বিশ্বাস করিনা। বিশ্বাস করলে আমাদের ব্যবহার এত নীচ হবে কেন? আর সত্যিকারের বন্ধু পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্য সেটা যার তেমন বন্ধু আছে শুধু সেই বুঝতে পারবে। ইবনু আব্বাস এই আয়াত বোঝাতে গিয়ে বলেছেন –

আল্লাহ বিশ্বাসীদের আদেশ দিচ্ছেন তারা যখন রেগে যায় তখন যেন ধৈর্য ধরে, যখন মূর্খতার মুখোমুখি হয় তখন যেন সহ্য করে, আর দুর্ব্যবহার পেলে যেন ক্ষমা করে। এর বিনিময়ে আল্লাহ বিশ্বাসীদের শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের শত্রুদের এমনভাবে পরাস্ত করবেন যেন তারা সুহৃদ বন্ধু হয়ে যাবে।

একই ভাবধারার আরো দুটো আয়াত আছে আল কুর’আনে – সুরা আল-আরাফ[66] এবং সুরা আল মু’মিনুন[67] -এ। মজার ব্যাপার হল তিন স্থানেই খারাপের জবাব ভাল দিয়ে দিতে বলার সাথে সাথে আল্লাহ এও বলেছেন যেন আমরা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। কারণ শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হয়েও সে কখনই মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে না, সে সুন্দর সুন্দর কথা বলে, লোভ দেখিয়ে, মিথ্যা আশা দিয়ে মানুষকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। অথচ যে কোন মুসলিম ভাই যদি রাগের মাথায় বা ভুল বুঝে খারাপ ব্যবহার করেই ফেলে তাহলেও সে কিন্তু আমার শত্রু হয়ে যায় না। হয়ত সে আসলে আমার মঙ্গল চায় বলেই আমাকে শক্ত করে কতগুলো কথা বলেছে। হতে পারে তার ব্যবহারটা সুন্দর হয়নি, কিন্তু দিন শেষে সে কিন্তু আমার মুসলিম ভাইই থেকে যায়।

66 সুরা আল-আরাফ, ৭: ১৯৯-২০০

67 সুরা আল মু’মিনুন ২৩: ৯৬-৯৮

সুন্দর ব্যবহারের এই অস্ত্রটার ব্যবহার সফলভাবে করা যায় যদি ‘সুধারণা’ নামের বর্মটা পরা থাকে। একবারেই পারিবারিক পরিসরেই চিন্তা করি – বাবা বাসায় আসার পরে খুব আগ্রহ নিয়ে একটা জিনিস দেখাতে গেলাম। তিনি তখন খুব কড়া গলায় বললেন, “যাও তো এসব দেখতে ভাল লাগেনা।” এখন আমি বোকার মত অভিমান করতে পারি, রাগে দরজা বন্ধ করে রাত্রে খাবনা – এ মর্মে ঘোষণাও দিতে পারি । অথবা চিন্তা করে দেখতে পারি কেন তিনি এমন করলেন, তিনি তো সবসময় এমন করেন না। হয়ত আজ অফিসে কোন ঝামেলা হয়েছে, হয়ত তাকে বসের কাছে কটুকথা শুনতে হয়েছে, হয়ত বাসায় ফেরার পথে বাজারে ঢুকেছিলেন – জিনিসপত্রের দাম থেকে তার দমবন্ধ হয়ে এসেছে। এ ধরণের সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে ভাল উপায় নিজেকে ঐ জায়গাতে বসিয়ে ভেবে দেখা যে আচ্ছা, আমার সাথে যদি এমন হত তাহলে আমার কেমন লাগত। যখনই কোন খারাপ ব্যবহারের একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দাড় করাতে পারব তখন আমি দেখব যে ঐ ব্যবহারটা পেয়ে যতটা খারাপ লাগার কথা ছিল ততটা খারাপ লাগছে না। তখন আমি গোস্বা করার বদলে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে তার জন্য নিয়ে যেতে পারব খুশী মনে।

ইসলামে ভ্রাতৃত্ব বলে যে চমৎকার বিষয়টি আছে, তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে এই বোধটার উপরে যে আমাদের পরিবারের কেউ যদি আমাকে বকা দেয়, ভুল বোঝে বা খারাপ ব্যবহার করে তবু কখনও তাকে আমরা ছেড়ে যাই না। বাবা-মার কাছে সন্তান, ভাইয়ের কাছে ভাই আবার ফেরত যায়। যা হয়েছিল সব ভুলে যায়, হাসিমুখে কথা বলে। আমরা যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন অন্য সব মুসলিম যারা এক আল্লাহর দাসত্ব করে তারা আমাদের ভাই বা বোনে পরিণত হয়, ঠিক আমাদের নিজেদের পরিবারের মতই। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন –

> সন্দেহ থেকে সাবধান, নিশ্চয় সন্দেহ সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা কথা। তোমরা একে অপরের উপর নজরদারী করনা, দোষ খুঁজোনা, ঈর্ষা করনা, হিংসা করনা, ঘৃণা করনা, একে অপরকে ছেড়ে যেওনা। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা একে অপরের ভাই হয়ে যাও।[68]

68 সহীহ বুখারি ও মুসলিম

এজন্য উমার (রা.) বলেন – তোমার বিশ্বাসী ভাইয়ের মুখ থেকে যে কথাটা বের হয়েছে তাকে খারাপ অর্থে নিওনা, বরং চেষ্টা কর তার পক্ষে একটা ভাল অজুহাত বের করতে। ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই যে যখন অসামাজিক সমাজ আমাদের শেখায় নিজের ভুলকে খোঁড়া অজুহাত দিয়ে ঢাকতে, সেখানে ইসলাম শেখায় অন্যের ভুলকে কাল্পনিক অজুহাত দিয়ে ছোট করে দেখতে। ইসলাম শেখায় একে অপরের ভাই হয়ে যেতে।

ধরা যাক, বিদেশে কোথাও যাওয়ার পথে আপনার ফ্লাইট চেঞ্জ হল দুবাইয়ে। তো আরব নিরাপত্তাকর্মীর ইংরেজি আপনি বুঝতে পারছেননা এবং সেটা তাকে বলেও দিলেন। এখন দারোয়ানের গেল মাথায় রক্ত চড়ে – সে তো সারাজীবন দেখে এসেছে বাংলাদেশ থেকে আসা শ্রমিকেরা আরবি-ইংরেজি তো দূরের কথা বাংলাই ঠিক মত বোঝেনা, পুবে যেতে বললে পশ্চিমে হাটা ধরে। সেই বাংলাদেশ থেকে এসে যদি আপনি তার ইংরেজির ভুল ধরলেন বিধায় সে খুব একচোট ঝাড়ি মারল আপনাকে। এখন আপনি কি করবেন?

এক, দেশের সম্মান রক্ষার্থে তার সাথে ঝগড়া করবেন, চাইকি একটু মারামারিও করতে পারেন। (নিউইয়র্কে জেএফকে বিমানবন্দরে দেশের প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ কারণে মারামারি করেছে বিধায় এমত প্রস্তাব রাখলাম) এতে লাভ কি হবে? আপনি গ্রেপ্তার হতে পারেন, আরো বেশী ঝক্কি পোয়াতে হতে পারে, ঐ দারওয়ানের কাছে ভবিষ্যতে কোন বাংলাদেশীর কোন ধরণের ভাল ব্যবহার পাওয়ার আশা একেবারেই তিরোহিত হয়ে যাবে।

দুই, আপনি মনে মনে একটা অজুহাত কল্পনা করে নেন – নিশ্চয় দারোয়ান আজকে বউয়ের সাথে ঝগড়া করে এসেছে, বা সে আজকে সুপারভাইজারের কাছে তার ভুড়ির জন্য ঝাড়ি খেয়েছে বা, তার ছোট বাচ্চাটা খুব অসুস্থ কিন্তু অনেক বলে-কয়েও সে আজকে ছুটি নিতে পারেনি। পুরো জিনিসটা নির্ভর করছে আপনি কিভাবে দেখবেন সেটার উপরে। এভাবে আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করা সত্ত্বেও আপনি তাকে দয়া করতে পারেন, তাকে নিয়ে মনে মনে একটু হাসতে পারেন, বা কাল্পনিক দুঃখের সহমর্মী হতে পারেন।

একজন মুসলিম হিসেবে দ্বিতীয় পথটা বেছে নেয়াতে তিনটা লাভ হবে –

১. তাকে শাস্তি দেয়া হবে, কারণ উমার রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু বলেন – যে তোমার ব্যাপারে আল্লাহর অবাধ্য হল তার সবচেয়ে বড় শাস্তি হবে যখন তুমি তার ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত হবে।[69]

২. নিজের মনটাকে কোন ব্যক্তি বা জাতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ, বিদ্বেষ থেকে পবিত্র রাখা যাবে।

৩. পাপমোচন হবে; কারণ রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন –

একজন মুসলিমের উপরে এমন কিছু আপতিত হয় না যা তার পাপমোচন হয় না। রোগ, শোক, কষ্ট, দুঃখ, ক্ষতি এমন কি একটা কাটার খোঁচার বিনিময়েও তার পাপ মাফ করে দেয়া হয়।[70]

ফলে আপনি যতই খারাপ ব্যবহার পান, ততই আপনার লাভ – আপনার হিসাবে পূণ্য জমা হতে থাকবে। যে খারাপ ব্যবহার পেলনা, সে তো পূণ্য অর্জনের সুযোগও পেলনা!

আর আপনি যদি প্রথম পথ বেছে নেন, তবে সম্ভবত আপনি বাকি সারা জীবন অন্য মানুষের কাছে সেই আরব দারোয়ানের গীবত করে বেড়াবেন আর বলবেন – “আরবরা বাস্টার্ড”। এভাবে আপনার কাছে পাকিস্তানীদের কাফির মনে হবে, ভারতীয়দের ইবলিশ মনে হবে, মালয়েশিয়ানদের মুনাফিক মনে হবে । হিংসা-বিদ্বেষে আপনি নিজের মনটাকে পুড়িয়ে কাল বানিয়ে ফেলবেন, কষ্ট পাবেন, অভিমান করবেন অথচ পৃথিবী তার নিজের গতিতেই চলবে। আপনি কাকে কি মনে করেন সেটা দিয়ে কারো কিছু যায় আসেনি, আসবেও না। মধ্যে থেকে আল্লাহর কাঠগড়ায় আপনি আসামী হিসেবে ধরা পড়বেন। কারণ রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –

এক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ, সম্মান এবং রক্ত হারাম। কোন মুসলিম ভাইকে ছোট করাটাই যথেষ্ট বড় অপরাধ ।[71]

69 তাফসির ইবন কাসির, সুরা ফুসসিলাতের আয়াত ৩৪ এর তাফসির।
70 সহীহ বুখারি ও মুসলিম

যখন ইসলামের পক্ষের মানুষেরা অন্যের দোষ অনুসন্ধানে সিংহভাগ সময় ব্যয় করে সেটাকে ‘দাওয়াতী’ কাজ জ্ঞান করেন তখন একজন মুসলিম হিসেবে আত্মগ্লানিতে ভুগি – আমাদের মনটা এত ছোট কেন? সৌদিআরবের বাদশাহকে ব্যক্তিগতভাবে আমিও পছন্দ করিনা, কিন্তু তাকে ‘পা-চাটা কুকুর’ বলে গালি দিলে আমাদের কি লাভ হবে? ইহকালের কি লাভ হবে? পরকালে কতটা সাওয়াব কামাই হবে? সে যদি কিতাবের কিছু অংশ পরিত্যাগের দোষে দুষ্ট হয় তাহলে আমরাও তো তিন তিনটা আয়াত অগ্রাহ্য করলাম। গালি দেয়া তো শিয়া তরিকা, মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম নয়। ফতোয়া মনমত না হওয়ায় আমি একজন আলিম, যে সারাজীবন ইসলামের জ্ঞান অর্জন আর বিতরণে ব্যস্ত থেকেছে – তাকে ‘দরবারী আলিম’ এর ছাপ মেরে দিলাম। অথচ আল্লাহ বলেছিলেন –

হে ঈমান আনয়নকারীগণ, তোমরা সন্দেহ থেকে দূরে থাক, নিশ্চয় কিছু সন্দেহ পাপ।[72]

অথচ এই মানুষটার বুক চিরে আমরা দেখিনি, তাকে টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে কিনা সেটাও নিজের চোখে দেখিনি, কেবলই মিথ্যা অনুমান আর সন্দেহ করে কথা বলে গেলাম। অথচ একজন মুসলিমের সম্পদ এবং জীবনের মত তার সম্মানও অলঙ্ঘনীয় – হারাম। এই হারামটাকে হালাল মনে করা কুফরি। কোন মুসলিম দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা আলিমের ভুল হলে সেই ভুল সম্পর্কে তাকে ও অন্যকে সচেতন করা অবশ্যই জরুরী, কিন্তু সমালোচনাটা যেন গঠনমূলক হয়, তাতে যেন সেই ব্যক্তির সম্মানহানী না হয়।

আমরা যেমন আমাদের পরিবারের মানুষদের দোষ সবাইকে বলে বেড়াই না তেমনি আমাদের মুসলিম ভাইদের দোষও সবার সামনে প্রকাশ করিনা। কারো কোন ভুল দেখলে ব্যক্তিগতভাবে সুন্দর করে তাকে বুঝিয়ে বলি যে কাজটা ঠিক না এবং কেন ঠিক না। সেই মুসলিম ভাইয়ের হিদায়াতের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দু’আ করি, কিন্তু তাও তাকে অসম্মান করিনা, অপমান করিনা। কারণ আমরা যদি আমাদের মুসলিম ভাইদের দোষ

71 ইমাম তিরমিযি কর্তৃক বর্ণিত, তিনি হাদিসটিকে হাসান গারিব বলেছেন।
72 সুরা আল হুজুরাত, ৪৯: ১২

গোপন করি তাহলে আল্লাহ ইহকাল এবং পরকালে আমাদের দোষ গোপন করবেন বলে কথা দিয়েছেন।[73]

একজন মুসলিম সাদা আলোর মত – সাতটি রঙের মত তার চরিত্রেও আছে ভাল-খারাপের সংমিশ্রণ। আমরা নীল কাচ দিয়ে সাদা আলোকে নীল দেখি, লাল কাচে লাল। তেমনি আমাদের মুসলিম ভাইদের আমরা কোন দৃষ্টি দিয়ে দেখব তার উপর নির্ভর করছে তাদের কেমন চেহারা আমরা দেখব। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –

> মু'মিনদের মধ্যে তাদের ঈমান সম্পূর্ণ যাদের ব্যবহার সর্বোত্তম, যারা বিনয়ী, যারা হৃদয় বন্ধনে যুক্ত করে এবং যাদের হৃদয় বন্ধনে আবদ্ধ।[74]

আল্লাহ যেন আমাদের এই মু'মিনদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আবেগের আতিশয্যে যেন আমরা আমাদের আখিরাতকে বিপন্ন করে না ফেলি। আমরা যেন সেই কাচ দিয়ে অন্য মুসলিমদের দেখি যেই কাচে আমরা নিজেরা নিজেদের দেখতে ভালবাসি। আমিন।

১ সফর, ১৪৩৩ হিজরি।

73 সহীহ মুসলিম
74 সিলসিলাহে সাহীহাহ, হাদিস ৭৫১

কারবালার কাহিনী

আজ ১০ই মুহাররম বা আশুরার দিন। এ দিনটি বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। কিন্তু সেই বিভিন্ন কারণ বাদ দিয়ে যে উপলক্ষ্যে আমরা ছুটি কাটাই তা হল কারবালার ঘটনা। শেষ নবী ও রসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এদিন কারবালাতে মুসলিম নামধারী কিছু মুনাফিকের হাতে শহীদ হন। তিনি অত্যন্ত সৎ, সজ্জন এবং সাহসী সাহাবা ছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত তিনিও আমাদের খুব প্রিয় একজন নেতা। কিন্তু ইসলামের অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত তার মৃত্যু সম্পর্কে সত্য ইতিহাসটা আমরা জানি না, জানার চেষ্টাও করি না।

আসলে কি হয়েছিল

৬০ হিজরির ঘটনা। ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়াকে খলিফা নিযুক্ত করেন তার বাবা মু'আবিয়া (রা:) কিন্তু এটা ইসলামের মর্মের চেয়ে রাজতান্ত্রিক ধারায় বেশী প্রভাবিত ছিল। তাই তার হাতে বায়াত করেননি হুসাইন (রা:) ইরাকের লোকেরা এ খবর পেয়ে তার কাছে চিঠি/দূত পাঠিয়ে জানাল তারা তাকে খলিফা হিসেবে চায়, ইয়াজিদকে নয়। সমর্থকদের চিঠি পেয়ে হুসাইন (রা:) তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় পাঠালেন অবস্থা দেখার জন্য। মুসলিম দেখলেন যে আসলেই অনেক মানুষ হুসাইনকে (রা:) কে খলিফা হিসেবে চাচ্ছে। তিনি হুসাইন (রা:) কে সেটা জানিয়েও দিলেন। ইতমধ্যে কিছু অত্যুৎসাহী লোকেরা হানী বিন উরওয়ার ঘরে মুসলিমের হাতে হুসাইনের পক্ষে বায়াত নেওয়া শুরু করল। সিরিয়াতে ইয়াজিদের কাছে এ খবর পৌছালে সে বসরার গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে পাঠাল কুফাবাসীর বিদ্রোহ দমন করতে।

উবাইদুল্লাহ কুফায় গিয়ে দেখে ঘটনা সত্যি। মুসলিম বিন আকীল চার হাজার সমর্থক নিয়ে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের প্রাসাদ ঘেরাও করলেন। এ সময় উবাইদুল্লাহ দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দিয়ে মানুষকে ইয়াজিদের সেনা বাহিনীর ভয় দেখাল। কুফাবাসীরা ইয়াজিদের শাস্তির ভয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়তে লাগল। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরমুসলিম বিন আকীল দেখলেন,

তথাকথিত হুসাইন সমর্থকদের কেউই অবশিষ্ট নেই। তাকে গ্রেপ্তার করে হত্যার আদেশ দিল উবাইদুল্লাহ। মুসলিম মৃত্যুর আগে হুসাইনের কাছে একটি চিঠি পাঠান –

> "হুসাইন! পরিবার-পরিজন নিয়ে ফেরত যাও। কুফা বাসীদেরধোঁকায় পড়ো না। কেননা তারা তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। আমার সাথেও তারা সত্য বলেনি।"

এদিকে মুসলিম বিন আকীলের মৃত্যু হলেও তার প্রথম চিঠির উপর ভিত্তিকরে যুলহিজ্জা মাসের ৮ তারিখে হুসাইন (রা:) মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। অনেক সাহাবী তাকে বের হতে নিষেধ করেছিলেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আব্দুল্লাহ বিন আমর এবং তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুফীয়ান আস সাওরী ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা:) হুসাইনকে বলেছিলেন: মানুষের দোষারোপের ভয় না থাকলে আমি তোমারঘাড়ে ধরে বিরত রাখতাম। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা:) হুসাইনকে বলেন: হুসাইন! কোথায় যাও? এমন লোকদের কাছে,যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে এবং তোমার ভাইকেআঘাত করেছে?

যাত্রা পথে হুসাইনের কাছে মুসলিমের সেই চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠি পড়ে তিনি কুফার পথ পরিহার করে ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার জন্য সিরিয়ার পথে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথিমধ্যে ইয়াজিদের সৈন্যরা আমর বিন সাদ, সীমার বিন যুল জাওশান এবং হুসাইন বিন তামীমের নেতৃত্বে কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের (রা:) গতিরোধ করল। তিনি আগত সৈন্যদলকে আল্লাহর দোহাই এবং নিজের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে তিনটি প্রস্তাব দেন –

> ১. তাকে ইয়াজিদের দরবারে যেতে দেয়া হোক। তিনি সেখানে গিয়ে ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করবেন। কেননা তিনি জানতেন যে, ইয়াজিদ তাঁকে হত্যা করতে চান না।
>
> ২. অথবা তাঁকে মদিনায় ফেরত যেতে দেয়া হোক।

৩. অথবা তাঁকে কোন ইসলামী অঞ্চলের সীমান্তের দিকে চলে যেতে দেয়া হোক। সেখানে তিনি জিহাদ করবেন এবং ইসলামী রাজ্যের সীমানা পাহারা দেবেন।

ইয়াজিদের সৈন্যরা উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের ফয়সালা ছাড়া কোন প্রস্তাবই মানতে রাজী হল না। এ কথা শুনে উবাইদুল্লাহর এক সেনাপতিহুর বিন ইয়াজিদ বললেন: এরা তোমাদের কাছে যেই প্রস্তাব পেশ করছে তা কি তোমরা মানবে না? আল্লাহর কসম! তুর্কী এবং দায়লামের লোকেরাও যদি তোমাদের কাছে এই প্রার্থনাটি করত, তাহলে তা ফেরত দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ হত না। এরপরও তারা খুব যৌক্তিক এই প্রস্তাবগুলো মেনে নেয়নি। সেই সেনাপতি ঘোড়া নিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন হুসাইন (রা:) ও তাঁর সাথীদের সালাম দিয়ে উবাইদুল্লাহ এর সৈনিকদের সাথে হুসাইনের পক্ষে যুদ্ধ করে নিহত হলেন।

সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে হুসাইনের সাথী ও ইয়াজিদের সৈনিকদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য ছিল। হুসাইনের (রা:) এর সাথে ছিলেন –

১. আলী ইবনে আবু তালিবের (রা:) এর ছেলেরা - আবু বকর, মুহাম্মাদ, উসমান, জাফর এবং আব্বাস।

২. হুসাইনের (রা:) নিজের সন্তানেরা - আবু বকর, উমর, উসমান, আলী আকবারএবং আব্দুল্লাহ।

৩. হাসানের (রা:) এর ছেলেদের মধ্যে থেকে আবু বকর, উমর, আব্দুল্লাহ এবং কাসেম।

৪. আকীলের সন্তানদের মধ্যে হতে জাফর, আব্দুর রাহমান এবং আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আকীল।

৫. আব্দুল্লাহ বিন জাফরের সন্তানদের মধ্যে হতে আউন এবং আব্দুল্লাহ।

সাহাবা এবং তাবেঈদের এই ছোট্ট দলটির সবাই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হন। অবশেষে হুসাইন (রা:) ছাড়া আর কেউ জীবিত রইলেন না। সীমার বিন যুল জাওশান নামের এক নরপশু বর্শা দিয়ে হুসাইনের (রা:) শরীরে আঘাত করে ধরাশায়ী করে ফেলল। শেষে

ইয়াজিদ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে নির্ভীক এই বীর আল্লাহর লিখে রাখা ভাগ্যানুযায়ী শহীদ হলেন।

হুসাইন (রা:) অন্যায় কিছু বলেন নি, অন্যায় কিছু করেন নি। তার হত্যাকারী ও হত্যায় সাহায্যকারীদের আল্লাহর ক্রোধ ঘেরাও করুক, এরা ধ্বংস হোক! আল্লাহ্ তায়ালা শহীদ হুসাইন (রা:) এবং তাঁর সাথীদেরকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমত ও সন্তুষ্টি দ্বারা আচ্ছাদিত করুন।

এ ঘটনা মুসলিম জাতির ইতিহাসের একটি লজ্জাজনক অধ্যায় যা বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসী আমাদের উপহার দিয়েছে। এরপরে তারা এতে রঙ মাখিয়ে গল্প বানিয়েছে - পাথর উল্টালে রক্ত বের হওয়া, সূর্যগ্রহণ, আকাশের দিগন্ত লাল হওয়া, আকাশ থেকে পাথর পড়া ইত্যাদি। আল্লাহ যদি চাইতেন তিনি এইসব আজগুবি ঘটনা না ঘটিয়েই হুসাইন (রা:) ও তার সঙ্গীদের রক্ষা করতে পারতেন।

হুসাইন (রা:) এর হত্যাকারী কে?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র:) বলেন: সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের ঐকমতে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া হুসাইনকে (রা:) হত্যার আদেশ দেয়নি। বরং উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে ইরাকে হুসাইনকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দিতে বলেছিল। এতটুকুই ছিল তার ভূমিকা। বিশুদ্ধ মতে তার কাছে যখন হুসাইন (রা:) নিহত হওয়ার খবর পৌঁছলে সে আফসোস করেছিল। সে হুসাইন (রা:) পরিবারের কোন মহিলাকে বন্দী বা দাসীতে পরিণত করেনি; বরং পরিবারের জীবিত সকল সদস্যকে সসম্মানে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল।

ইবনে আবী নু'ম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একজন লোক তাঁকে মশা মারার বিধান জানতে চাইল। তিনি তখন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কোন দেশের লোক? সে বলল: ইরাকের। ইবনে উমর (রা:) তখন উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা এই লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর। সে আমাকে মশামারার হুকুম জিজ্ঞেস করছে, অথচ তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতিকে হত্যা করেছে। আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

বলতে শুনেছি, এরা দুজন (হাসান ও হুসাইন) আমার দুনিয়ার দুটি ফুল। (বুখারী, হাদীছ নং- ৫৯৯৪)

হুসাইন (রা:) নিহত হওয়ার পূর্বে ইরাকবাসীদের বলেন:

> তোমরা কি চিঠির মাধ্যমে আমাকে এখানে আসতে আহবান করো নি? আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করো নি? অকল্যাণ হোক তোমাদের! যেই অস্ত্র দিয়ে আমরা ও তোমরা মিলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এখন সেই অস্ত্র তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে চালাতে যাচ্ছ? মাছি যেমন উড়ে যায় তেমনি তোমরা আমার পক্ষে কৃত বায়াত থেকে সড়ে যাচ্ছ, সকল ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ। ধ্বংস হোক এই উম্মতের তাগুতের দলেরা!

তিনি তাঁর পূর্বের সমর্থকদের বিরুদ্ধে একটি বদ দু'আও করেন:

> "হে আল্লাহ! আপনি যদি তাদের হায়াত দীর্ঘ করেন, তাহলেতাদের দলের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দিন। তাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে দিন। তাদের শাসকদেরকে তাদের উপর কখনই সন্তুষ্ট করবেন না। তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে ডেকে এনেছে। অতঃপর আমাদেরকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছে।"

হুসাইনের (রা:) এই দু'আ প্রমাণ করে যে, ইয়াজিদ প্রত্যক্ষভাবে হুসাইনের (রা:) হত্যায় জড়িত ছিল না। কেননা তিনি দু'আয় বলেছেন: হে আল্লাহ! আপনি তাদের শাসকদেরকে তাদের উপর কখনই সন্তুষ্ট করবেন না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইরাকবাসী শিয়ারা উমাইয়া শাসকদের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় হুসাইনের (রা:) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তবে আল্লাহ সুবহানাহু হুসাইনের (রা:) দু'আ কবুল করে নেন। পরবর্তীতে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকেও ইয়াজিদের আদেশে হত্যা করা হয়।

আমাদের করণীয়:

সালফে সালেহীনের কেউ ইয়াজিদের নামের শেষে রাহিমাহুল্লাহ বা লাআনা হুল্লাহ - এ দু'টি বাক্যের কোনটিই উল্লেখ করেন নি। সুতরাং সে যেহেতু তার আমল নিয়ে চলে গেছে, তাই তার ব্যাপারে আমাদের চুপ থাকাই ভাল। তার ভাল মন্দ আমলের হিসাব সে দেবে, আমাদেরটা আমরা। আমরা তাকে গালি দেব না তবে ভালবাসার প্রশ্ন তো ওঠেই না। তার চেয়েহুসাইন (রা:) ইমামাতের অনেক বেশি যোগ্য ছিলেন, বহু গুণে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্লাহ যাকে খুশি তাকে রাজত্ব দেন, এটাই আল্লাহর রুবুবিয়াত।

কোন ধরণের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী পালনের প্রথা ইসলামে নেই। মুসলিম হিসেবে আমাদের রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন, মৃত বা শহীদ ব্যক্তির জন্য বিলাপ না করা, আনুষ্ঠানিকভাবে তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ না করা। তিনি বলেছেন:

> মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাকে কিয়ামতের দিন লোহার কাঁটাযুক্ত জামা পড়ানো হবে এবং আলকাতরার প্রলেপ লাগানো পায়জামা পড়ানো হবে।[75]

> যে কোন বিপদে আমাদের কর্তব্য কুরআনের সেই বাণী স্মরণ করা -"যখন তাঁরা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।"[76]

রসুলের সুন্নাত ভালবাসলে আমাদের উচিত এই দিনে সিয়াম পালন করা। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় কিছু ইহুদীদের আশুরার দিন রোজা রাখতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: এটি কোন রোজা? তারা উত্তর দিল, এটি একটি পবিত্র দিন। এদিনে আল্লাহ বনী ইসরাইলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। তাই মুসা (আঃ) এ দিন রোজা রেখেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: তাদের চেয়ে মুসা (আঃ) এর সাথে আমার সম্পর্ক অধিক। সুতরাং তিনি

75 মুসলিম
76 সূরা বাকারাঃ ১৫৬

সিয়াম থাকলেন এবং সাহাবীদেরকে সিয়াম রাখার আদেশ দিয়েছেন।”[77] অপর বর্ণনায় তিনি আগামী বছর নয় তারিখেও সিয়াম থাকার নিয়ত করেছিলেন।

আল্লাহ আমাদের সত্যটা জেনে, সস্তা আবেগ ছেড়ে সঠিক আমল করার তৌফিক দিন। আমিন।

১০ মুহাররাম, ১৪৩৩ হিজরি।

77 সহীহ বুখারী

দেয়া

ছোটবেলায় আমার একটা বিদঘুটে অসুখ হয়েছিল – গিল্যান-বারি সিনড্রোম। অসুখটা মানুষের স্নায়ুকে অবশ করে দেয়। আমি চোখের সামনে দেখছি একটা মশা দিব্যি আমার রক্ত খাচ্ছে, টেরও পাচ্ছি কিন্তু হাত নাড়িয়ে মশাটা তাড়িয়ে দিতে পারছি না। ছোট্ট মানুষ – করুণ মিহি গলায় চিৎকার করে বলছি বাবাকে মশাটা মেরে দিতে, গলা দিয়ে স্বরই বেরুচ্ছে না। অক্সিজেনও বোধহয় দিতে হয়েছিল কিছু সময়ের জন্য। আমার মা সবসময় আমার কাছে থাকতেন, কে যেন তাকে বলেছিল আজরাইল মায়ের আঁচলের তলা থেকে বাচ্চাকে কেড়ে নেয় না; বাথরুমে যেতে হলে দৌড়ে যেতেন, দৌড়ে আসতেন। যে আমি প্রায় একটা বছর বিছানায় শুয়ে ছিলাম, সেই আমি আস্তে আস্তে বসা শিখলাম, দাঁড়ানো, ধরে ধরে হাঁটা। মাঝে মধ্যে থমকে ভাবি – আল্লাহ যদি আমার হাতদুটো ফিরিয়ে না দিতেন, পা-টা পঙ্গু করে রাখতেন – কি করতাম?

এক ফিজিওথেরাপিস্ট আমার মা’কে বলেছিল – আপনার ছেলে বেঁচে যাবে কিন্তু কুকুরের মত হাঁটবে। আল্লাহর দয়ায় এখন আমার হাঁটা মানুষের মত কিন্তু দেয়াল নামক পাবলিক টয়লেটের সামনে বসে যে কিশোরটা ভিক্ষা করে আর আনাম র্যাংস প্লাজার ঈদ শপিং দেখে সে তো সত্যি কুকুরের মত করেই চলে।

আমরা মানুষরা খুব নীচ, আমরা কখনও চেয়ে দেখি না আল্লাহ আমাদের কি দিয়েছেন, কি দেননি তার হিসেব করতেই দিন চলে যায়। অন্ডিন’স কার্সনামে একটা জেনেটিক রোগ আছে, এতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে নিয়োজিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাটা নষ্ট হয়ে যায়; ফলে রোগীর মনে করে করে নিঃশ্বাস নিতে হয়। কিন্তু যখন সে ঘুমিয়ে থাকে তখন তো আর সচেতনভাবে শ্বাস নেয়া সম্ভব না, ফলে ঘুমের মধ্যেই সে মারা যায়। আমরা যে প্রতি-মূহুর্তে আপনা-আপনি নিঃশ্বাস নিতে পারছি – এটা যে আল্লাহর কত বড় দয়া সেটা অন্ডিন’স কার্সে আক্রান্ত শিশু জানে। আমরা বুঝিনা, বুঝিনা বলেই আল্লাহ যে আমাদের হাত-পা-চোখ-কান-বাকশক্তি দিলেন তার মূল্য কত সেটা কখন চিন্তাও করে দেখি না।

আমরা যখন রামাদান মাসে ইফতার পার্টি শেষ করে পার্টি ড্রেস কিনতে বসুন্ধরায় যাচ্ছিলাম তখন সোমালিয়া থেকে এক মুসলিম ফতোয়া জানতে চাচ্ছিলেন - “সুহুর বা ইফতারে কোন

কিছু না খেলে সিয়াম হবে কিনা?" যে ভর্তুকির টাকায় ডিজেল কিনে ট্রাক্টর চালানোর কথা ছিল চাষীর সেটা আলোর রোশনাই কিনতেই খরচ হয়ে গেল। যখন এক হতভাগা শিশু ক্ষুধার জ্বালায় রাস্তায় গাড়ী মুছে দিচ্ছে, আরেক কিশোর বিলাসিতা আর প্রাচুর্যে 'বোরড' হয়ে সেই গাড়ীতে চড়ে 'পিনিক' করতেআরেক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছে। আমরা যখন বিয়েবাড়িতে থালা উপচে রোস্ট-বিরিয়ানি নিয়ে অর্ধেক না খেয়েই উঠে পড়ব তখন রংপুরে দু'টো ছোট্ট শিশু সারাবিকাল মাঠে ঘুরে কুড়ানো কচু সিদ্ধ করবে। আমরা যখন শীত উপলক্ষ্যে চামড়ার জ্যাকেট বা কাশ্মিরী শাল কেনার নিমিত্তে এলিফ্যান্ট মার্কেটে ঘুর ঘুর করব তখন নীলফামারিতে কারোজানাজা হবে, কারো জন্য কবর খোঁড়া হবে। ক্ষুধা-শীত-মৃত্যু মঙ্গা এলাকার ভূষণ, আমাদের ঐশ্বর্য ভরা শহরে তার কথা উচ্চারণেও লজ্জা নেমে আসে।

যখন বিবেক ডিলিট করে দেয়া মানুষ নামের বায়োবটগুলোকে মাস্তি করতে দেখি ফ্যান্টাসি কিংডমে তখন আমার চোয়ালটা রাগে ক্ষোভে শক্ত হয়ে যায়। যখন থান্ডারবোলটে ডিজে পার্টিতে এন্ট্রি ফি দেখে হাতের মুঠিটা শক্ত হয়ে যায় তখন হঠাৎ মনে পড়ে –

> নগরসমূহে কাফিরদের গমনাগমন (ও প্রাচুর্য) যেন তোমাদের বিভ্রান্তনা করে। ক্ষণিকের উপভোগ, অতঃপর তাদের অন্তিম পরিণতি জাহান্নাম।[78]

তখন মনে পড়ে সেই মানুষটার কথা সোমালিয়ার ভাইটির প্রশ্ন শোনার পর থেকে এক দিন অন্তর এক দিন সিয়াম রাখা শুরু করেছেন। অন্যান্য দিন খাবার সময়ে তিনি যতটুকু না খেলেই নয় ততটুকু খান। এভাবে যতটুকু খাবার বাঁচবে ততটুকুর দাম তিনি সেখানে পাঠিয়ে দেবেন বলে নিয়ত করেছেন। তাতে হয়ত দুর্ভিক্ষ শেষ হবে না কিন্তু তার নিজের খাবার ভাগ করে নেয়ার নিয়তে তিনি তো অন্তত বলতে পারবেন – হে আল্লাহ আমি তোমার দেয়া খাবার, আমার অন্য মুসলিম ভাইদের সাথে ভাগ করে খেয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে সেই ভাইয়ের কথা যে ছাত্র পড়ানো বাবদ তিন হাজার টাকা পেয়ে সেটার দেড় হাজার দিয়ে ধার শোধ করেছিল আর বাকি দেড় হাজার চা-বিক্রেতা মামার চিকিৎসার জন্য দিয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ে একজন বয়স্কা খালাম্মা গত বছরে লেখা খোলা চিঠিটা পড়ে মাটির ব্যাঙ্ক কিনে

78 সুরা আল-ইমরান

‘পাই-পাই অভিযান’ শুরু করেছেন এ বছর আমাদের হাতে কিছু তুলে দেবেন বলে। মনে পড়ে সপ্তাহে বিশ ঘন্টা গায়ে খাটা টাকা পাঠাতে চাওয়া সেই ভাইকে যে জিজ্ঞেস করেছিল “আমার তো সুদি ব্যাঙ্কে স্টুডেন্ট লোন আছে, আমার টাকা কি আপনারা নেবেন?” মনে পড়ে সে বোনের কথা যে শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য শখের জিনিস কিনবে বলে জমানো টাকা গিয়েছিল বাক্স ভরে। মনে পড়ে আরো অসংখ্য ‘মুখ না চেনা নাম’ আর না’ম না জানা মুখ’ আল্লাহকে টাকা ধার দিয়েছিল পরকালে তার কাছ থেকে ফেরত নেবেন বলে।আল্লাহকে কি টাকা ধার দেয়া যায়? সেই আল্লাহকে যার দেয়া চোখ কোটি টাকা দিয়েও কেনা যায় না? যার দেয়া হাত কোটি টাকা কামাই করেও ক্লান্ত হয় না। যার দেয়া অক্সিজেনটুকুর দাম কখনও টাকায় হিসেবে করে শেষ করা যাবে না?

যেই আল্লাহ আমাদের দু’হাত ভরে সম্পদ দিলেন সেই আল্লাহ আমাদের বললেন – সবাইকে কিন্তু দেইনি, তোমাকে দিলাম। দেখি যাদের দেইনি তাদের জন্য কি কর? যদি ভুখা মানুষের মুখে খাবার দাও তুলে, তাহলে সে খাবার যেন আমাকেই খাওয়ালে। যদি শীতে কাঁপা মানুষদের গরম কাপড় দিলে তো জেন, তোমার টাকা আমি ধার হিসেবে নিলাম। এই টাকা আমি তোমাকে ফেরত দেব, কত গুণ বাড়িয়ে ফেরত দেব সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আল্লাহর এই দয়াটা সাহাবারা কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা সারা দিন মজুরি করে পাওয়া খেজুরের ভাগ অন্যের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা হাসিমুখে উপোস থেকেছেন। আল্লাহ এবং তার রসুলকে ঘরে রেখে ঘরের সব সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন। আমাদের ঈমান সাহাবাদের মত নয়, তারা সব দিয়েছেন, আমরা কি আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্সের দশ ভাগের একভাগ দিতে পারি না? পঞ্চাশ ভাগের একভাগ? একশ ভাগের একভাগ? বিশ্বাস করেন দিলে কমে না, বাড়ে। কেন বাড়ে সেটা যে দিয়েছে খালি সেই জানে। কিভাবে বাড়ে সেটা যে দেয়নি সে কোনদিনও বুঝতে পারবে না। আপনি সাহস করে দিয়েই দেখুন।

দেশে জিনিস-পত্রের দাম এবার বেশী, কিন্তু টাকা চলে যাচ্ছে সেই শ্রেণীর হাতে যারা ক্ষমতার সুবাদে শোষণের মোচ্ছব শুরু করেছে। মানুষের পরণে কাপড় নেই, শীতের কাপড় তো দূরের কথা। এ লেখাটা চিঠিটা আমার মুসলিম ভাইদের মনে করিয়ে দেবার জন্য – আবার সময় এসেছে আমাদের সাধ্যমত শীতের কাপড়-কম্বল নিয়ে আপনার গ্রামের বাড়ী

যাবার, মঙ্গা এলাকায় যাবার। যা পারি, যতটুকু পারি। ‘জাগো’-ফাগো বাদ দিয়ে নিজের হাতে টাকা নিয়ে যাই, নিজের গরীব আত্মীয়স্বজনদের দেই, গ্রামবাসীদের দেই। যতটা সামর্থে কুলাই, দেই। নিজে যেতে না পারেন ছেলেকে পাঠাই, ভাইকে পাঠাই, বিশ্বাসী বন্ধুকে পাঠাই যে দানের টাকার মর্ম বুঝবে, সেটা নিয়ে রাজনীতি করবে না, যার ন্যায্য প্রাপ্য তাকেই দেবে। মানুষের কষ্ট কাছে থেকে না দেখলে আমরা বুঝতে পারব না আমরা কত ভাল আছি।

ইহকালে করা আল্লাহর দয়া যেন পরকালে আমাদের আটকে না ফেলে। যাকে যিনি যত বেশী দিয়েছেন তার হিসাব কিন্তু ঠিক তত কঠিন। মুসলিম হয়ে যদি আমরা যদি অকারণ বিলাসিতা ত্যাগই না করতে পারি, তাহলে বলব আমাদের ইসলাম জিহ্বা বা বড়জোর অবয়বে আটকে গেছে, মনে ঢুকতে পারেনি। আমরা যেন শীতের কাপড়গুলোকে আলমারিতে আটকে না রেখে বিলিয়ে দিতে পারি। ব্যাংকের টাকার সুদ হিসেব না করে আল্লাহর পুরস্কারের হিসেব করি। মানুষ যেন আমাদের জীবন দেখে ইসলামের স্বরূপ চিনতে পারে, আমাদের আত্মত্যাগ দেখে ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে পারে। আমিন।

২৩ যুল-হিজ্জা, ১৪৩২ হিজরি।

জাফর ইকবাল স্যার সমীপেষু

কৃপণ হিসেবে আমার একটা বদনাম আছে। ঢাকা ভার্সিটির ছাত্র থাকাবস্থায় সোবহানবাগ থেকে কার্জন হল অবধি সাইকেল চালিয়ে যেতাম বলে বন্ধুরা এ মর্মে নির্দোষ টিটকারি মারত যে আমি যেন সাইকেলের বদলে রিকশা চালিয়ে যাই; এতে আমার ভার্সিটি যাওয়ার খরচ তো বাঁচবেই সাথে দু'পয়সা কামাইও হবে। বিদ্রুপ বন্ধুত্বসুলভ হলেও দাগ কিন্তু মনে একটু কাটেই। এই আমি যখন মুহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের "তোমাদের প্রশ্ন আমার উত্তর"- পড়লাম তখন সেই সব দাগ মুছে অহংকারের আল্পনা আঁকলাম মনে – আমার ছোট বেলার হিরো সাইকেল চালিয়ে কার্জন হলে যেত, আমিও যাই – বড় হয়ে আমি নিশ্চয়ই তার মত হতে পারব! আমার এ হিরোভক্তি নিয়েও কথা শুনতে হয়েছে – আমরা নাকি জাফর ইকবাল জেনারেশন – তার মত লেখার চেষ্টা করি, তার মত করে কথা বলি। কথাটা সত্য বিধায় খারাপ লাগলেও আপত্তি করিনি।

আমার হিরোর অবস্থান থেকে জাফর ইকবাল স্যারের পতন শুরু হয় একটা সাক্ষাতকার পড়ার পর থেকে। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন "মানুষের উৎপত্তি ক্রমবিবর্তন থেকে তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত ধ্রুব সত্য" লেব্বাবা! আমি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র হিসেবে ক্রমবিবর্তন নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করেও তো কোন বড় মাপের বিজ্ঞানীকে নিঃসন্দেহ প্রমাণ দিতে দেখলাম না। এরপর স্যারের আরো সব আচরণে খটকা বাড়তেই থাকল। উনাকে মেইল করলাম – স্যার, আমি অধম আপনার বড় ভক্ত। আমার কটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন দয়া করে –

১. আপনি কি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করেন?

২. মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর প্রেরিত রসুল হিসেবে বিশ্বাস করেন?

৩. পরকালে সব কিছুর হিসাব নিকেশ হবে এটা মানেন?

তিনি আমার মেইলের উত্তরে বললেন তোমার যা খুশি ভেবে নাও। আমি তাজ্জব হয়ে উত্তর দিলাম – হ্যা না তো কিছু বলুন, আপনি যেটা সত্য মনে করেন সেটা স্বীকার করতে আপত্তি কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন "আই লাভ হেট মেইলস, আই হ্যাভ আ লার্জ কালেকশন অফ

দেম” যাচ্চলে! এটাই আমার আশৈশবলালিত মহাপুরুষের আসল চেহারা? এরপরে পদে পদে তার আদর্শের প্রতি আমার মনে ঘৃণা তৈরী হয়েছে, তিনি যা কিছু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তার মোহনী লেখনীর মাধ্যমে - তার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মেছে। ইসলামবিরোধীতাকে যারা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে তার মধ্যে প্রথম আলো অন্যতম। সেখানে জাফর ইকবাল স্যারের সাম্প্রতিক লেখাটা পড়ে মনে হল তিনি তার মুখোশ ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন। ইসলামের ব্যাপারে তার যে চরম আপত্তি আছে সেটা বলার সৎ সাহস তিনি অর্জন করেছেন। তিনি আমার এ খোলা চিঠির উত্তর দেবেন এত বড় আশা করি না, কিন্তু তার বিবেকে যদি ন্যুনতম সৌজন্যতাবোধ অবশিষ্ট থাকে তবে হয়ত তিনি এ লেখাটা পড়ে একবার ভেবে দেখবেন -

স্যার, ফতুয়া পড়া মেয়ে বিজ্ঞাপনের সুবাদে তরুন প্রজন্মের প্রতিচ্ছবি হল, আর যে মেয়েটা নিজেকে গুনহীন পণ্যের মত বিক্রি করতে চাইল না সে হল ঘরে বন্দী? কখনও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কোন মুসলিমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছেন সে কেন পর্দা করে? আমার স্ত্রী মুসলিম হবার পরে তার বিধর্মী মায়ের বাসায় পর্দা না করে যাবার চাইতে না যাওয়াই বেছে নিয়েছিল। আমাকে বোঝাতে পারবেন কেন সে জন্মদাত্রী মায়ের চেয়ে এই পর্দাকে অগ্রাধিকার দিল? ইসলামের প্রতি কতটা ভালবাসা থাকলে নিজের মায়ের ভালবাসাকে উপেক্ষা করা যায়? একজন মানুষের ভালোবাসাকে অপমান করার অধিকার আপনাকে কে দিল? আপনি তো আমাদের ছোটবেলা থেকে কেবল ঘৃণা করে শিখিয়েছেন, ভালোবাসার মূল্য আপনি কি বুঝবেন? পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৭১ যা করেছিল সেই জন্য যদি সে সময়ে জন্ম না নেয়া পাকিস্তানীদেরও ঘৃণা করতে হয় তাহলে তো বাংলাদেশের মানুষ যত বাংলাদেশীকে মেরেছে সে কারণে সব বাংলাদেশীদেরও আমাদের ঘৃণা করতে হবে? কবে শেষ হবে এই ঘৃণার শৃঙ্খল বিক্রিয়া? যারা অপরাধ করেছিল তাদের তো আপনারা কিছু করতে পারেননি, সসম্মানে দেশে ফিরে যেতে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রজন্মে বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে আসলে কি আপনাদের ব্যর্থতার দায় মিটবে?

দুঃখিত স্যার, আমরা আপনার এই ঘৃণা-ব্যবসায় সঙ্গ দেব না। সৌদি আরবে বিচার করে দেয়া মৃত্যুদন্ডকে ‘হত্যাকান্ড’ বলা আমরা মেনে নেব না। কারণ যেদিন ১৬ বছরের আবদুর রহমান আল আওলাকিকে তার ১৭ বছরের ভাই সহ ড্রোন বিমান থেকে মিসাইল ছুড়ে মারা

হয়েছিল সেটাকে আপনার হত্যাকান্ড মনে হয়নি। ফেলানিকে যখন মেরে কাটাতারের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল সেটাকে আপনার নিষ্ঠুর মনে হয়নি। যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে তাকে আমরা ভাই মনে করি। বাংলাদেশী মুসলিম যেমন আমার ভাই, আমেরিকান মুসলিম যেমন আমার ভাই, পাকিস্তানী মুসলিমও আমার ভাই, সৌদি মুসলিমও আমার ভাই। পাকিস্তানীরা বর্বর, সৌদিরা নিষ্ঠুর - এই ঘৃণার বীজ আমরা বুক থেকে বের করে ফেলেছি। আমাদের ভালবাসা আল্লাহর ওয়াস্তে, তাকে খুশী করার জন্য। এই ভালোবাসা কি যারা বুঝতে পেরেছে, তারা জানে একদিন এই মুসলিম ভাইরা আমাদের বিপদে পাশে এসে দাঁড়াবে। ইঙ্গ-মার্কিনীরা আমাদের গ্যাস তুলতে না পারলে আগুনে জালিয়ে দেবে, ভারতীয়রা আমাদের ফারাক্কা-তিস্তা-টিপাইমুখ বাঁধে, ফেনসিডিলের বন্যায় আমাদের তিলে তিলে হত্যা করবে। ওদের কাছে আগে আপনারা আকাশ বিক্রি করেছিলেন, এখন মাটি বিক্রি করছেন – আমরা কিন্তু ঠিকই বুঝি কে আমাদের ভালোবাসে আর কে আমাদের বাঁশ দেয়! আপনি যাদের ভালোবাসতে বলবেন আমরা তাদের ভালোবাসি না, আমরা বড় হয়েছি স্যার; কে বন্ধু কে শুত্রু সেটা আমরা চিনতে পারছি।

কওমি মাদ্রাসা নিয়ে আপনার মায়াকান্না দেখে আমার শুকনো ঠোঁটে হাসতে গিয়ে রক্ত ঝরেছে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে না এবার মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ না দেয়ার পায়তারা ছিল? শেষে মানবিক বিভাগের ভর্তিপরীক্ষায় এক মাদ্রাসা ছাত্র প্রথম হয়ে দেখিয়ে দিল যে মাদ্রাসা শিক্ষার যেটুকু সীমাবদ্ধতা আছে তা আপনার মত মানুষদের উন্নাসিকতার কারণে। শিক্ষার মূল্য আপনি বোঝেন টাকা কামাই করার মানদন্ডে – তাই একটা ছেলের কলা বিক্রিকে আপনার কাছে জীবনের অপচয় মনে হয়। আমার কাছে তাকে পাকা মানুষ মনে হয়, রিকশাওয়ালা তরুণকে খাঁটি মানুষ মনে হয়। এরা নিজেদের শরীরের ঘাম ঝরিয়ে টাকা কামাই করে বাসায় নিয়ে যায়, অভুক্ত ভাই-বোন দের মুখে তুলে দেয়। এরা মগজ বিক্রি করে দেশের ক্ষতি করে না, দেশের মানুষকে অন্যদের কাছে বিক্রি করে দেয় না। সৌদি শ্রমিকদের নিয়ে তো অনেক মায়াকান্না কাঁদলেন – এদের দেশে করার মত কাজের ব্যবস্থা করার তো কোন কথা বললেন না । পরিবার ছেড়ে মানুষ কি বিদেশে গতর খাটে নিজের সুখের জন্য? জানেন দেশে পাঠানো টাকায় সময় আমার ১৮ মাসের ছেলেটাকে দেখার জন্য কতটা হাহাকার মিশে থাকে? আপনারা হিসাব করেন ‘ফরেন রেমিটেন্স’ – আমার স্ত্রীর, আমার মায়ের অশ্রুর দাম আছে আপনাদের কাছে? আমাদের জন্য আপনার

কোন স্বপ্ন নেই – আমরা দেশে এসে যেন কিছু করতে পারি সেই ইচ্ছাও নেই। বিদেশে থাকুক, পিএইচডির কামলা খাটুক কিংবা আকাশ-ছোঁয়া দালানের মিস্ত্রী হোক – টাকা পেলেই তো আপনারা খুশি তাই না? সৌদি জল্লাদ এক কোপে কল্লা নামায় কি ভয়াবহ কথা! আপনারা সুশীল কসাই – টাকা কামানোর হাইড্রোলিক প্রেসে চিপে চ্যাপ্টা করে তিলে তিলে মারবেন – এই না হলে সুখের মৃত্যু!

পারবেন কখনও আপনার পশ্চিমা শিক্ষার মোড়কটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখতে কেন একটা ছেলে কওমি মাদ্রাসায় যায়? কারণ – দুটো: হয় তাদের বাপেদের সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়ানোরও সামর্থ্য থাকে না, নয়ত তাদের বাবারা চায় তাদের সন্তান আলিম হোক।

আলিম মানে কি বোঝেন? যে মানুষকে আল্লাহর পাঠানো জ্ঞান শেখায়। এই জ্ঞান 'থিওরি অফ রিলেটিভিটির' মত কয়েকদিন পর পর হুমকির মুখে পড়ে না, ' সেন্ট্রাল ডগমা অফ লাইফের' মত একদিন হঠাৎ উলটো পথে হাঁটা ধরে না। এটা বিবিএ ডিগ্রী না স্যার, যাতে মানুষকে ভুলিয়ে 'গ্রোথ' এর কার্ভ উর্ধমুখী রাখতে শেখান হবে। এটা বার-এট-ল না যাতে চোর-ছ্যাচ্চরকে মুক্তি দেয়ার রাস্তা বাতলানো শেখাবে। যেটা পড়লে টাকা আসে না সেটা পরে কি লাভ সেটা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। যারা ইসলাম শিখেছে, বুঝেছে তাদের কাছে এই দুনিয়ার ব্যাংক ব্যালেন্সের কোন দাম নেই – এরা টাকা কামাই করার মেশিনের জায়গা থেকে মানুষের পর্যায়ে উঠতে পেরেছে। ইসলাম শেখা আর শেখানোর জন্য যে মানুষগুলো নিজেদের জীবনের পার্থিব সুখ-স্বচ্ছলতাকে পরিত্যাগ করল তাদের অপমান করার অধিকার কে দিল আপনাকে?

স্যার, অর্থনীতিতে শ্রমবন্টনের কথা পড়েছেন নিশ্চয়ই। আমাদের দেহের কোষ আর টিস্যুর মত আল্লাহ সমাজেও শ্রমবন্টন করে রেখেছেন সমাজটা যাতে চালু থাকে। মেয়েরা কোমল তারা এক ধরণের কাজ করবে, পুরুষরা রুক্ষ তারা অন্য ধরণের কাজ করবে। গাড়ীর টায়ার থাকবে বাইরে, সে শক্ত রাস্তার ঘর্ষণ সহ্য করবে, টিউব থাকবে ভিতরে – সে টায়ারটাকে ফুলিয়ে সচল রাখবে। টিউব কেন সারাজীবন ভিতরে থাকবে – এই বৈষম্য মানি না বলে সে যদি রাস্তায় নামে তবে কতদূর চলবে গাড়ী? মেয়েরা অবশ্যই শিক্ষিত হবে কিন্তু টাকা কামাই তাকে করতেই হবে এ দিব্যি কে দিয়েছে? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কেবল ডিগ্রি নেয়া আর চাকরি করা? আমার স্ত্রী যদি আমার ছেলের সাথে আরো দশটা বাচ্চা পড়ায় আমার

আপত্তি নেই, কিন্তু তাকে কেন আমি শতাব্দী বাসের দমবন্ধ ধাক্কাধাক্কির মধ্যে ঝুলতে ঝুলতে গুলশানে অফিস করতে পাঠাব? সে যে টাকা কামাই করে আনছে তা যদি ডে-কেয়ার আর রেডিমেড ফুডেই খরচ হয়ে যায় তাহলে লাভটা হল কি? আমার স্ত্রী যদি ব্যাংকে বা মোবাইল কোম্পানীর কাস্টমার কেয়ারে হাজারো অজানা মানুষের সেবা করার চেয়ে তার প্রিয়জনদের সেবা করা বেশী পছন্দ করে তাহলে কেন আমি তাকে ঘরের বাইরে যেতে বাধ্য করব? সামর্থ্যনুযায়ী আমি তাকে ডাল খাওয়ালে সে যদি খুশী থাকে তাহলে আমি প্রতিদিন মাংশ খাওয়ার লোভে কেন নটা-পাঁচটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর দাসীগিরি করতে বাধ্য করব? সে ঘরে থাকবে এটা তার 'চয়েস' – এখানে আপনার এত গাত্রদাহ কেন?

পথে খালি পায়ে বের হলে পায়ে ময়লা লাগে, শক্ত নুড়িকণা পা ক্ষত-বিক্ষত করে। সারা পৃথিবী চামড়ায় না ঢেকে নিজের পাটা জুতোয় পুরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। দেশ স্বাধীন হবার পরে আধুনিকতার জোয়ারে আপনারা সমাজকে যে স্রোতে চালিয়েছেন তাতে আত্মসম্মান রক্ষা করার সবচেয়ে ভাল উপায় পর্দা করা।

একটা মেয়ে এই সরল যুক্তিটা বুঝে নিজেকে ঢেকে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে আপনার পরমতসহিষ্ণুতা হঠাৎ পালিয়ে যায় কেন? আপনাকে কেন আপনার ছাত্রীর চেহারা দেখে চিনতে হবে? চিনলে আপনার কটা পেপার বেশি পাবলিশ হবে? তার গ্রেড কত বাড়বে? সে তো দেহে পর্দা করেছে, মগজে না, তার মেধা দিয়ে তাকে পরিমাপ করতে আপনার কেন এত আপত্তি?

ভাষা আন্দোলনের বোরখার অনুপস্থিতি যদি নারী প্রগতি হয় তাহলে আজ কেন শাড়ির অনুপস্থিতি ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালীত্ব না হয়ে আধুনিকতার চেহারা নিল? শাড়ি পড়া মেয়েরা আন্দোলন করে যে ভাষা আনল সেটাতে কেন জিন্স-ফতুয়া পড়া মেয়েরা কথা বলছে না? তারা যে ভাষায় কথা বলছে তার নাম কী? সুদূর আমেরিকাতে কেন বাংলাদেশের তরুন প্রজন্ম ভারতীয়দের সাথে হিন্দিতে কথা বলে? বাড়িতে বাড়িতে বিয়েতে হিন্দি গান বাজে, আপনাকেও সেই চটুল কথা-সুরের সাথে নাচতে দেখেছি। আপনার আপত্তি কি আসলে এখানে যে আমাদের হিন্দি গানের সাথে নাচতে রুচিতে বাধে? একটা মেয়ে স্বামীর বদলে হাজারো মানুষের সামনে বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করে মনরঞ্জন করবে এটাকে আমরা প্রগতি বলি না স্যার, নোংরামো বলি। একটা ছেলে ছটা মেয়ের সাথে শুয়ে বাপের পয়সা গুণে সপ্তমটাকে

বিয়ে করবে – এটা আমাদের কাছে পবিত্র প্রেম মনে হয় না স্যার, দুঃখিত। এটা লুইচ্চামি, ভন্ডামী। আমি লম্বা জামা পড়ে, মুখে দাড়ি রেখে, গোড়ালি অবধি প্যান্ট গুটিয়ে মাথা নিচু করে পথ চলব, আমি আমার তরুণ ভাইদের তা করতে বলব। আপনি আমার গায়ে মৌলবাদের তকমা দেন, আমার একটুও যায় আসে না।

স্যার আপনি যেমন আপনার আত্মাকে এক অজানা প্রভুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন তেমন আমিও আমার দেহ-মন-জীবন-মরণ আমার প্রভু আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। স্ত্রী-সন্তানসহ পুরো পরিবারকে উৎসর্গ করেছি। শুধু আমি না স্যার, আমার মত লাখো মুসলিম তরুণ আছে যারা নিজেদের এভাবেই আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করে দিয়েছে নিজেদের। পাকিস্তানে কেন এত জঙ্গী জানেন স্যার, কারণ সে দেশের কিছু মানুষ দেশটিকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা আমাদের দেশকে কারো কাছে বিক্রি করতে দেব না, তাতে আপনি আমাকে হিজবুত তাহরির ভাবেন আর শিবির। জঙ্গী ব্যবসা মাল্টিমিলিয়ন ডলারের ব্যবসা, দেশে জঙ্গী আছে এই হুজুগ তুলতে পারলে অনেক টাকা ভিক্ষে পাওয়া যায়। আমাদের তরুণ সমাজকে লুলা-কানা বানিয়ে সুশীল সমাজকে ভিক্ষে ব্যবসা করতে দেব না, যদি মরে যাই তো যাব – আপনারা জঙ্গী বললেও আল্লাহ জানেন আমরা আমাদের দেশকে কত ভালবাসি, দেশের মানুষকে কত ভালবাসি। কারণ আমি মুসলিম, আমি নিজের জন্য বাঁচিনা, আল্লাহর জন্য বাঁচি।

আপনি আমাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেন না কিন্তু আমরা আমাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখি। কিন্তু সেই স্বপ্ন শুধুই পার্থিব ভোগ-বিলাসের সুখস্বপ্ন না। প্রত্যেকটা পুরুষ যেন হালাল রুযি কামাই করে পরিবারসহ দু'বেলা খেতে পারে সেই স্বপ্ন। প্রত্যেকটা মেয়ে যেন শিক্ষিত হয়, সন্তানকে নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে শেখায়, নীতিবোধ শেখায় সেই স্বপ্ন। আমরা শুধু স্বপ্ন দেখি না স্যার পরিকল্পনাও করি। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করি। আমাদের এ চেষ্টায় আপনার প্রভু যেমন খাপ্পা তেমনি আপনিও। কিন্তু বিশ্বাস করেন আমরা আপনার উপর ক্ষুব্ধ নই, আপনার জন্য শঙ্কিত। আপনি যাকে প্রভু হিসেবে নিয়েছেন সে মানুষকে প্রতারণা করে স্যার, সে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আপনার জন্য করুণা হয় স্যার, আপনি এত কিছু বুঝলেন – ইসলামটা বোঝার চেষ্টা করলেন না? যিনি আপনাকে মাথা ভরে মেধা দিলেন, সোনা দিয়ে

গড়া লেখার হাত দিলেন তার বিরুদ্ধে কতক্ষণ যুদ্ধ করবেন স্যার? আর কতদিন যুদ্ধ করবেন? আপনি যে হেরে যাচ্ছেন সেটা কি আমাদের বড় হওয়া বলে দিচ্ছে না?

শ্রদ্ধেয় জাফর ইকবাল স্যার, আমি আপনার হিদায়াতের জন্য দু'আ করি যেন আপনি ইসলামের মর্ম বুঝে মুসলিম হয়ে মারা যেতে পারেন। আমি যেন আমার শৈশবের হিরোর জানাযা পড়তে পারি।

১৬ যুল-হিজ্জা, ১৪৩২ হিজরি।

Contents

আল্লাহর আইন

কন্ধকাটা নামে এক ধরণের ভূত আছে, যাদের নাকি মাথা নেই। হলই না হয় ভূত, মাথা ছাড়া কিভাবে সে দেখে, কথা বলে, আবার মানুষকে খুঁজেপেতে ধরে ভয় দেখায় - তা আমার বোধে আসে না। তবে কন্ধকাটা ভূত না দেখলেও এক ধরণের কন্ধকাটা চারপাশে হরহামেশাই দেখি – এর নাম কন্ধকাটা ইসলাম। ইসলামের মাথা তাওহিদ - তা ছাড়া দেহের বাকি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজো। মুসলিম দাবীকারী অসংখ্য মানুষকে তাওহিদ বিহীন কন্ধকাটা ইসলাম কাঁধে নিয়ে ঘুরতে দেখলেও আমরা যেন ভয় না পাই, তাই আল্লাহ কুরআনের সুরা ইউসুফে বলেছেন:

> অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে শির্কও করে।[79]

তাওহিদকে বোঝাবার সুবিধার জন্য আলিমরা তিন ভাগে ভাগ করেছেন, তার প্রথম দু'টো হল:

- তাওহিদ-আর-রুবুবিয়াত: আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, তার গুণাবলী ও কাজে তাকে একক মনে করা।
- তাওহিদ-আল-উলুহিয়াত: মানুষের কাজের সাথে জড়িত, আল্লাহর স্থানে অন্য কাউকে/কিছুকে এনে না বসানো।

এ দুটোই গুরুত্বপূর্ণ, একটাকেও অগ্রাহ্য করলে আল্লাহ ছাড় দেবেন না। তবে আমাদের কাছে বিবেচ্য হল মানুষ ভুল করে কোনটাতে? বেশীভাগ মানুষ ভুল করে তাওহিদ-আল-উলুহিয়াতে। যেমন, আল্লাহ সবকিছু দিতে পারেন এ বিশ্বাস কম-বেশী সব মুসলিম করে, এটা তাওহিদ-আর-রুবুবিয়াত। কিন্তু যখন সে মাজারে যায় কিছু চাইতে তখন তার কাজটা হয় তাওহিদ-আল-উলুহিয়াতে শির্ক। কারণ সে ভাবছে আল্লাহ দেন ঠিক আছে, কিন্তু মৃত এই বুজুর্গ অনেক ভাল ছিল বিধায় তার কথা শুনে আল্লাহ আমাকে একটু তাড়াতাড়ি দেবেন। অজ্ঞানতা থেকে জন্ম নেয়ে শির্ক এভাবে তাওহিদ-আল-উলুহিয়াতকে নষ্ট করে দিতে পারে।

79 সুরা ইউসুফ, ১২:১০৬

তাওহিদ-আর-রুবুবিয়াত ঠিক থাকার পরেও তাওহিদ-আল-উলুহিয়াতে সমস্যা হতে পারে, এবং এটাই বেশীভাগ সময় হয়। এছাড়াও আরো অনেক কাজের মাধ্যমে মানুষ তাওহিদ-আল-উলুহিয়াতকে নষ্ট করতে পারে। 'কন্ধকাটা ইসলাম' কে 'আসল ইসলাম' মনে করা মানুষেরা তাওহিদের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পর্কে অন্ধকারে আছে তা হল 'আল্লাহর আইন'। মুসলিম নামধারী কেউ ভাবছে 'আল্লাহর আইন' বর্বর, কেউ ভাবছে দেশে এই আইন না থাকলে বুঝি আমরা সবাই কাফির।

ন্যায়-অন্যায় একেকজন মানুষ একেক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে। আজ থেকে দু'শ বছর আগে কোন কৃষক নীল চাষ করতে না চাইলে তার স্ত্রী-কন্যাকে ঘর থেকে তুলে নীলকুঠীতে নিয়ে ধর্ষণ করাটা ব্রিটিশ সাহবেদের কাছে খুবই ন্যায্য মনে হত, আজ তারা মুসলিম আইনে বিচার অমানবিক - এই মর্মে কথা তোলে। আজ ব্রিটিশ মন্ত্রীরা ভাবছে সমকামিতা মানুষের অধিকার, হয়ত দুশ বছর পর যখন দেখবে দেশ চালানোর মানুষ নেই, তখন আবার তারা অন্য কথা বলবে। আমরা মুসলিমরা তাই কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল সেই বিচার আল্লাহর হাতে তুলে দেই যেন সকল যুগে, সকল জাতের মানুষের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় একই রকম থাকে। এতে ক্ষমতালোভীরা আইনকে নিজেদের সুবিধায় ব্যবহার না করতে পারে না, আবার সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার পায়, পৃথিবীতে শান্তি থাকে। মুসলিমরা অন্যায়ের সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য যেমন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তেমনি সেই অপরাধের সাজা কী হবে তা জানতে আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়। আল্লাহর আইন মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী কল্যাণ আনবে এবং সেই আইনের কাছে আমাদের সবার আত্মসমর্পণ করা উচিত – এই বিশ্বাস তাওহিদ-আর-রুবুবিয়াত। বিচারের ক্ষেত্রে তাওহিদ-আল-উলুহিয়াত মানে এই নয় যে, আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা হিসেবে মানতে হবে, বরং তাকে সর্বোচ্চ আইনদাতা হিসেবে মানতে হবে। আল্লাহ নিজে কিছু আইন প্রণয়নের সাথে সাথে কিছু মূলনীতি শিখিয়ে মানুষকেও আইন প্রণেতা হবার অনুমতি দিয়েছেন। সেই মূলনীতিগুলো ব্যবহার করে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার চারজন খলিফা আমাদের জন্য ইসলামী আইনব্যবস্থার রূপরেখা দিয়ে গেছেন। এটা দিয়ে একজন মুসলিম শাসক শাসন করবেন, একজন মুসলিম বিচারক বিচার করবেন – সেটা হবে তাওহিদ-আল-উলুহিয়াত।

একজন মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহর আদেশকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া, সেটা যতদূর সম্ভব নিজের জীবনে প্রয়োগ করা। আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি যখন পৃথিবীর খুব কম দেশেই আল্লাহর আইন প্রচলিত আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের নিজেদের জীবনে আল্লাহর আইন থাকবে না। দেশ, সমাজ বা সময়ের দোহাই দিয়ে জীবনে আল্লাহর হুকুমের গুরুত্ব কমানোর অবকাশ নেই। সাধারণ মুসলিমের কর্তব্য একটিই:

“আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন আনুগত্য নেই”[৪০]

অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের বিরোধীতায় অন্য কোন হুকুম সে মানবে না। এজন্য যদি তাকে ভোগান্তির শিকার হতে হয় তবে সেটাই তার জন্য পরীক্ষা যার বিনিময়ে সে জান্নাত পাবে। ফ্রান্স যদি প্রকাশ্যে হিজাব নিষিদ্ধ করে তাহলে সেখানকার মুসলিমরা সেখান থেকে হিজরত করে কোন মুসলিম দেশে চলে আসবে। সেজন্য যদি তাদের জীবন যাত্রার মান নেমে যায়, কষ্ট করতে হয় – তারা সেটা করবে। আখিরাতে অনন্তকালের সুখ-শান্তি ভোগ করতে হলে দুনিয়ার কিছু আরাম তো ত্যাগ করতেই হবে।

যে দেশের বিচার ব্যবস্থায় আল্লাহর আইন চলে না সেখানে একজন মুসলিম উকিল বা বিচারক হবেন না, আল্লাহ তাকে কোন না কোন একটা রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি এমন ভাইয়ের কথা জানি যিনি ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পড়ে দেশে এসে ইসলাম বোঝার পরে সেই সার্টিফিকেট আলমারিতে তুলে আইন ব্যবসায় ইস্তফা দিয়েছেন - তিনি তো না খেয়ে মরে যাচ্ছেন না। হয়ত তিনি মাসে লাখ টাকা কামাই করছেন না, কিন্তু তিনি তো আখিরাত কামাই করলেন। কোন মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র মানুষকে শির্ক করতে বাধ্য করে এমন অবস্থা খুব কমই হয়। যদি আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ ইসলাম অনুযায়ী চলে সেটা আমাদের সৌভাগ্য, কারণ সেখানে ফিতনা কম থাকবে বলে আমরা সহজে ইসলাম পালন করতে পারব। তারপরেও রাষ্ট্র কিন্তু আমাদের হয়ে ইসলাম পালন করে দেবে না; আমাদের নিজেদের জীবনে নিজেদেরকেই ইসলাম আনতে হবে। আবার রাষ্ট্র যদি ইসলাম মোতাবেক না চলে, কিন্তু আমি যদি নিজের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যথাসাধ্য তাওহিদ বাস্তবায়ন করি সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট। রাষ্ট্রকে ইসলামসম্মত ভাবে চালানোর দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের,

৪০ সহীহ বুখারি – ৭২৫৭, সহীহ মুসলিম - ১৮৪০

আমার নয়। আমার কর্তব্য তাকে ভাল কাজ সাহায্য করা, তার ইসলাম বিরোধী নয় এমন সকল আদেশ মানা এবং ইসলাম বিরোধী আদেশ অমান্য করা। যদি রাষ্ট্র অনৈসলামিক আদেশ মানতে এমনভাবে বাধ্য করে যে সেটা না করলে মৃত্যু অনিবার্য তাহলে আল্লাহ সেক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন, কারণ তিনি কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।[81] ইবনে আব্বাসের সূত্রে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর ভুল করা, ভুলে যাওয়া এবং বাধ্য হয়ে করা অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।[82]

তাওহিদ-আল-উলুহিয়াত একজন মানুষ কত নিখুঁত ভাবে পালন করতে পারল তার উপর নির্ভর করবে আখিরাতে তার পুরস্কার। ধরা যাক রাষ্ট্র আইন করল: ছেলে ও মেয়েকে সমান সম্পত্তি দিতে হবে। একজন বাবা দিলেন না, তিনি তার সন্তানদের বুঝিয়ে বললেন: ইসলামের বিধানানুযায়ী ছেলে, মেয়ের দ্বিগুণ পাবে। এখানে রাষ্ট্র কি করবে? বাসায় এসে খোঁজ নিয়ে যাবে কাকে কতটুকু দেয়া হল? না, এতটা তদারকি করা সম্ভব না। এক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানার জন্য সেই বাবার সদিচ্ছাই যথেষ্ট। ধরি, ঐ বাবার এক মেয়ে ইসলাম মানে না বিধায় আদালতে গিয়ে মামলা করে, সমান সম্পত্তি জিতে নিল। এখানে তাওহিদ-আল-উলুহিয়াতকে খন্ডন করল মেয়ে, বাবা নয়। এখানে রাষ্ট্রের আইনপ্রণেতা আল্লাহর আইনের বিপক্ষে আইন করে কুফরি করলেন, বিচারক সেই আইন দিয়ে বিচার করে কুফরি করলেন এবং মেয়ে আল্লাহর আইনের বদলে মানুষের আইনের বিচার কামনা করে কুফরি করল। অথচ পিতা তাওহিদ-আল-উলুহিয়াত রক্ষা করলেন কারণ তিনি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে রাষ্ট্রের আইন মেনে ভাগ করেননি। আবার, ধরা যাক কোন দেশে মেয়েরা অর্ধেক সম্পত্তি পাবে এ ইসলামী আইনটাই সরকারী আইন। কিন্তু কোন মেয়ে যদি সেই ইসলামী আইনটা ঘৃণা করে – আল্লাহকে অসমবন্টনকারী মনে করে, তাহলে সে অর্ধেক সম্পত্তি পেয়েও কুফর আকবার করল। অপরদিকে আগের প্রেক্ষাপটে বাবা তার নিজের অর্জিত সম্পদ মেয়েকে সমান ভাগ দিতে বাধ্য হয়েও তাওহিদ অক্ষুন্ন রাখলেন।

81 সুরা আল-বাকারা, ২:২৮৬
82 ইবনে মাজাহ, বায়হাকি, ইমাম নববীর ৪০ হাদিস

আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে, হয় ইহকালে নয়ত পরকালে; এপারে চোরের হাত কাটা গেলে ওপারে সে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেত। কিন্তু আমাদের রীতিতে শিক্ষিত চোরকে প্রমোশন দেয়া হয় যেন সে আরো বড় চুরি করতে পারে। ছিঁচকে চোরকে জেলে রেখে সৎ মানুষদের করের টাকায় থাকা-খাওয়া সহ ঘাঁঘু অপরাধীদের কাছ থেকে ট্রেনিং নেয়ার বন্দোবস্ত করে দেয়া হয়। আল্লাহর আইন থাকলে হয়ত এরা শুধরে যেত; অথচ ব্রিটিশদের থেকে নকল করে তৈরী করা আইনব্যবস্থা অপরাধীদের ছোট শয়তান থেকে বড় শয়তান বানায়! আল্লাহর আইনের হাত আসলেই লম্বা - সেটা পৃথিবী ছেড়ে কবর, কবর ছেড়ে বিচার দিবস পর্যন্ত পৌছবে। তা শুধু সাধারণ অপরাধীদের বিচার করবে না, আমারও বিচার করবে। বাংলাদেশের সরকার আমাদের মসজিদে যেতে বাধা দিচ্ছে না, কিন্তু আমরা তাও কেন আযান শোনা সত্ত্বেও বাসায় সলাত পড়ছি? যে মহান আল্লাহ যিনাকারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদেশ দিয়েছেন, সেই তিনিই তো পুরুষদের জামাতে সলাত পড়তে হুকুম করেছেন[83]। আমাদের প্যান্টের ঝুল কেন গোড়ালির নিচে? কেন আমাদের দাড়ি চেঁছে পশ্চিমা সংজ্ঞায় ধোপ-দুরস্থ হতে হবে? কেন সুদী ব্যাঙ্কে আমার টাকা থাকবে?

দেশে আল্লাহর আইন আনার পূর্বশর্ত নিজেদের জীবনে তাওহিদ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা। সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ যতক্ষণ না তাওহিদ না বুঝছে, না মানছে ততক্ষণ দেশে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা হবে না। “আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই” – স্লোগান দেয়া দলগুলোকে মসনদের কোণায় গিয়ে বসা জন্য আল্লাহর রসুলকে উপেক্ষা করে নারী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। এরপরের পাঁচ বছরে পদে পদে আল্লাহর আইন অপমানিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাওহিদ ভূলুন্ঠিত হতে দেখেছি শহীদ মিনার নামক কায়াহীন মূর্তিতে ফুলেল নৈর্বেদ্য অর্পণে। ইসলাম প্রচারকারী কুয়েতী এনজিও বন্ধ হয়েছে, অথচ একই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকারীর ছদ্মবেশের শত এনজিও দেশ ভাঙার ষড়যন্ত্র করার অনুমতি পেয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাওহিদের পক্ষে কথা বলার অপরাধে বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারাভোগ করেছেন, আর এদিকে মুক্তমনা-সচলেরা ইসলামকে অপমান করার ফ্রি লাইসেন্স পেয়েছে।

83 http://www.islamqa.com/en/ref/72398

আমাদের সমাজে যারা প্রথম থেকেই তাওহিদের মূল অংশগুলোর বদলে আল্লাহর আইন নিয়ে মেতে আছেন তারা আসলে ভেবে দেখছেন না যে, আল্লাহর আইন অনেক গুরু দায়িত্ব, অনেক শক্তিশালী এক অস্ত্র। এ অস্ত্র আল্লাহ রাম-শাম-যদু-মধুর হাতে তুলে দেবেন না, আমাদের নিরাপত্তার জন্যই দেবেন না। আমাদের দেশের সন্ত্রাসীরা পাঁচশ টাকা দিলে মানুষ খুন করে দেয়। তখন আর কষ্ট করে খুন করা লাগবে না, একটা বাজারের মেয়ে আর চারজন মিথ্যা সাক্ষী – সবাইকে একশ টাকা করে দিয়ে কাজীর কাছে নিয়ে গেলেই খুব সৎ একজন মানুষেরও মৃত্যুদন্ডের ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে। সম্প্রতি সৌদি আরবে চার বছর ধরে বিচার চলার পরে দেয়া মৃত্যুদন্ডের আদেশে এ দেশের ভাল ভাল মুসলিমরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তাতে আমাদের বুঝে যাওয়া উচিত তাওহিদের শীর্ষ নয়, তাওহিদের মূল থেকে কাজ শুরু করতে হবে। আল্লাহ আল-হাকিম, তিনি সর্ব-বিজ্ঞ, তিনি আল-আদিল, তিনি সর্বাধিক ন্যায়বিচারক, তাওহিদ-আল-আসমা-ওয়াস-সিফাতের এই প্রাথমিক জিনিসগুলো যারা জানে না, তাদের মাঝে ইসলামী আইন কায়িম করার স্বপ্নটা খুবই উচ্চাভিলাসী। যে জাতি মানুষকে পিটিয়ে মারাকে ন্যায়বিচার ভাবে, যে দেশে বিচারককে টাকা দিয়ে কিনে ফেলা যায়, পঞ্চাশ টাকাতে আদালতের সামনে সাক্ষী ভাড়া পাওয়া যায়, পুলিশকে আলু-পটলের মত বেচা-কেনা করা যায় – সে দেশে ইসলামি আইন দিয়ে নষ্টেরা সুবিধে নিত, সৎ মানুষেরা আরো বেশী অত্যাচারিত হত। যে দেশের মানুষ পীরের তাবিয নিয়ে ডাকাতি করতে যায়, কবর ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে, মাটির একটা মূর্তিকে মা ডেকে হাতির পিঠে কল্পনা করে ভাল ফসলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়, সংবিধানে "আল্লাহর উপর ভরসা" – কথাটি থাকায় লজ্জা পায়; সে দেশে আল্লাহর বিধান আসবে কিভাবে? এ দেশের বিশিষ্ট ইসলামী-কমিউনিস্ট বিপ্লবী ফতোয়া দেন: ইসলামে কোন শাস্তির বিধানই নেই, এটা বনি ইসরাইলদের ষড়যন্ত্র – এমন ইসলামী আন্দোলনের হাত থেকে আল্লাহ আমাদের হিফাজাত করুন।

আমাদের মূল সমস্যা হল আমরা মানুষকে ইসলাম মানাতে উন্মুখ, নিজেরা মানতে রাজী নই। আমরা কেবলই ভুলে যাই যে, আল্লাহর সামনে আমার কাজের জন্য আমাকে জবাবদিহী করতে হবে, অন্যের কাজের জন্য না। অন্যেরা কী করেছিল সে দোহাই দিয়ে সেদিন মুক্তি পাওয়া যাবে না। আমি আল্লাহর আইন চাই – সবার আগে সে আইনের সামনে হাটু গেঁড়ে বসব আমি নিজে, আমার পরিবার, তারপর আমার অধীনের যারা আছে তাদের সবাই। যারা

আল্লাহর আইনের বিরোধীতা করছে তাদের আগে বোঝাব: আল্লাহ কে? তাওহিদ কী? লা ইলাহা ইল্লালাহ বলে মুসলিম হবার মানে কী? হতে পারে আমি একা, কিন্তু আল্লাহ তো দেখবেন আমি কতটা চেষ্টা করেছিলাম এবং কিভাবে করেছিলাম। বৃষ্টির প্রথম ছোট্ট ফোঁটাটা যখন পানির বুকে আঁছড়ে পড়ে তখন সে জায়গাটাকে কেন্দ্র করে ছোট্ট একটা ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউটা তার চারপাশে খুব মৃদু আলোড়ন তৈরী করে। যখন এমন হাজারটা বৃষ্টিকণা নেমে আসে আকাশ থেকে তখন রিমঝিম শব্দের জন্ম হয় পানির কম্পনে। যখন বর্ষণ চলতেই থাকে তখন পুকুরের পানি প্লাবিত হয়, চারপাশের বাঁধাটা ডিঙ্গিয়ে যায়। আল্লাহ যেন আমাদের এই বৃষ্টিকণাদের দলে একটি বিন্দু হবার সুযোগ দেন। আমিন।

১৮ যুল-ক্বাদা, ১৪৩২ হিজরি।

ডেসটিনি না শয়তানী?

খুব বেশী দিন আগের কথা নয়। কোকাকোলা তখন পাওয়া যেত কাচের ছোট বোতলে। মাঝে মধ্যেই বিক্রি বাড়ানোর জন্য এর ধাতব ঢাকনির নিচের গুপ্তধনের লোভ দেখানো হত। হয়ত এক কোটি বোতলের মধ্যে একটিতে গাড়িরছবি, তিনটিতে মোটর সাইকেলের ছবি আর একশটিতে টি-শার্টের ছবি একে বাজারে ছেড়ে দেয়া হত। মানুষজনকে পেপার, টিভিতে এমনভাবে বিজ্ঞাপনে ভুলিয়ে দেয়া হত যে পরিসংখ্যানের শিক্ষকও মনে করতেন কোক খেলেই গাড়ি পাওয়া যাবে। আর গাড়ি না মিললেও নিদেন পক্ষে মোটর সাইকেল তো মিলবেই। ফলাফল - কোকের রমরমা ব্যবসা হত। আট লাখ টাকার পুরষ্কার আর বারো লাখ টাকার বিজ্ঞাপন - একুনে ২০ লাখ টাকা খরচ করেপ্রতি বোতল মাত্র দুই টাকা লাভেও দু'কোটি টাকা হাতিয়ে নিত ধুরন্ধর কোমল পানীয়ের কোম্পানিগুলো। অবস্থা এমন হল যে শেষে হাইকোর্ট এ ধরণের আগ্রাসী বিপণন বন্ধ করতে নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিল।

মার্কেটিং বা বিপণনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র মানুষের লোভ। আর এই লোভ ব্যবহার করে যত ধরণের নোংরা ব্যবসা টিকে আছে তার অন্যতম হল এমএলএম বা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং। আমার এ নাতিদীর্ঘ জীবনে বহু এমএলএম কোম্পানিকে আসা যাওয়া করতে দেখেছি, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত সফলভাবে পুরো একটা দেশকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরতে পেরেছে ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড।

চার মাস আগে থেকে যখন এই লেখার প্রস্তুতি শুরু করি -এদের বই, পত্রিকা, সিডি, ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল যোগাড় করে দেখতে দেখতে তখন থেকেই এদের ধূর্ততার সূক্ষ্মতায় আশ্চর্য হয়ে যাই। এদের সাফল্যেরকারণ বিশ্লেষণে আমি তিনটি মূল বিষয় পেয়েছি –

১. নিয়মতান্ত্রিকতা,

২. ধর্মীয় ও সামাজিক অপব্যাখ্যা,

৩. লোভের পারমাণবিক বিষ্ফোরণ।

এদের প্রতিটা কাজ দেশের প্রচলিত আইন মেনে করা হয়, প্রতিটি আইনের ফাঁক-ফোঁকর কাজে লাগানোর জন্য একটি দক্ষ আইনজীবি দল পোষা হয়। কর আদায় হয় কড়ায় গন্ডায় যেন সরকারের মুখ বন্ধ থাকে। খুব উচু মানের একাউন্টিং সফটওয়ার দিয়ে প্রতিটা হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। পেপারওয়ার্ক এমনভাবে করা হয়, চুক্তিগুলো এমনভাবে সাজানো হয় পাক-হানাদার বাহিনীর অত্যাচার কৌশলের মত। কাচের বোতলে গরম পানি ভরে পায়ের তলায় মারলে কোন দাগ পড়েনা, কিন্তু এত ব্যাথ্যা হয় যে অত্যাচারী ব্যক্তি দাঁড়াতেই পারেনা, পালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। একবার যে ডেসটিনির সাথে ব্যবসায় ঢুকে পড়েছে তার দুটি রাস্তা খোলাথাকে -ক্ষতি সহ্য করে চুপচাপ পালিয়ে যাওয়া নয়ত ডেসটিনির অংশ হয়ে আরো মানুষদের শিকার করে নিজের ক্ষতিকে লাভে বদলে দেয়া।

ডেসটিনির নিজস্ব শরীয়া বোর্ড আছে, সত্যিকার অর্থেই অর্থ দিয়ে পোষা কিছু আলিম আছে। এদের কাজ আল্লাহর আইনকে অপব্যাখ্যা করা। এই অপব্যাখ্যা ক্ষেত্র বিশেষে স্থুল - যেমন বিয়ের আগে খাদিজা (রাঃ) এর সাথে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মুদারাবা ব্যবসা ছিল তা নাকি এমএলএম ছিল। আবার কখনো তা খুবই সূক্ষ্ম, যেমন- নেটওয়ার্কিং এর সাথে পণ্য বিক্রয়কে যুক্ত করেছে কিন্তু তার জন্য আলাদা আলাদা চুক্তিপত্র করার মাধ্যমে এরা মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসা আলিমদেরও ধোঁকা দিয়েছে। এরা ভাড়া করে কবি-সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এমপি-মন্ত্রীদের তাদের অনুষ্ঠানে আনে। এরা সবাই অকুন্ঠ কন্ঠে ডেসটিনির প্রশংসা করে, বেকারত্ব দূর করার মহান প্রয়াসের সার্টিফিকেট দেয়। সাধারণ মানুষের ঘাড় ভাঙাকে এরা দেশের উন্নতির জন্য কাজ বলে তকমা দেয়, তাকে শুধু কর্ম না বরং পূণ্যকর্ম, পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে দেখতে বলে।

এমএলএম তথা ডেসটিনির মূল ব্যবসা যে ইসলাম সম্মত নয়, মানবরচিত আইনকে পুঁজি করে মানুষ ঠকানোর একটা খেলা তা শ্রদ্ধেয় সহকর্মী জিয়াউর রহমান মুনশীর ‘‘ইসলামে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) এরবিধান’’ শীর্ষক লেখাটিতে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এটি ড. মানযুরে ইলাহীর সম্পাদনার পর ইসলামহাউস ওয়েবসাইটে[84] সংরক্ষিত হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকলেও এক কথায় বললে - যে কাজ করবে সেই ফলভোগ করবে এটাই ইসলামের মূলনীতি। কোন ঝুঁকি ছাড়াই বসে বসে আমার মেহনতের

84 http://www.islamhouse.com/p/344613

লাভ লুটবে আপলাইনের একশ জন - এই বাটপারী ইসলামে নেই।আমি কোন কিছু বিক্রি করলে আমি কমিশন পেতে পারি, কিন্তু অন্য কেউ নয়।

এগুলো গেল ডেসটিনির বাহ্যিক রূপ। কিন্তু এর যে চেহারাটা আলিম কিংবা তাত্ত্বিক - যারাই ডেসটিনির বাইরের লোক তারা ধরতে পারছেনা সেটাই এর সবচেয়ে ভয়াবহ দিক। আর তা হচ্ছে ডেসটিনির ব্রেন-ওয়াশ। এর পরিচালকের ভাষায় তারা মানুষকে প্রোগ্রাম করেন যেভাবে একটা রোবটকে ম্যাশিন ল্যাংগুয়েজে প্রোগ্রাম করা হয়। এই ব্রেন-ওয়াশ শেষ হলে সে একটি নতুন মানুষের পরিণত হয়। এই নতুন মানুষ সকল নীতিবোধ, বিবেচনাবোধ আস্তাকুড়ে ফেলে ডেসটিনি সাম্রাজ্যের একটি ভাইরাসে রূপান্তরিত হয়। তখন থেকে এ আর একা একা বাঁচতে পারেনা, পরজীবি ভাইরাসের মত অন্য সুস্থ মানুষকে সে আক্রমণ করে। দখল করতে সফল হলে হয় সে চেষ্টা করে সেটারও মনুষ্যত্ব নষ্ট করে আরেকটা ভাইরাস তৈরী করতে। যারা জীববিজ্ঞান পড়েছেন তারা বুঝবেন -ভাইরাসের লাইসোজেনিক জীবনচক্রের মত এখানেও একের পর এক চক্র চলতেথাকে যতক্ষণ না পুরো দেহটাই দখল হয়ে যায়।

এই ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য আমাদের আগে ‘দাসত্ব’ - এই ব্যাপারটি বুঝতে হবে। দাস বা গোলাম বলতে আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্যটি ভাসে তা হল - পায়ে বেড়ি পড়া কিছু শৃংখলিত মানুষ যারা প্রভুর আদেশে কাজ করে চলেছে, আদেশের বাইরে গেলেই তাদের চাবুক মারা হচ্ছে। দাস আর চাকরের পার্থক্য হচ্ছে -দাস পরাধীন আর চাকর স্বাধীন। চাকর কাজ করার বিনিময় পায়, কাজ না ভালো লাগলে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু দাসের ভালো লাগুক আর না লাগুক তাকে কাজ করেই যেতে হয়।চাকরের service আর দাসের slavery এর মধ্যে পার্থক্য হল স্বাধীনতা। আমরা জানি আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার দাসত্বেরজন্য। কিন্তু এই দাসত্বের সাথে আগের দৃশ্যপটের দাসত্বের পার্থক্য কী? এখানেও পার্থক্য স্বাধীনতা!

একজন মানুষ কখনোই শখ করে, খুশি হয়ে অন্য একজনের মানুষের ক্রীতদাস হয়না, হবার কোন কারণওনেই। কিন্তু একজন মুসলিম খুশি মনে, স্বেচ্ছায় আল্লাহর কাছে নিজেরস্বাধীনতা বিক্রি করে দেয়। কেন?

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন -সব প্রশংসা এই বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালকের জন্য যিনি আমাকে, আমার চারপাশের সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করছেন। - তাওহিদ আর রুবুবিয়াহ।

আর রহমানির রহিম -তিনি তার পরম দয়া দিয়ে আমাকে, আমাদের সবাইকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। - তাওহিদ আর রুবুবিয়াহ।

মালিকি ইয়াওমিদ্দিন -এই পৃথিবীতে যত অন্যায় হয়েছে তার শাস্তি তিনি একদিন দেবেন, যত ভাল কাজ হয়েছে তার পুরষ্কার তিনি এক দিন দেবেন। - তাওহিদ আর রুবুবিয়াহ।

ইয়্যাকা না'বুদু -আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি। - তাওহিদ আল ইবাদাহ। যিনি আমাকে সৃষ্টি করলেন, প্রতিপালন করছেন, যিনি আমার কাজের প্রতিদান দেবেন, আমাকে অনন্তকালের জন্য স্বাধীনতা দেবেন -পৃথিবীর এই ক্ষণিক জীবনে আমি তার খুশি মনে তার দাসত্ব করতে রাজী হলাম।

আবিদ অর্থাৎ উপাসক আর আব্দ বা দাসের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উপাসনার কিছু নিয়ম আছে আর তা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু একজন মুসলিম তার জীবনের চব্বিশ ঘন্টাই দাস। সে যখন যুহর ও আসরের সলাতের জন্য মসজিদে যাচ্ছে তখন সে আবিদ। কিন্তু যখন সে দুই সলাতের মাঝে বাজারে গিয়ে সবজি বিক্রি করছে তখন সে আব্দ, তাই সে ওজনে কম দিচ্ছে না, পচা সবজি ভাল সবজির সাথে মিশিয়ে মানুষ ঠকাচ্ছেনা।

মানুষ প্রকৃতিগত এমনভাবে তৈরী যে সে দাসত্ব মেনে নেয়। শয়তানের কীআপন প্রবৃত্তির, অর্থ-সম্পদের কী যৌন-কামনার, খ্যাতির কী ক্ষমতার,সম্মানিত ব্যক্তির কী ব্যক্তির দর্শনের - কোন না কোন কিছুর মানসিক দাসত্ব মানুষ করবেই করবে। একজন মুসলিমের মা'বুদ থাকে একজন- আল্লাহ, অমুসলিমের মা'বুদ অনেক - যে কোন পার্থিব ব্যক্তি বা বস্তুকেই সে আপন দাসত্ব নিবেদন করতে পারে। যখন ব্যক্তি আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে মা'বুদের স্থানে বসিয়ে দেয় তখন সে শির্ক করে, তার নাম হয় মুশরিক। আর যেহেতু সে শির্ক করে তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যটাই মিথ্যা করে দেয় তাই তার পরিণতি হয় অনন্ত আগুন। অন্য কোন পাপ আল্লাহ ক্ষমা করলেও করতে পারেন, কিন্তু শির্ক? কখনোই না।

ডেসটিনি মানুষকে দাসত্ব শেখায়, দাস হবার সুফল দেখায়, দাস না হবার কুফল দেখায়। তবে এক্ষেত্রে মা'বুদ আল্লাহ নয়, সাফল্য। আর তাদের সাফল্যের সংজ্ঞা পরকালের মুক্তি নয় - ইহকালের সম্পদ আর খ্যাতি। ডেসটিনির পরিচালক যখন কানাডা থেকে বাংলাদেশে আসেন তখন তিনি পশ্চিমা সভ্যতার বস্তুবাদী সাফল্যের এ দৃষ্টিভঙ্গীটি নিয়ে আসেন। ডেসটিনির সামগ্রিক কার্যক্রমকে তাই দুটি ভাগে ভাগ করা যায় –

১. এমএলএম এর মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় ভিত্তিক কমিশন ব্যবস্থা।

২. মোটিভেশনাল বা উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম।

প্রথমটাকে যদি কোন প্রাণীর দেহ ধরি তবে দ্বিতীয়টি তার প্রাণ। এটিডেসটিনির মূল চালিকাশক্তি, এর স্ট্র্যাটেজিটা একান্তই ডেসটিনির নিজস্ব আবিষ্কার। মজার ব্যাপার হচ্ছে একজন মানুষ যখন একবার ডেসটিনির ভিতরে ঢুকে যায় তখন প্রথমটির ব্যাপারে কার্যক্রম খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়; মূল কাজ হয় মোটিভেশনাল প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ নয়ত সেগুলোর আয়োজন।

সেলস ট্রেনিং এর সময় বিপণনের মূল কৌশলে শেখানো হয় কিভাবে নতুন খদ্দের ধরতে হয়; সেখানে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে কথা বলা হয়না বললেই চলে। আর যে পণ্যগুলো বিক্রয়করা হয় তার নিজস্ব মূল্য আসলে খুবই কম, এর আসল আকর্ষণ বিক্রয় পরবর্তী কমিশনে। আর তাইতো এদের পণ্যের তালিকাতে 'মোটিভেশনাল ট্রেনিং' নিজেও একটা পণ্য। কিন্তু ভয়াবহ ব্যাপার হল এই অংশটা থাকে অন্তরালে - কোন সৎ আলিমের কাছে ফতোয়া নেয়ার সময় বা মানুষকে বোঝানোর সময় মোটিভেশনের ব্যাপারটা প্রায় উপেক্ষাই করা হয়। অথচ এদের সবচেয়ে জাঁকজমক করে যে অনুষ্ঠানগুলো করা হয়, যেমন ডায়মন্ড সেলেব্রেশন প্রোগ্রাম, তার মূলমন্ত্র একটাই - To ignite one's desire and to keep it fired up.

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, প্রবৃত্তিপূজার এই জঘন্য বিষয়টিকে ডেসটিনির সদস্যরা খুবই সহজভাবে নেয়। তাদের ধারণা সফল হবার তীব্র আকাঙ্খা না থাকলে কেউ সফল হতে পারেনা। ডেসটিনি তাই বেঁচে আছে ডাউনলাইনের মনে 'সফল' হবার প্রজ্জলিত সুতীব্র বাসনাকে জ্বালানী করে। 'আমি পারবই' – এটি ডিস্ট্রিবিউটরদের মগজে গেঁথে দেয়া হয়।

হাজারো উপেক্ষা, অপমান, প্রত্যাখান সব কিছুকে হাসিমুখে সহ্য করে ডেসটিনির পরিবেশকরা বারবার মানুষদের কাছে যান, তাদেরও ডেসটিনির জালে জড়াতে। নিরাশা বা থমকে যাওয়া থেকে কর্মীদলকে রক্ষা করতে সুন্দর সব উপমা, খ্যাতিমানদের উক্তি, শিক্ষণীয় নানা গল্প দিয়ে একটা জিনিসই প্রমাণ করে ছাড়া হয় তা হল – একজন নতুন মানুষকে ডেসটিনিতে ঢুকানোর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করাতেই জীবনের সব সাফল্য লুকিয়ে আছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্যণীয় - ডেসটিনির মাথাদের মূল কাজ কিন্তু কর্মীদের দিয়ে পণ্য বিক্রয় করানো নয়, তাদের সফল হবার জন্য তাতিয়ে দেয়া। তাদের এই বোধ দেয়া যে তুমি একটা স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। এবং সফল হবার এই স্বপ্নকে সত্যি করতে হলে তোমাকে তোমার ডাউনলাইনের মনে আগুন জ্বালাতে হবে, তাদেরকেও সফল হবার স্বপ্ন দেখাতে হবে।

এজন্য ডেসটিনির নেটওয়ার্কের উপরের দিকের লোকেরা নতুন কাস্টমার ধরে কম, তাদের মূল কাজ ম্যারাথন প্রোগ্রাম, ট্রেনিং প্রোগ্রাম, সেলেব্রেশন প্রোগ্রাম এবং সবচেয়ে ভয়াবহ – টিম মিটিং গুলোর মাধ্যমে কর্মীদের মনে সবসময় স্বপ্ন দেখানোর ইনপুট দিয়ে যাওয়া। এই কাজে এরা সাইকোলজিকাল যত অস্ত্র আছে তার সবই ব্যবহার করে। যেমন ডেসটিনির এমডির মতে আমি ও আপনি - আমাদের মতমানুষরা ব্যধিগ্রস্থ। কারণ আমাদের মাধ্যমে অনেক টাকা কামানোর ইচ্ছা নাই। সুতরাং আমাদের রোগ সারাবার জন্য তার ঔষধ হচ্ছে - প্রতিদিন ঘুমাতে যাবার আগে 'উচ্চাকাংখার ম্যাজিক' নামে একটি বইয়ের অন্তত ছয় পৃষ্ঠা পড়ে ঘুমানো।

যারা মানুষের মনের বিজ্ঞান সম্পর্কে জানেন, তার বুঝতে পারবেন –এই ঔষধের মাজেজা। একটা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার সবচেয়ে সফল উপায় হল তার অবচেতন মনকে দখল করে ফেলা। আর অবচেতন মনকে কব্জা করার সবচেয়ে সহজ পন্থা হল ঘুমানোর আগে একটি মেসেজ বারবার মানুষের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া।

একটি মোটিভেশনাল ট্রেনিং এ একজন পিএসডি সে নিজে কতটা মোটিভেটেড তা বুঝানোর জন্য নিজের জীবনের গল্প বলছে - ডেসটিনি নিয়ে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় সে একদিন খবর পেল তার মা অসুস্থ, কিন্তু সে যেতে পারেনি। এরপর খবর এল তার মাকে হাসপাতালে নিয়ে

যাওয়া হয়েছে, ট্রেনিং-মিটিং-ক্লোজআপ আর জয়েনিং এ ব্যস্ত মানুষটির তাও সময় হয়নি অসুস্থ মাকে দেখতে যাবার। কয়েকদিন পর সে জানতে পারলো তার মা আর বেঁচেই নেই। এই ঘটনাকে এই প্রবৃত্তি-পূজারী গর্ব করে বলে বেড়ায় আর বলে: আমি সফল হবার জন্য এতটাই স্যাক্রিফাইস করেছি।

মফস্বল নিবাসী এক মহিলা পিএসডির স্বামী দেশের বাইরে থাকতো। দেশে ফিরে আসার পর সে যখন স্ত্রীকে ঢাকা ছেড়ে নিজের বাড়ী যেতে বলে তখন মহিলাঅস্বীকৃতি জানিয়ে বলে: "ওকে (স্বামী) দিয়ে আমার কি লাভ? ডেসটিনি আমাকে সম্পদ দিয়েছে সফলতা দিয়েছে। আমি জীবনে যা চাই পেয়েছি, ওর ঘরকরতে গিয়ে আমি এই সুখের জীবন হারাতে পারবোনা"।

মন্দিরে পূজা দেয়ার সময় মন্ত্র পড়া হয়, গীর্জাতে হাইম গাওয়া হয় ঠিক তেমন ডেসটিনিতেও শির্ক করানোর প্রধান অস্ত্র 'কথা'। যে আপলাইনের যত উঁচুতে তার কথাও তত রিফাইনড্। একটা মিথ্যাকে সত্যি বানিয়ে দেবার চাতুর্যতা দেখলে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার সত্যতা:

“নিশ্চয় কিছু কথাতে যাদুর প্রভাব আছে”।[85]

শয়তান যখন মানুষের কাছে এসে তাকে কোন বুদ্ধি দেয় তখন কিন্তু ভুলেও নিজেকে শয়তান হিসেবে পরিচয় দেয়না, বরং ঐ ব্যক্তিটিরশুভাকাঙ্খী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে। আজকের ডেসটিনির হর্তা-কর্তারা শয়তানের এই সুন্নাত পালন করে। তারা মানুষকে বোঝায় - দেখ আমরা নিজেরা একা বড়লোক হতে চাইনা, তোমাদেরকেও বড়লোক বানাতে চাই। অথচ সত্যি তো এই যে যদি ডাউনলাইন কাজ না করে তাহলে আপলাইন কখনোই ধনী হতে পারবেনা। তাই আপলাইনের মা নুষরা ডাউনলাইনকে ব্যবহার করে শোষক বাড়ানোর জন্য। বেকারত্ব দূরীকরণ, সম্পদের সমবন্টন –- এগুলো নেহায়েত কথার কথা।

মানুষ যেন প্রবৃত্তিকে ইলাহ্ বানিয়ে নিতে ভুল না করে সেজন্য ডেসটিনি আয়োজন করে তাদের দৃষ্টিতে 'সফল' মানুষদের বর্ণাঢ্য উপস্থাপনে। চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের মত

৪5 সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, খন্ড ৭ হাদিস ৭৬২

ব্যয়বহুল জায়গায় ভাড়া করে হাজারো মানুষের সামনে একজন ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভকে যখন গাড়ীর চাবি তুলে দেয়া হয় তখন তাদেরকে বলা হয় — একদিন তুমিও এই খানে আসতে পারবে, শুধুমাত্র এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে তুমি এখানে আসতে পারবে।

একই সময়ে ঢোকা এক হাজার মানুষের মধ্যে একজন যে গাড়ীর চাবী বাগাতে পারলো, কিন্তু বাকি নয়শ নিরানব্বই জন যে হারিয়ে গেল - এই নির্মম সত্যটা ঢেকে রাখা হয়। বলা হয় যারা গাড়ী পায়নি তারা অলস, তাদের মধ্যে সফল হবার চেষ্টার অভাব ছিল। কিন্তু পিরামিড স্কিমের ধোঁকাবাজীতে যে লক্ষজনের টাকাতে একজনকে গাড়ী দেয়া হয় এই অঙ্কটা কখনোই সামনে আনা হয়না। এভাবে আল্লাহর উপর ভরসা তো দূরের কথা, মানুষকে নিজের ভাগ্যনির্মাতা বানিয়ে দেয়া হয়। মানুষ নাকি চিন্তার মাধ্যমে ভাগ্য গড়তে পারে। অথচ ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং তার ভাল-মন্দও সুনির্ধারিত। ক্বদরে বিশ্বাস ঈমানের শেষ স্তম্ভ। ডেসটিনিতে সফল হবার দেখানো দিবাস্বপ্নের জন্য অবশ্য ক্বদরে বিশ্বাস বড়ই ক্ষতিকর। তাই তাদের বোঝানো হয়- ভাগ্য তো মানুষের হাতের মুঠোয়।

ডেসটিনি যে এভাবে কত মানুষের মগজ ধোলাই করে তাকে পার্থিবতার দাস বানিয়ে দিচ্ছে সেটার কোন পরিসংখ্যান নেই। কারণ দেহের মৃত্যু রেকর্ড করে রাখা যায়, মনের মৃত্যু দেখাই যায়না। ডেসটিনির ভয়াবহতাতাই তুলে আনা দায়। যারা দুনিয়াকে জান্নাত হিসেবে দেখে তাদের আসলেকিছু বোঝানোই মুশকিল। হালাল-হারাম তো পরের কথা - তারা যে একটা সিস্টেমের দাস বনে গেছে সেটা তারা ঐ সিস্টেমের ভিতরে আছে বলে বুঝতেই পারেনা। আর যারা বাইরে তারা ঐ সিস্টেমটা যে কত জঘন্য সেটা জানেইনা। যারা জানতে ভেতরে ঢোকে তাদের খুব কমই ঈমান নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

হৃদয়হীন যন্ত্রমানব তৈরীর এই সিস্টেমকে খুব স্পষ্ট করে দায়ী করাও যায়না কারণ সিস্টেম জিনিসটাই একটা বিমূর্ত ধারণা। সিস্টেমের দোষ বোঝা যায় তার প্রোডাক্ট দেখে। যখনই ডেসটিনির কোন হর্তা-কর্তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় - তার প্রোডাক্ট মাইন্ডলেস রোবটদের ব্যাপারে, তখনই তারা ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত আচরণ বলে পার পেতে চায়। যে মন্ত্রে একজন মানুষ আল্লাহ, পরিবার, নৈতিকতার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে টিম-মিটিং এ বসে অন্যের মনে কামনার আগুন জ্বালানোকেই তার সাফল্যের চাবীকাঠি মনে করে সেই

মন্ত্রের কোন দোষ নেই, সে মন্ত্র যারা পড়লো তাদেরও কোন দোষ নেই, দোষ কেবল তাদের যাদের উপর মন্ত্র পড়া হয়েছে - এটা কি সুস্থ বিবেক মেনে নেবে?

ডেসটিনি তাই একটা মুশরিক তৈরীর কারখানা। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

ধ্বংস হোক দিনারের পূজারীরা, ধ্বংস হোক দিরহামের পূজারীরা।[86]

মানুষ কি টাকার বান্ডিলে সিজদা করে? পয়সার কাছে দু'আ করে? না। সে অর্থের আবিদ হয় না, আব্দ্ হয়। ইসলামের বেঁধে দেয়া উচিত-অনুচিতের গন্ডী ছাড়িয়ে সে তার যা ভালো লাগে তাই করা শুরু করে। প্রবৃত্তি, অর্থ, খ্যাতি, গাড়ী, বাড়ী - এগুলোর দাস হয়ে যায় মানুষ। ভুলে যায় আল্লাহর দাসত্বের কথা। এমন একটা জীবনে সে জড়িয়ে পড়ে যেখানে সে আরো মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব থেকে বের করে নিয়ে যায়। সফল থেকে সফলতর হবার দৌড় থামিয়ে কখনো তার সময় হয়না আল্লাহ তাকে কেন পৃথিবীতে পাঠালেন সেটা নিয়ে চিন্তা করার। লক্ষ টাকার হারাম আয় ছেড়ে হালাল রুযি দিয়ে সাধাসিধে জীবন যাপন করার। এদের মধ্যে যারা নামায পড়ে আল্লাহকে ধন্য করে দেয় তারাও চোখ বন্ধ করলে 'প্যারাডো' গাড়ীর ছবি দেখে, চোখ খুললে পটেনশিয়াল খরিদ্দার দেখে। ইসলাম পালন হয়ে দাঁড়ায় নিতান্তই আনুষ্ঠানিকতা।

পৃথিবীতে সফল হবার জন্য প্রত্যেক মানুষের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সেই সফলতা যেন আখিরাতের সফলতার বিনিময়ে না আসে। আমাদের ভালো খাবার, ভালো পড়ার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। কিন্তু স্বচ্ছল থাকতে গিয়ে 'অনুচিতের' সাথে, 'হারামের' সাথে আপোষ করাকে ইসলাম ঘৃণা করে। একজন খাঁটি মুসলিম কখনো দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া কেনেনা, কারণ সে জানে, আল্লাহ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন –

> যদি কোন পুরুষ বা মহিলা সৎকর্ম করে,এবং সে মুমিন হয়,আমি অবশ্যই তাদেরকে(দুনিয়াতে)পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখবো এবং(আখিরাতে)সর্বোত্তম আমলের উপর ভিত্তি করে তাদের পুরষ্কার দান করব।[87]

---

86 বুখারী

ডেসটিনি এবং এর মত আরো যেসব প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানুষকে সফলতার ভুল সংজ্ঞা আমাদের মগজে প্রোথিত করে দিচ্ছে, আমাদের আল্লাহ থেকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে তাদের থেকে আল্লাহ আমাদের হিফাজাত করুন। আমিন।

বি.দ্র. এ লেখাটার পিছনে বাংলালিংকে কর্মরত প্রকৌশলী ইকবাল ভাইয়ের অবদান শতভাগ। তিনি ডেসটিনির এই চেহারাটা দেখে অনেক অর্থ লগ্নী করেও সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন, অবিরত মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তিনি আমাকে পুরো জিনিসটা বুঝিয়েছেন; বই, পত্রিকা, সিডি এর পাশাপাশি অবিরত অনুরোধ করে তার একটি লেখার উপর ভিত্তি করে এই লেখাটা লিখিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তার এই কাজটি কবুল করে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের উসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

২৭ শাবান, ১৪৩২ হিজরি।

47 সূরা নাহল, ১৬:৯৭

কেন তারা ঝরে পড়ে

কেউ আমাকে পড়াশোনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে যখন উত্তর দেই যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনলজি বিভাগ থেকে পাশ করেছি, তখন চোখে-মুখে যতই বিনয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলি না কেন, মনের ছাদে অহংকারের পতাকাটাকে পতপত করে উড়তে দেখি। আমি জানি যে আমাকে আল্লাহ যে সামান্য মেধাটুকু দান করেছেন তা নেহায়েতই দান, এতে আমার বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নেই। তবুও কৃতজ্ঞতায় নিচু মাথাতে আমার একটা অব্যক্ত শ্লাঘাবোধ থেকেই যায় যে, আমি এমন একটা বিভাগে পড়েছি যেখানে প্রতিবছর মাত্র দশ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ার সুযোগ পায়। ঢাবির ভর্তিপরীক্ষায় একদম সামনে থাকতে না পারলে এ সুযোগ মেলে না।

আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন আমাদের বিভাগটা ছিল নতুন। হাইটেক যন্ত্রপাতির অভাব ভুলিয়ে দিয়েছিল আমাদের শিক্ষকরা। তারা এমনভাবে পড়াতেন যেন আমরা কাজগুলো হাতে-কলমে না শিখলেও মনের চোখের সামনে দিব্যি দেখতে পেতাম। কিন্তু যত উপরের দিকে উঠতে থাকলাম, বিভাগ বড় হতে থাকল, নতুন নতুন শিক্ষক আসতে থাকলেন - ততই মন খারাপ হওয়া শুরু হল। সে মন খারাপ আজকের মত কখনও এত পূর্ণতা পায়নি।

যারা একটু ভাল ছাত্র তাদের একটা সমস্যা হচ্ছে তারা বুঝতে পারে অন্য একজন কেমন ছাত্র। যখন আমরা দেখি একজন শিক্ষক একবারও বই না খুলে সারা ক্লাস পড়াচ্ছেন অথচ আরেকজন বই ফটোকপি গড়গড় করে রিডিং পড়ে চলেছেন, তখন কেউ না বলে দিলেও আমরা বুঝে যাই কোন শিক্ষকের মান কেমন। যিনি নিজের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে পড়ান আর যিনি অন্য বিজ্ঞানীর লেখা জার্নাল ভাল করে না বুঝেই পড়াতে চলে আসেন তাদের দুজনের ক্লাস কি সমান? শেষ বর্ষে এমন শিক্ষকও পেয়েছি যিনি ন'টার ক্লাস দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে মিস করেছেন। সিলেবাসের কঠিন অংশটুকু তিনি আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন – সেগুলো আমরা পড়িয়েছি, তিনি পেছনে বসে শুনেছেন। আমরা এমন সব মানুষদের শিক্ষক হিসেবে পেতে থাকলাম যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার উদ্দেশ্যই ছিল 'বিদেশ গমন'। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের সরকারী

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা 'শিক্ষা ছুটি' নামে একটা সুবিধা পান। কেউ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকা অবস্থায় বিদেশে পড়তে যান তখনও বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বেতন দেয়। এখন পিএইচডি করতে তিন বছর লাগুক আর সাত – বেতন তিনি পেয়েই যাবেন, ছাত্র পড়ানো ছাড়াই! অথচ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্তরে স্কলারশিপ ছাড়া কেউ বিদেশে যায় না, অন্তত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যান না। সে স্কলারশিপে যে টাকা দেয় তাতে থাকা-খাওয়া-পড়ার খরচ দেবার পড়েও হাতে কিছু টাকা জমে। আর এদিকে দেশের ব্যাংকে মাসিক বেতনও জমতে থাকে।

ব্যাপারটা হয়ত শুরু হয়েছিল এ কারণে যে, শিক্ষকরা বিদেশ থেকে গবেষণা করে অনেক কিছু শিখে দেশে গিয়ে ছাত্রদের শেখাবেন। কিন্তু দেখা যায়, অনেক দিন বিদেশে থাকার ফলে শিক্ষকদের দেশের মাটিতে মন টেকে না; তারা পোস্ট-ডক করতে যান বা লিয়েন নিয়ে হয় কনসালটেন্সি নয়ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু করেন। পুরো ব্যাপারটাতে শিক্ষকদের কতটুকু লাভ হয় জানি না, কিন্তু শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয় অনেক। তাদের সিলেবাস ঠিকমত শেষ করার কেউ থাকে না। একজন শিক্ষক খুব জরুরী একটা কোর্স আমাদের শেষ করিয়েছিলেন তিন মাসে যেটা পড়ানোর কথা ছিল ১২ মাসে, কারণ বাকি সময়টুকু তিনি বিদেশে ছিলেন। ঐ বিষয়ে আমার ভিত্তিটা সেই যে টলে গেল, তার জের এখনও সামাল দিয়ে উঠতে পারিনি।

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বেতন/চাকরি কথাগুলো ব্যবহার করতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু এটা তো সত্যি তাদের সম্মানী দেয়া হয় ছাত্রদের শেখানোর জন্য। আমাদেরই কোন শিক্ষককে দেখতাম সকাল থেকে বই নিয়ে পড়ে আছেন। আবার এমনও দেখেছি যার ন্যুনতম প্রস্তুতি নেয়ার মত ন্যুনতম সৌজন্যবোধ ছিল না। সব মানুষের বোঝানোর ক্ষমতা এক না, মানি - কিন্তু চেষ্টা বলে একটা ব্যাপার তো আছে! কারো যদি কম বেতন না ভাল লাগে তিনি তো অন্য কিছু করলেই পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে বেতন কম তাই কাজও করি কম, এ কথা বলে ক্লাস ফাঁকি দেবেন - এটা কেমন বিচার? পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাস আধ ঘন্টায় নেয়া, আর তাতেও 'তা না না না' করে হাজিরা খাতার লৌকিকতা রক্ষা করা – এটা কী ছাত্ররা বোঝে না? ছাত্ররা সবই বোঝে, কিন্তু ভদ্রতা করে কিছু বলে না। আর না বলার সুযোগটা এই প্রজাতির শিক্ষকরা আর বেশী করে নেন। আস্তে আস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়া

সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে উদাসীনতা চলে আসে। বোঝার বা শেখার চেয়ে বই মুখস্থ করে কোনরকম পরীক্ষা পাস করাই আসল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানের আকাশে যাদের তারা হয়ে ঝিলমিল করার কথা ছিল তারা সবার অজান্তে খসে পড়তে থাকে ধীরে ধীরে। মেধার মৃত্যু হয়, স্বপ্নের মৃত্যু হয়।

এতক্ষণ যা বললাম তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে। সমস্যা প্রকট হয় যখন অনুচিত আচরণগুলো নিয়মে পরিণত হয়। একজন ভাল ছাত্রকে যখন শিক্ষকে হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় তখন তার কাছ থেকে ছাত্ররা অনেক কিছু শেখে। আমাদের পরের ব্যাচে একটা খ্যাপাটে ছেলে ছিল যে ঘরে বসে চিন্তা করে সিনথেটিক বায়োলজির মডেল দাঁড় করিয়ে ফেলত। এ রকম একজন মানুষকে যদি শিক্ষক হিসেবে ছাত্ররা পায় তাহলে তারা শেখে কল্পনাশক্তির দরজা কিভাবে খুলতে হয়। ঐ ব্যাচেরই আরেকজন ছেলে এত সুন্দর করে গবেষণার পরিকল্পনা করত যে, সে অনুযায়ী কাজ করলে কিছু না কিছু পথ বের হতই। আমাদের সাথে এমন একজন ছিল যে গবেষণার প্রতি একাগ্রতাকে অন্য স্তরে নিয়ে গিয়েছিল। এই গুণগুলো সবার মধ্যে থাকে না; যাদের মধ্যে থাকে তাদের মাথায় করে রেখে দেয়া উচিত, যাতে তাদের কাছ থেকে অন্যেরা শিখতে পারে। কিন্তু যখন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতা দাঁড়ায় কে 'লীগ' করে আর কে 'দল', তখন পুরো ব্যবস্থায় ধস নামে। ভাল ছাত্ররা সাধারণত রাজনীতি করে না, তাদের করার মত অনেক ভাল কাজ আছে। আমাদের দেশের স্বনামধন্য প্রথিতযশা লেখক-শিক্ষক, যিনি প্রতিদিন আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ভাল ভাল কথা শেখান তিনিও আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পেয়ে বেছে নেন উনিশতম ছাত্রটিকে! আগের আঠার জন কী দোষ করল?

হিসাবটা খুব সহজ - যখন দলের ছেলেটি শিক্ষক হিসেবে ঢুকবে তখন সে ভোট দেবে দলীয় শিক্ষককে। দলীয় শিক্ষক ডীন হবে, চেয়্যারম্যান হবে, প্রক্টর হবে। দলের জোর বাড়বে, আরো শিক্ষক, কর্মচারী নেবার পথ সুগম হবে। দলের ক্যাডারদের টেন্ডার দেয়া যাবে নির্বিঘ্নে, হলের দখল দিয়ে দেয়া যাবে। বিভিন্ন কমিটিতে নাম ঢুকবে দলীয় শিক্ষকদের – বাড়তি কামাই হবে অনেক। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সরকার বদলের সাথে সাথে বদলে যায় দল, কিন্তু ভাল ছাত্ররা উপেক্ষিত হয় সব আমলেই।

সবখানে থাকলেও আমাদের বিভাগে এই নোংরামি ছিল না শুরুতে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখনও যারা আছেন তারা মেধার ভিত্তিতেই এসেছেন। কিন্তু গত সরকার প্রথম আমাদের বিভাগকে কলুষিত করেছিল। মাঝে তত্ত্বাবধায়ক আমলে আমরা খুবই ভাল ছিলাম, কিন্তু এবার আবার শুরু হয়েছে আবর্জনা ঢোকানোর প্রচেষ্টা। শেষবার নিয়োগ দেবার সময় নিয়ম ছিল, এ বিভাগ থেকে মাস্টার্স করতে হবে। খুব যোগ্য কিছু ছাত্র যারা অনার্স করে সরাসরি বিদেশে পিএইচডি করতে চলে গিয়েছিল তারা এ নিয়মের ঘোরপ্যাঁচে বাদ পড়েছিল। বিশেষ একজন প্রার্থীকে সুযোগ দিতে এবার ঐ নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। নিয়মটা ভাল ছিল না তাই বাতিল হয়েছে, ভাল কথা – কিন্তু যে বিদেশ থেকে পয়সা দিয়ে পড়েছে আর যে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে গেছে দু'জন কি এক? বিদেশ হলেই হবে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মানটা দেখতে হবে না? যোগ্য প্রার্থীটি অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে বিদেশে পাড়ি জমানোর পরে কেন সাক্ষাৎকারের তারিখ ঘোষণা করা হবে?

আমার যে শিক্ষকরা এই অন্যায়টির বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছেন তাদেরকে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। আমার যে শিক্ষকরা সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, জীববিজ্ঞান অনুষদের বিরূপ পরিবেশের মধ্যে থেকেও নিরপেক্ষভাবে আছেন, গবেষণা করে যাচ্ছেন, বিনে পয়সায় আমার ছোট ভাইদের পড়িয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। তারা যদি হাল ছেড়ে দেন - তাহলে কি অবস্থা হবে, মাস্টার্সের থিসিসের ছাত্ররা কোথায় যাবে সেটা ভাবতেই আমার ভয় লাগে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানুষ অনেক সম্মান করে। কিন্তু এই সম্মানটা কিছু শিক্ষক নিজের হাতে নষ্ট করে ফেলছেন। যে মানুষটা দুর্নীতি করে শিক্ষক হল, সে কি কখন একটা ছাত্রকে বলতে পারবে, "নকল কর না, নকল করা অন্যায়" ? কী নীতিবোধ শেখাবে সে যার নিজের নীতিবোধ নেই? তাই তো আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেউ কেউ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে, ছাত্রীদের গায়ে হাত দেয়। নৈতিকতার অধপতনের পাঠ ছাত্ররা পায় শিক্ষকদের কাছ থেকে। বুয়েটে সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রথম বর্ষে যারা বলেছে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ঘুষ খাবে না, তারাই শেষ বর্ষে সাফ জানিয়ে দিয়েছে ঘুষ খেতে তাদের আপত্তি নেই। বুয়েটের মত জায়গায় যদি নৈতিক শিক্ষার এ হাল হয়, তাহলে বাকি সবখানে কী ত্রাহি ত্রাহি দশা!

অযোগ্য একজনকে শিক্ষক বানালে অন্য শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। সাদা কাপড়ে দাগ পড়লে দাগের মাহাত্ম্য বাড়ে না, কাপড়টার মূল্য কমে যায়। আর যখন অনেকগুলো কাল দাগ পড়ে, তখন মানুষ সেই সাদা কাপড়টাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দাগ দাগের মতই থাকে, মধ্যে থেকে কাপড়টা ঘরমোছার ন্যাকড়া হয়ে যায়।

দু'হাজার সালের কথা। তখন থেকে বুকে স্বপ্ন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার হব - নোনা মাটিতে ধান ফলাব, দুর্ভিক্ষপীড়িত ইথিওপিয়া আর সোমালিয়ার খরাতে ফসল। গ্রামে টনের পর টন টমেটো পঁচে যায় কৃষকরা আনার আগেই, আর শহরে দাম আশি টাকা কেজি। স্বপ্ন দেখতাম কিছু একটা করব যাতে শাক-সব্জি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। যখন ঢাবিতে জেনেটিক আর মেডিকেল কলেজে দুটোতেই চান্স পেলাম তখন আত্মীয়-স্বজনকে বোঝালাম প্রোটিন ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়। রিকম্বিনেন্ট ব্যাক্টেরিয়া থেকে ইনসুলিন আসে, ভ্যাকসিন আসে – সেগুলো দিয়ে অনেক বেশী মানুষের জীবন বাঁচান যায়। ডাক্তারির চেয়ে এটা অধিক মহতী পেশা – এমনটাই বুঝিয়েছিলাম সবাইকে।

যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরুলাম তখন মাথা ভর্তি বিদ্যা, কিন্তু করার মত কাজ নেই। হাতে কলমেও এমন কিছু শিখিনি যে নিজেই কিছু একটা খুলে বসব – পনিরের খামার বা টিস্যু কালচার ল্যাব। হন্যে হয়ে ঘুরলাম – কেউ কি আমাকে শেখাবে কিভাবে বায়োরিমেডিয়েশন করে কিভাবে আবর্জনাকে সম্পদ করা যায়? কেউ কি আমাকে কোথাও ছ'মাসের একটা ট্রেনিং দিয়ে শেখাবে কিভাবে বায়োফার্মেন্টশন দিয়ে মাংসের বিকল্প মাইকোপ্রোটিন জন্মাতে হয়? আপ্রাণ চেষ্টা করলাম এমন কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে যেখানে আমার জ্ঞান ব্যবহার করতে পারব, আমাকে আল্লাহ যে ক্ষমতা দিয়েছেন সেটার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারব। পেলাম না এমন কিছু। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম বিদেশে আবেদন করার। খুঁজতে লাগলাম কোথায় লাগসই প্রযুক্তি শেখা যাবে, যার প্রয়োগ আমার দেশে হবে।

নতুন কিছু শিখব এই আশায় দেশে ১৪ মাসের কোলের বাচ্চা আর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে ফেলে রেখে আমি আজ পরবাসী। এমন এক জায়গায় এসে পড়েছি যেখানে আমি জীবনে প্রথম সজ্ঞানে জুম'আর নামায পড়তে যেতে পারিনি। যে আমি দিনে পাঁচবারের মধ্যে একবার জামাত না পেলে মন খারাপ করতাম, সেই আমি এক ওয়াক্ত নামায জামাতে পড়ার সাথী পেলে আনন্দে লাফ দেই। বাবা-মা-ভাই-স্ত্রী, সদ্য হাটতে শেখা ছেলেটার কথা যখন মনে হয়

তখন কোথায় লুকিয়ে কাঁদব ভেবে পাই না। ঝকঝকে নীল আকাশটার দিকে তাকিয়ে আল্লাহকে বলি, “আল্লাহ, কিছু একটা যেন শিখতে পারি, কিছু একটা!”

আমার যদি ইসলামের বুঝটা না থাকত, তাহলে খুব কষ্ট লাগত। আমি জানি আমি যদি বিদেশ থেকে কিছু শিখিও, সেটা ছাত্রদের শেখাতে পারব না। কারণ দলের লেজুড় ধরা তো দূরের কথা, আমি কারো কাছে দয়া ভিক্ষা করতেও পারব না। ঠিক করে রেখেছি, করার মত কোন কাজই যদি না পাই, তাহলে গ্রামে গিয়ে ক্ষেত চাষ করব। শহুরে যান্ত্রিক জীবন এমনিতেও আমাকে টানে না। মানুষের কথা আগের মত আর গায়ে লাগে না। কেউ যদি বলে ‘আমেরিকা ফেরত চাষা’, বলুক। আমার খারাপ লাগে যে, কোটি মানুষের করের টাকায় শেখা বিদ্যা কাজে লাগাতে পারলাম না সে জন্য। আমি তো শুধু দামী চাকরি করার জন্য পড়াশোনা করিনি, মানুষের জন্য কিছু করব সে জন্যেও পড়েছিলাম।

আমাদের নেতারা কাজ করার ব্যবস্থা তো করেই না, বরং কিছু করতে চাইলে বাধা দেয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্ষমতার লোভে সেই নেতাদের কদমবুসি করেন, অদৃশ্য ইশারায় সফেদ ইউনিকর্ন ছেড়ে নেড়ি কুকুর বেছে নেন। আমাদের শিল্পপতিরা গরীব-গুর্বো মানুষের একটু ভাল থাকা-একটু ভাল খাওয়ার জন্য কিছু করতে রাজি নন, বরং তাদের গলায় ফাঁস বেঁধে পয়সা কামাতে চান। আমি অতি তুচ্ছ, নগণ্য মানুষ আর কী করব? অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। মরতে তো একদিন হবেই। তোমরাও মরবে, আমিও মরব। তোমরা আজ যা করছ তার জবাবটা না হয় শেষ বিচারের দিনেই শুনে নেব।

২০ রমাদান, ১৪৩২ হিজরি।

:: সমাপ্ত ::

<u>বইটির প্রাপ্তিস্থান:</u>

1. বই বিচিত্রা, শাহ মাখদুম রোড,মাইলস্টোন কলেজের(সিনিওর সেকশন) পেছনে, সেক্টর-১২, উত্তরা। 8801818514564
2. বই বিচিত্রা, নীচ তলা, উত্তরা টাওয়ার, জসীমউদ্দিন রোড, সেক্টর-৩, উত্তরা। 8801811212820
3. আইডিয়াল বুক সার্ভিস, শাহ আলি মার্কেটের পিছনে, মিরপুর ১০। 8801711262596
4. বই বিচিত্রা, রুপায়ন টাওয়ার,গ্রামীন ফোন অফিসের বিপরীত পাশে, গুলশান। 8801817051783
5. ডিজায়ার, ২য় তলা,ইউ এ ই মার্কেট, বনানী।
6. আহসান পাবলিকেশন, কাটাবন বুক মার্কেট, কাটাবন। 8801674916628
7. ওয়ার্ল্ড বিচিত্রা, নিচ তলা, এ ডি সি এম্পায়ার প্লাজা, স্টার কাবাবের বিপরীতে, সাত মসজিদ রোড,ধানমন্ডি। 8801817587990
8. এস এন এস টেলিকম, সি/৪,জাকির হোসেন রোড, মোহাম্মদপুর। 8801777655505
9. ভেক্টরাস, ৩/৪-এ,ষষ্ঠ তলটোল, সাব্বির টাওয়ার, পুরানা পল্টন। 8801819238103
10. ভাওয়েল, ১৬/৬৩২,রুপনগর,ইস্টার্ন হাউজিং রোড-১৬,পল্লবী,মিরপুর। 8801676103842
11. কাবাব ইন্ডাস্ট্রি, ৯২০/সি,তালতলা,খিলগাও। 8801750180032
12. সরোবর, মডার্ন মোড়, দিনাজপুর। 8801717017645
13. আয়াত লাইব্রেরি, কাজির দেওরী, চট্টগ্রাম। 8801843396060
14. ই সি এস লাইব্রেরী, ৩/১,কুদরতউল্লাহ মার্কেট, ৩য় তলা, বন্দরবাজার, সিলেট। 8801712668345
15. প্রাইম বুক সেন্টার, মোড়ল প্লাজা, গোল্লামাড়ি, খুলনা। 8801962033020
16. সবুজ উদ্যোগ, বাড়ীর৫, রোড-১১, পিসি কালচার হাউজিং, শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর। 8801791002007
17. মুজিবর ভাই, আল আমিন মসজিদ চত্বর, শুক্রবার, মুহাম্মাদপুর। 8801739269636